মহাস্থবির জাতক

মহাস্থবির জাতক

(প্রথম পর্ব)

“মহাস্থবির”

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কলিকাতা-৩৭

উৎসর্গ

বাবা,

কর্মক্লান্ত দিনশেষে আবার যেদিন তোমার সঙ্গে মিলন হবে, সেই মুহূর্ত্তটি স্মরণ ক'রে আমার শৈশব-কৈশোর-মায়া-উপবন থেকে চয়ন করা এই স্মৃতির ডালা তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলুম।

ভূমিকা

ভূমিকার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু লেখকের ঋণস্বীকারের কিছু দায়িত্ব আছে, জাতক সম্পূর্ণ হবার অপেক্ষায় থাকলে হয়তো তা অস্বীকৃতই থেকে যাবে। মহাস্থবিরের এই সাদায়-কালোয় চিত্রিত বিচিত্র জীবন যে আর কারও আনন্দের খোরাক যোগাবে, এই চিন্তার স্পর্ধা যারা তার মনে সঞ্চার করেছে, আজ তাদের কথা স্বতই মনে হচ্ছে। তাদের উৎসাহ এবং উত্তেজনা না পেলে হয়তো জাতক অলিখিতই থেকে যেত। সুতরাং জাতকের ভাল-মন্দের নিন্দা-প্রশংসার ভাগও তাদের ওপর বর্তাবে। আমার বাল্যবন্ধু অমল হোম এই উৎসাহদাতাদের অগ্রণী। আসামীস্বরূপ তাঁকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলুম।

এই দুর্দিনে জাতক প্রকাশ ক'রে সোদরোপম শ্রীমান সজনীকান্ত যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তার ফলাফল সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। তাঁর শক্ত ঘাড়, আমি তাঁর জন্যে মোটেই চিন্তিত নই। প্রূফ আমি দেখতে জানি নে—ভুলভ্রান্তি যদি কিছু থাকে, তার দায়িত্ব সুবল ও গণেশ ভায়ার।

মানুষের জীবনের কাহিনীই সব-চাইতে বিচিত্র উপন্যাস—উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের জন্যে আশা করি কারও কাছে কোনও জবাবদিহিতে পড়তে হবে না। ইতি

১লা আশ্বিন
১৩৫১

"মহাস্থবির"

মহাস্থবির জাতক

প্রথম পর্ব

বর্ষার রাত্রি, তার অনিদ্রারোগ—মণিকাঞ্চনযোগ যাকে বলে। নিদ্রার বিরহে বিছানায় প'ড়ে এপাশ-ওপাশ ক'রে প্রায় পাঁচ-সাত মাইল গড়িয়েও ঘুমের দর্শন যখন পেলুম না, তখন অভিমানে শয্যা ত্যাগ করলুম।

সন্ধ্যায় রেডিওতে ঘোষণা করেছে—রবীন্দ্রনাথের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তখন থেকেই মাথার মধ্যে বারে-বারে এই কথাগুলোই ঘা দিচ্ছে। শ্রাবণ মাস, শুক্লাত্রয়োদশীর রাত্রি, সামনেই ঝুলন-পূর্ণিমা। ক'বপ্রয়াণের উপযুক্ত সময় বটে। এবার কি কবি, তবে সত্যিই চললে?

ছাতে বেরিয়ে পড়লুম। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ছাতে পায়চারি করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। মাথার মধ্যে চিন্তাকীটগুলো যেন ক্রমেই নির্জীব হয়ে আসছে।

সামনেই ছাতের এক কোণে যে ঘর, তার মধ্যে আমার স্ত্রী-কন্যারা শুয়ে আছে—দরজা-জানলা হাট ক'রে খোলা। আমরা ছেলেবেলায় শুনতুম, রাত্রে দরজা-জানলা খুলে শুলে সান্নিপাতিক হয়। আমার সন্তানেরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছে আর বইয়ে পড়ছে, দরজা-জানলা না খুলে শুলে যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ হবার সম্ভাবনা। ফলে আমার ঘরে রাত্রে দুয়ার-জানলা বন্ধ আর তাদের খোলা—অথচ উভয়-পক্ষই বেশ সুস্থ।

চিন্তার চক্র ঘুরে চলেছে—ঘর্ঘর—ঘর্ঘর। সন্ধ্যেবেলা রেডিওতে খবর দিয়েছে—কবি অচৈতন্য; কথা বন্ধ।

কবি, এবার কি 'পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ মর্ত্য-জন্ম-শিখা' সত্যিই নিবল?

ধীরে ধীরে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। ভেতরে যারা শুয়ে আছে, কে তারা? তারা আমার আপনার লোক। কি রকম আপনার?

মনে হতে লাগল, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আপন গৃহকোণে যাদের আপনার ব'লে পেয়েছিলুম,—বাবা মা, আজ দুজনেই তাঁরা যবনিকার অন্তরালে। তিন ভাইয়ে একসঙ্গে মানুষ হয়েছিলুম। বড় ভাই আজ পঁয়ত্রিশ বছর হ'ল বিদেশে গিয়েছে, সেই থেকে তার সঙ্গে আর দেখা নেই। আমার ছোট যে, সে আজ সাতাশ বছর আগে ওপারে যাত্রা করেছে। আরও ভাই বোন যারা, তারা আমার চেয়ে অনেক ছোট। সংসার-পথে চলতে চলতে পথের মাঝে নিবিড় সঙ্গ দিয়ে যারা আমার জীবনকে মধুময় করেছে, পথের বাঁকে বাঁকে তাদের অনেকেই বিদায় নিয়েছে। যারা আজও জীবিত, তাদের মধ্যে দু-একটি ছাড়া সকলের সঙ্গেই অন্তরের বন্ধন শিথিল হয়েছে।

আকাশে মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। তারই সমারোহে শুক্লাত্রয়োদশীর জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে এল। চলন্ত মেঘখণ্ডগুলো দেখে মনে হচ্ছে, যেন তারা নিঃশব্দে ছুটে চলেছে কবিপ্রয়াণ দেখতে।

সেই স্তিমিত চন্দ্রালোকে রাত্রিশেষে ছাতের ওপরে দাঁড়িয়ে জীবনে আবার একবার আপন সত্তায় অনুভব করলুম, পৃথিবীতে আমি একাকী।

বছর দশ-বারো আগে আমার একবার অসুখ করেছিল। তেমন বাড়াবাড়ি অসুখ নয়, দিনের মধ্যে মাত্র একবার প্রাণপাখি খাঁচা-ছাড়া হবার চেষ্টা করত। ডাক্তার কবিরাজ এলে আমার মা চেঁচামেচি করতে থাকতেন। কেঁদে তাঁদের হাতে পায়ে ধরতেন। তাঁর সোনার চাঁদ ছেলের প্রাণ যেন তাঁদেরই হাতে রয়েছে, তাঁরা দয়া করলেই সে বেঁচে যাবে।

এই সময়ে একদিন মাকে ডেকে বলেছিলুম, মরণেই যদি আমায় টেনে থাকে, তবে ডাক্তার কবিরাজ কেউ কিছুই করতে পারবে না।

কিন্তু দোহাই তোমার, থেকে থেকে অমন চীৎকার পেড়ে কেঁদো না মা, আমায় শান্তিতে মরতে দাও।

মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, তাঁর মুখ দেখতে পাই নি। কিন্তু অসুখের মধ্যে আর তাঁর কান্নার শব্দ আমার কানে পৌঁছয় নি।

আজ সংসারের শত ঝঞ্ঝার মধ্যে মনে হয়, যদি সে কণ্ঠস্বর একবার শুনতে পাই!

মাথার ওপরে পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ এসে জমেছে। কিসের বেদনায় তারা ফুলে ফুলে গুমরে উঠছে? শুক্লাত্রয়োদশীর রাত্রি অমাবস্যার অন্ধকারে ঘিরে ফেলছে কেন? আকাশের দিকে জিজ্ঞাসু হয়ে চেয়ে আছি। কি সর্বনাশ লুকিয়ে আছে ওই নীল রহস্যের মধ্যে?

হঠাৎ বহুদিনবিস্মৃত এক শিশুকণ্ঠের তীব্র চীৎকারে চমকে উঠলুম, দেখ না মা, স্থবিরে কি করছে!

কার কণ্ঠস্বর এ? স্তম্ভিত বিস্ময়ে আকুল হয়ে আমি ছাতের চারিদিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলুম—কোথায়, কোথায় রে তুই? আমার চেতনাকে রুদ্ধ ক'রে কালচক্র যেন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে আবার বিপরীত দিকে আবর্তিত হতে লাগল। হু-হু ক'রে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতীতে এসে চক্র থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কণ্ঠস্বরে আবার চেতনার দ্বার উন্মুক্ত হ'ল—কি করছিস স্থবিরে? কেন ওকে জ্বালাতন করছিস?

খ্রীষ্টান উনবিংশ শতাব্দী প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জুবিলী হয়ে গেছে। বৎসরের শেষ দিনের শেষ রাত্রি।

কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ওপরে একখানা নীচু-গোছের দোতলা বাড়ির একটা ঘর। ঘরের এক কোণে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে। অঙ্গে তাদের

গরম নিকার-বোকার স্যুট, মাথায় অদ্ভুত টুপি। পায়ে ভীষণ কুটকুটে গরম ফুল-মোজা, তার ওপরে বুট-জুতো। কেল্লার বাজারের মুচীকে ফরমায়েশ দিয়ে সে জুতো তৈরি। স্থবিরের বয়েস ছয় আর অস্থিরের বয়েস চার বছর। সেই ভোর-রাত্রে তারা সাজগোজ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, কাল পয়লা জানুয়ারির সকালে গড়ের মাঠে সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজ হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে হবে কৃত্রিম যুদ্ধ, তাই দেখতে যাবার আয়োজন চলেছে।

ওদিকে বিছানার ওপরে এদের বড় ভাই স্থির সাজসজ্জা করছে। স্থিরের বয়েস ন বছব। তার পছন্দ-অপছন্দ কিছু প্রবল, তাই নিয়ে মায়ের সঙ্গে বচসা চলেছে। মধ্যে মধ্যে চড়-চাপড়ও চলছে।

কুটকুটে মোজা পরতে স্থির প্রবল আপত্তি জানালে। তাদের মা হাল ছেড়ে দিয়ে স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, ওগো, দেখ, তোমার বড় ছেলে মোজা পরতে চাইছে না।

ছেলেদের বাপ মহাদেব শর্মা দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ। ঘরের এক কোণে হিঙ্ক্‌সের হ্যারিকেন লণ্ঠনের ওপরে একটা বড় কাঁসার বাটিতে দুধ গরম করবার চেষ্টা করছিলেন। স্ত্রীর আওয়াজে ঘাড় ফিরিয়ে স্থিরের দিকে ফিরে বললেন, বছরের প্রথম দিনেই মার খাবে স্থির? মনে রেখো, একেবারে খুন ক'রে ফেলব।

স্থির বিনাবাক্যব্যয়ে কুটকুটে মোজার ভেতরে সোজা পা ঢুকিয়ে দিলে।

দুধটা যথোচিত গরম হয়েছে কি না বোঝবার জন্যে মহাদেব ডান হাতের তর্জনীটা বাটির মধ্যে ডুবিয়ে দেখে স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, এমন হতভাগা ছেলে আমার কেন হ'ল বুঝতে পারি না। ওই তো স্থবির রয়েছে, অস্থির রয়েছে, ওদের দেখ। কোথায় তোমাকে দেখে ওরা শিখবে, না, তুমি শিখবে ওদের কাছে!

কাল স্থবিরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সন্ধ্যেবেলা সামান্য একটু উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। তারই অবশিষ্ট গোটাকয়েক কমলালেবু ও সন্দেশ রাখা হয়েছিল। এবার ছেলেদের মা তাদের হাতে একটা ক'রে সন্দেশ ও কমলা দিলেন। সন্দেশগুলো যে যার টপাটপ মুখে পুরে দিলে, কমলা তখুনি খাওয়া বারণ। ফেরবার সময় যখন গলা শুকিয়ে উঠবে, তখন খাওয়া হবে।

ইতিমধ্যে অস্থিরের কমলাটি স্থবির নিজের পকেটে পুরে ফেলেছে। অস্থির দু-একবার চেষ্টা ক'রে স্থবিরের কাছ থেকে সেটা আদায় করতে না পেরে মার কাছে আপীল করলে, দেখ না মা, স্থবুরে কি করছে!

স্থবির তাড়াতাড়ি কমলাটা অস্থিরের পকেটে গুঁজে দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

মা ঘাড় ফিরিয়ে এ দৃশ্য দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলেন। তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন, এই স্থবুরে, কি হচ্ছে?

তারপর স্বামীর দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, নাঃ, এ ছেলেটাও নষ্ট হয়ে গেল দেখছি। বড়টার দেখাদেখি ছোটরাও তো শিখবে। আমার যেমন বরাত।

মহাদেব গরম দুধের বাটিটা তখন সবেমাত্র হ্যারিকেনের চূড়া থেকে ঠন ক'রে মাটিতে নামিয়ে পাখির ডানা-ঝাড়ার মতন হাত ঝাড়ছিলেন। স্ত্রীর কথা শুনে একবার রোষকষায়িত লোচনে স্থিরের দিকে চাইলেন। বেশ বোঝা গেল, বাটির উষ্ণতার কিছু অংশ তাঁর মেজাজেও সঞ্চারিত হয়েছে।

পিতার স্থির দৃষ্টির আঘাতে স্থির অস্থির হয়ে উঠল। করুণ চোখে স্থবির ও অস্থির একবার বাবার দিকে, আর একবার দাদার দিকে

চাইতে লাগল। এক মুহূর্ত পরেই যে ব্যাপার ঘটবে, এই বয়সেই তিন ভাইয়েরই তার অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ফাঁড়া কেটে গেল। মহাদেব আর কিছু না ব'লে ঘাড় হেঁট ক'রে তিনটে বাটিতে সমান ভাগে দুধ ঢালতে লাগলেন।

মা বললেন, নাও, খেয়ে নাও।

তিন ভাই এগিয়ে এল। পিতা তাদের হাতে একে একে দুধের বাটি তুলে দিলেন।

তারপরে সুপসাপ হুসহাস শব্দ ক'রে চুমুকের কন্‌সার্ট শুরু হ'ল।

জামা পরতে পরতে মহাদেব হুঙ্কার ছাড়লেন, কিসের এত আওয়াজ হচ্ছে? কতদিন ব'লে দিয়েছি না, খাবার সময় শব্দ করবে না—মনে থাকে না?

তারপরে স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, এত অবাধ্য এরা কেন হ'ল বল তো?

স্থির মনে মনে ত্রস্ত হতে লাগল। এর পরের তালটা নিশ্চয়ই তারই ওপর পড়বে, সে সবার অগোচরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাস্তা। তখনও গ্যাসের আলো নিবনো হয় নি, ট্রামও চলতে আরম্ভ করে নি। শীতের শেষরাত্রি, হু হু ক'রে উত্তুরে বাতাস বইছে। নির্জন পথ। চার বাপ-ব্যাটার পায়ের আওয়াজে রাস্তা গম্‌গম্ করছে। থেকে থেকে মহাদেব ছেলেদের উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁর যেমন বিশাল দেহ, তেমনই কণ্ঠস্বর। আস্তে কথা বলা তাঁর ধাতে সয় না।

পেণ্টুলানের দুই পকেটের মধ্যে হাত ঠেসে দিয়ে ছেলেরা চলেছে। মহাদেব বলতে আরম্ভ করলেন, আজ এই নতুন বছরের সকালে প্রতিজ্ঞা কর—আমরা ভাল ছেলে হব, ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখব; কখনও মিথ্যে কথা বলব না।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলতে লাগলেন, স্থির, এ বছর তোমার পরীক্ষার ফল ভাল হয় নি। আসছে বছর ফার্স্ট হতে হবে, বুঝলে ?

অতি ক্ষীণ স্বরে স্থির বললে, হ্যাঁ বাবা।

আবার কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ চলতে লাগল। তাদের পায়ের আওয়াজ ছাড়া রাস্তায় আর কোন শব্দ নেই। রাস্তার গ্যাসের আলো একে একে নিবতে লাগল। চলতে চলতে ডান দিকের একটা বাড়ি দেখিয়ে মহাদেব বললেন, এই বাড়িটা চেন ?

তিন জোড়া শিশুচক্ষু রাত্রির অন্ধকার ও বড় বড় গাছের আবরণ ভেদ ক'রে খানিকটা সাদা দেওয়াল ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলে না।

মহাদেব আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি, চেন ?

স্থির অন্ধকারে ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

মহাদেব বললেন, অন্ধকারে মাথা নেড়ো না। কতদিন বারণ করেছি, কিছুতেই কি তোমার এ অভ্যেস যাবে না ? এটা প্রেসিডেন্সি কলেজ। বড় হয়ে তোমাদের এখানে পড়তে হবে। এখানকার মাইনে বারো টাকা।

কিছুক্ষণ কারুর মুখে কোন কথা নেই, নিঃশব্দে সবাই এগিয়ে চলেছে গড়ের মাঠের দিকে। একটু পরেই ঢং-ঢং শব্দ করতে করতে প্রথম ট্রাম বেরিয়ে গেল। ট্রামে লোক ভরতি, সবাই 'প্যারেড' দেখতে চলেছে।

মহাদেব আবার শুরু করলেন, প্রাতঃকালে ঘুম থেকে উঠেই ভগবানের নাম ক'রে পড়তে বসবে। সাতটা-আটটার সময় কিছু খেয়ে নিয়ে আবার পড়বে নটা অবধি। তারপরে স্নান ক'রে খেয়ে

ইস্কুলে যাবে। ইস্কুল থেকে ফিরে হাতের লেখা লিখবে আর অঙ্ক কষবে সন্ধ্যে অবধি। তারপরে আমি আপিস থেকে ফিরে যে উপাসনা করি, সেই উপাসনায় ব'সে ভগবানের নাম করবে। তারপরে পড়বে সেই সাড়ে নটার তোপ পড়া পর্যন্ত। তারপরে খেয়ে-দেয়ে ভগবানের নাম ক'রে শুয়ে পড়বে।

স্থিরের বয়স নয়, স্থবির কাল পাঁচ পূর্ণ হয়ে ছয়ে পড়েছে, আর অস্থিরের চার চলেছে।

চলতে চলতে প্রায় ফরসা হয়ে এল, কিন্তু কুয়াশায় তখনও স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না।

মহাদেব বললেন, মনে বড় সাধ ছিল, ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখব, কিন্তু ছেলেবেলায় বাপ-মা মারা গেলেন, কত চেষ্টা ক'রেও কিছু করতে পারলুম না।

মহাদেবের কণ্ঠস্বর শীতের কুয়াশার চেয়েও ভারী। স্থবির একবার আড়চোখে পিতার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখের দিকে চাইলে। সহানুভূতিতে তার বুকের মধ্যে মোচড় দিতে লাগল। পাশেই অস্থির চলছিল। সে খুব আস্তে তাকে বললে, একটু এগিয়ে চল্।

অস্থির চলতে চলতে হাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রায় দেড় মাইল রাস্তা চ'লে একটু বিশ্রামের জন্যে আস্তে আস্তে চলছিল। মহাদেব তার অবস্থা দেখে টপ ক'রে বাঁ হাত দিয়ে তাকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বললেন, মাথাটা ধর়্।

অস্থির তার ছোট ছোট হাত দিয়ে বাপের মাথাটা জড়িয়ে ধরলে।

স্থবির আর স্থির আগে আগে চলতে লাগল। স্থবির জিজ্ঞাসা করলে, এবার কাতে কাতে যুদ্ধ হবে দাদা?

স্থির বিজ্ঞের মত বললে, শিখে আর ইংরেজে।

কারা জিতবে?

শিখরা। কেন, গেলবারে দেখিস নি? গেলবারেও তো শিখরাই জিতেছিল।

শিখদের সঙ্গে কেউ পারে না বুঝি?

ইংরেজরা কি লড়াই করতে জানে! সব জুচ্চুরি ক'রে জেতে। এক-একটা শিখের চেহারা দেখেছিস তো?

স্থবির শিখ-সৈন্য দেখেছে। এই বয়সেই নিজের ও ভাইদের জুতো আনার জন্যে বার আষ্টেক সে কেল্লার মধ্যে গিয়েছে। কেল্লার মধ্যে পিরামিডের মতন ক'রে গোল গোলা সাজানো আছে, সারে সারে ছোট বড় কামান সাজানো আছে, মাঠের মধ্যে একটা উঁচু জায়গায় ভরতপুরের যুদ্ধে জেতা একটা বড় কামান তাও অনেকবার দেখেছে। শিখ-সৈন্যেরা দেখতে ইয়া লম্বা-চওড়া, কিন্তু ইংরেজগুলো বেঁটে বেঁটে। তবুও সেই লালমুখ কটা-কটা-চোখওয়ালা লোকগুলোকে দেখলে কি জানি তার বুকের ভেতরটা গুরগুর করতে থাকে। দাদার কাছে শুনেছে, শিখরা বড় ভদ্রলোক, কিন্তু কায়দা ক'রে ইংরেজরা তাদের কাছ থেকে দেশ কেড়ে নিয়েছে। দাদার বয়স এখন ন-বছর, এরও দেড়-দু বছর আগে থাকতেই সে এ কথা শুনে আসছে।

চলতে চলতে স্থবির বললে, ইংরেজ-সৈন্যগুলোকে দেখলে কিন্তু ভারি ভয় লাগে দাদা।

দূর বোকা! হুঁ, ভয়! সেদিন রাস্তায় একটা গোরাকে ধ'রে অ্যায়সা মার দিয়েছি যে, ব্যাটা বুঝতে পেরেছে, কার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিল।

স্থবির শিউরে উঠল। দাদা যে একজন মস্ত লায়েক লোক, এ বিষয়ে

স্থবির আর অস্থিরের কোন সন্দেহই কোনদিন ছিল না। কিন্তু তার নায়েকত্বের মাত্রা কতখানি উঁচু, আজ তার কিছু প্রমাণ পেয়ে অহঙ্কারে তার বুক ফুলে উঠল। এমন একটা সংবাদ অস্থির শুনতে পেলে না ভেবে তার দুঃখ হতে লাগল। সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, অস্থির নিশ্চিন্তে বাবার কাঁধে চ'ড়ে পেছনে পেছনে আসছে।

স্থবিরের কল্পনায় নানা ছবি প্রতিভাত হতে লাগল। কি ক'রে দাদাতে আর সেই লালমুখো ইংরেজ-সৈন্যতে ঘুঁষোঘুঁষি চলেছিল, সেই ছবি নানা আকারে ফুটে উঠতে লাগল। তাদের তিন ভাইয়ের যে বিনা অনুমতিতে দোতলা থেকে একতলায় নামবার হুকুম নেই, সোল্‌জারের সঙ্গে মারামারির উত্তেজনায় সে কথা সে স্রেফ ভুলেই গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ চলবার পর স্থবির জিজ্ঞাসা করলে, মারামারিটা কোথায় হয়েছিল দাদা?

স্থির গম্ভীরভাবে বললে, মেছোবাজারে। মেছোবাজারের নাম শুনেছিস তো?

খেলো হবার ভয়ে স্থবির বললে, মেছোবাজারের নাম আবার শুনি নি!

বড় ভয়ানক জায়গা। বড় কবিমের আখড়া সেখানে। তুই যদি সেখান দিয়ে বুক ফুলিয়ে যাস তো একটি এমন ঘুঁষো মারবে তোর বুকে যে, পিঠ দিয়ে হাত বেরিয়ে যাবে, বুঝলি?

স্থবির চমকে উঠল। ঘুঁষোটা যে কে মারবে, কেন মারবে—সে প্রশ্ন মনের মধ্যে উদয় হবার আগেই সে সংকল্প ক'রে ফেললে, আর যাই করি, মেছোবাজারের মধ্যে দিয়ে বুক ফুলিয়ে কখনও চলা হবে না।

চলতে চলতে স্থির বললে, বাঁটুলে বলেছে, আমায় শিগগির বড় করিমের সাকরেদ ক'রে দেবে।

বাঁটুলে কে ?

আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে। নাম হচ্ছে বজ্রবাঁটুল বড়াল। আমরা বাঁটুলে ব'লে ডাকি। তাদের বাড়িতেই আখড়া আছে। কিন্তু সে বড় করিমের সাগরেদ ব'লে মেছোবাজারে তারই আখড়ায় লড়তে যায়।

স্থবির এবার দাদার মর্দানির কথা ভুলে গিয়ে বজ্রবাঁটুলের কথা ভাবতে লাগল। বজ্রবাঁটুল নামটার মধ্যেই কি রকম জোয়ান জোয়ান ভাব। এই ব্যক্তি বড় করিমের সাকরেদ আর দাদার বন্ধু! গৌরব, উল্লাস ও শীত—এই ত্রিবিধ উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যেটা গুরগুর করতে লাগল।

দাদা যে-ইস্কুলে পড়ে, সেখানে কবে যে সে পৌঁছবে তার কোনও ঠিকানাই নেই। এখনও পর্যন্ত ইস্কুল যে কি বস্তু, তার চাক্ষুষ পরিচয় স্থবিরের হয় নি। দাদা ও দাদার যে-সব বন্ধু তাদের বাড়িতে আসে, তাদের মুখে গল্প শুনে ইস্কুল সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা তার হয়েছে, তার সবটুকুই মধুময় নয়। সেখানে বেত্রাঘাত আছে, গলায় ইটের মেডেল আছে, নীলডাউন আছে। তবুও ইস্কুলে যারা যায় তারা, এখনও ইস্কুলে যারা যায় নি তাদের চাইতে অনেক উচ্চশ্রেণীর লোক, নিজের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা থাকা সত্ত্বেও মনে মনে সে তা স্বীকার করে।

স্থবির শুনেছে, এবার তাকে ইস্কুলে দেওয়া হবে। তাদের বাড়ির পাশেই ব্রাহ্মদের একটা মেয়ে-ইস্কুল আছে, সেখানে ছেলেরাও পড়তে পারে, মেয়েদের মেয়ে ব'লে চিনতে পারার আগে পর্যন্ত। ছেলেদের একেবারে কঠোর পুরুষ মাস্টারদের জাঁতার মধ্যে ছেড়ে দেবার আগে

অনেক ব্রাহ্ম পরিবারের ছেলেদের এইখানেই প্রথম তালিম দেওয়া হ'ত। স্থবিরের দাদা স্থিরও একদিন এই ইস্কুলের ছাত্র ছিল। বছর দুই হ'ল, সে ছেলেদের ইস্কুলে গিয়েছে। ছেলেদের ইস্কুলে যারা পড়ে, মেয়েদের ইস্কুলের ছেলেদের তারা নেহাত নাবালক মনে ক'রে থাকে। স্থবির এখনও মেয়েদের ইস্কুলেই ঢোকে নি। মেয়েদের ইস্কুলে কতদিন পড়তে হবে, কে জানে! তারপরে ছেলেদের ইস্কুল, তারপরে বজ্রবাটুল বড়ালের মতন বন্ধু, তারপরে বড করিমের আখড়া ও মেছোবাজারের মধ্যে দিয়ে বুক ফুলিয়ে যাবার অধিকার! ওঃ, সে যে কল্পকাল!

স্থবিরের মাথায় চট ক'রে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে বললে, আমিও বড় করিমের সাকরেদ হব দাদা।

স্থির অত্যন্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে একবার স্থবিরের দিকে চেয়ে তার চেয়েও অবজ্ঞার স্বরে বললে, তোকে? তোকে এখন সাকরেদ করবে না।

হায় হায়! বছরের প্রথম দিনের সকালবেলায় নকল লড়াই দেখতে যাবার পথে এমন দারুণ দুঃসংবাদ শুনলে কার মন স্থির থাকতে পারে? স্থবিরের কণ্ঠরোধ হয়ে আসতে লাগল। জ্ঞান হয়ে অবধি দাদাকে সে আদর্শ পুরুষ ব'লে জেনেছে। দাদার মতন বিদ্যা বুদ্ধি, দাদার মতন শৌর্যশালী আজও তার অজ্ঞাত। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রাত্রে শুতে যাবার সময় পর্যন্ত দাদা যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ সে পার্শ্বচরের মতন তার আশেপাশে থাকে। সেদিন ছাতের ওপর ব'সে যখন চিলেকোঠার দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাদা গান গাইছিল—'তুমি মম সুধাসম চিরজীবনে', গানের কথার মানে বুঝতে না পারলেও সুরটা তার ভাল লেগেছিল। কিন্তু ভাল লাগলে কি হবে! পরে সে ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রত্যেক পাতায় তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছে,

এ গান তার মধ্যে নেই। ব্রহ্মসঙ্গীতের পাতায় যে গান নেই, সে গান যে অগের, অন্তত তাদের বাড়িব ছাতে ব'সে যে সে গান গাওয়া গৃহদণ্ড-বিধি অনুসারে মহা বিদ্রোহিতাব অপরাধ, সে পরমতত্ত্ব জেনেও মাকে সে কথা ব'লে দেয় নি। এই সব আনুগত্যের প্রমাণ সত্ত্বেও স্থির যখন অতি নির্মমভাবে প্রকাশ করলে যে, তাকে বড় করিমের সাকরেদ করা হবে না, তখন স্থবিরের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ল।

স্থির একবার ভাইয়ের মুখেব দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা, আগে আমি সাকরেদ হই, তারপর তোকে নিয়ে যাব। বাড়িতে কিছু বলিস নি যেন।

বছরের প্রথম দিনে স্থবির হাতে স্বর্গ পেল।

* * *

গড়ের মাঠ। আজ যেখানে কার্জন উদ্যান, সেদিন সেখানে বড় পুকুর ছিল ও সেইখান থেকেই মাঠ শুরু। মনুমেণ্টের নীচে অসংখ্য লোকসমাগম হয়েছে। ফরসা হয়ে গেলেও কুয়াশায় সব ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে না। ভিড়ের অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক। আজকাল যেমন নিম্নশ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সংমিশ্রণ হয়ে গেছে, তখন তা ছিল না। তখনকার দিনে পয়সা রোজগারের মাপকাঠিতে ভদ্রলোক ছোটলোকদের বিচার হ'ত না। কে যে কোন্ শ্রেণীর লোক, তা একটা পাঁচ বছরের ছেলেও মুখ দেখেই ব'লে দিতে পারত।

মানুষের চীৎকারে অত শীতেও জায়গাটা গরম হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ লোকই চেঁচাচ্ছে হারানো সঙ্গীদের নাম ধ'রে। থেকে থেকে হঠাৎ ভিড়ের খানিকটা এক দিকে দৌড়ে আবার থেমে যাচ্ছে। ব্যাপার কি?

স্থবির দেখলে, তিনটে পুলিস হাজার তিনেক লোকের মাথায় বেপরোয়া রুল মারছে। সেই দৃশ্য দেখে অস্থির কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। স্থবির বললে, কাঁদিস নি, আমার হাতখানা চেপে ধর্।

অস্থির তার ছোট হাত দিয়ে স্থবিরের একখানা হাত প্রাণপণে চেপে ধরলে।

মহাদেব পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, তিনজনে হাত-ধরাধরি ক'রে থাক, নইলে হারিয়ে যাবে। হারিয়ে গেলে পকেটে যে কার্ড আছে, সেই কার্ড পুলিসকে দেখালে বাড়িতে পৌঁছে দেবে। খবরদার, পুলিস ছাড়া অন্য কাউকে কার্ড দেখিও না।

কার্ডখানা ঠিক আছে কি না দেখবার জন্যে স্থবির একবার পকেটে হাত দিয়ে দেখলে, কমলালেবুটা তখনও অনাদৃত অবস্থায় প'ড়ে আছে। পিতার অলক্ষ্যে সেটাকে পকেটেই ছাড়িয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করছে, এমন সময় হঠাৎ সেই বিশাল জনসমুদ্র ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। দেখা গেল, লোকেরা জ্ঞানশূন্য হয়ে দিগ্বিদিকে ছুটতে আরম্ভ করেছে। সে কি দৌড়! দৌড় বলা ঠিক হবে না, লোকগুলো যেন চারদিকে ছিটকে পড়তে লাগল। স্থবিররা তিন ভাই একত্রে এক জায়গায় ঠিকরে প'ড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দেখলে, তিন-চারটে ঘোড়সওয়ার পুলিস সেই বিপুল জনসংঘের ওপর দিয়ে নির্মমভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। সওয়ারদের মধ্যে দুটো লালমুখো আর দুটো দিশী। দিশী সওয়ারদের মধ্যে একজন শিখ, আর একজন বোধ হয় পাঠান হবে। তার দুই গালে গালপাট্টা আর ইয়া গোঁফ। এরা দুজনে ভিড়ের ওপরে শুধু ঘোড়া চালিয়ে নিশ্চিন্ত নয়, সেই নিরস্ত্র নিরীহ তামাশা-বিলাসীদের নিদারুণ যষ্টিপ্রহারে জর্জরিত করতে করতে ছুটে আসছে।

স্থবিরের পাশ দিয়েই একটা সওয়ার তীরবেগে বেরিয়ে গেল।

তিন ভাই অবাক হয়ে দেখলে, ঘোড়ার নাক-মুখ আর গা দিয়ে হু-হু ক'রে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। স্থবির বললে, দাদা, ঘোড়াটার পেটে আগুন লেগেছে।

স্থির বললে, দূর বোকা! এই দেখ্, আমার মুখ দিয়েও ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

এই ব'লে স্থির একবার হা দিতেই তার মুখ দিয়েও ভকভক ক'রে খানিকটা ধোঁয়া বেরুল। এবার স্থবিরও একবার হা দিয়ে দেখলে, তার মুখ দিয়েও ধোঁয়া বেরুচ্ছে। অস্থিরও একবার দেখলে। তারপর দেখা গেল, মাঠের সেই হাজার হাজার লোকের মুখ দিয়ে হু-হু ক'রে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। অস্থির বললে, দাদা, সবার মুখেই আগুন লেগেছে।

মুখপোড়াদের দল দৌড়তে দৌড়তে রেড রোড পার হয়ে, এখন যেখানে যুদ্ধের মৃত সৈন্যদের স্মৃতিস্তম্ভ হয়েছে, সেই মাঠে এসে হাঁপাতে লাগল।

এতক্ষণ প্রাণভয়ে ও উত্তেজনায় পিতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ছেলেরা একেবারেই উদাসীন হয়ে পড়েছিল। সওয়াররা ভিড়কে সেইখান অবধি পৌঁছে দিয়ে যখন চ'লে গেল, তখন স্থির বললে, বাবা কোথায়?

মহাদেব কাছাকাছিই ছিলেন। তিনি ভিড় ঠেলে ছেলেদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কাছ থেকে দূরে স'রে যাওয়ার অপরাধে এখুনি হয়তো স্থিরকে বকুনি খেতে হবে, এই আশঙ্কায় স্থবিরের মনটা করুণ হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু সে বাপের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে, তিনি যেন কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।

মাঠের মধ্যে তখনও ঘন কুয়াশা। দূরে গাছপালা, লাটের বাড়ি কিংবা জাহাজের মাস্তুল কিছুই দেখা যায় না। পূর্বদিকে সূর্য উঠেছে, কিন্তু তার যেন কোন তেজই নেই। সূর্যকিরণ সেই ঘন কুয়াশার ওপর

পড়েছে বটে, কিন্তু তা ভেদ করতে পারছে না; জলের ওপরে তেলের ফোঁটাগুলো যেমন ক'রে ভাসতে থাকে, তেমনই ধোঁয়াটে কুয়াশার মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় খানিকটা ক'রে আলো ভাসছে মাত্র।

ভিড়ের মধ্যে নানা আকারের, নানা শ্রেণীর, নানা বয়সের লোক, তার মধ্যে লম্বা ওভারকোটওয়ালা থেকে আরম্ভ ক'রে লেংটি-পরা লোক পর্যন্ত। প্রায় সকলেই চীৎকার করছে, অধিকাংশই হারানো সঙ্গীদের নাম ধ'রে—বাংলা, উড়িয়া, মেছোবাজারী উর্দু এবং গয়া ও ছাপরা জেলার হিন্দী মিলিয়ে বিচিত্র সে কলরব!

স্থির স্থবির ও অস্থির যে জায়গাটাতে এসে দাঁড়াল, তারই কাছে পাঁচ-ছজন লোক উবু হয়ে ব'সে বিড়ি ফুঁকছিল, আর যাকে কাঁচা খিস্তি বলে, তাই ছোটাচ্ছিল। স্থির স্থবির ও অস্থির তিনজনেরই সে ভাষা অজ্ঞাত। তবুও যৌনবিজ্ঞানের পরমতথ্যপূর্ণ সেই রহস্যময় বাক্যগুলি শিশুমনের সংজ্ঞাত আকর্ষণে তাদের মনে একেবারে মুদ্রিত হয়ে যেতে লাগল। সেই কথাগুলো শুনতে শুনতে স্থির ও স্থবিরের মনে একটা নতুন চেতনার ইঙ্গিত উঁকি মারতে লাগল। যদিও অজ্ঞান আঁধারে তা মগ্ন, নিষেধ-শাসনের শঙ্কা ও অজানার কঠিন আবরণে তা আচ্ছন্ন, তবুও সে ইঙ্গিত রহস্যময়।

তিন ভাই একমনে লোকগুলোর কথা গিলছে, এমন সময় ভিড়ের চীৎকার যেন বেড়ে উঠল। কুয়াশার আবছায়ার মধ্যে দিয়ে দূরে দেখা গেল, চার-পাঁচজন সওয়ার সেই ভিড়ের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ভিড়ের মধ্যে সওয়ারেরা ঢুকে পড়তেই লোকে দিগ্বিদিকে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সওয়ারদের হাতে এক-এক গাছা ক'রে বেতের খেঁটে, আর তারা ঘোড়ার ওপর ব'সে সেই খেঁটে দিয়ে সজোরে মারতে মারতে সেই বিশাল ভিড় তাড়িয়ে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে

চলতে লাগল। প্রায় দশ হাজার লোকের ভিড়—সওয়ার পুলিস বোধ হয় সর্বসমেত পাঁচটা। তার মধ্যে একজন গোরা আর বাকি চারটে দিশী লোক। স্থবির অবাক হয়ে দেখলে, দিশী সওয়ারেরাই মারছে, তারা একজনও বাঙালী নয়, গোরা-সওয়ার পেছনে পেছনে আসছে মাত্র।

মধ্যে মধ্যে কতকগুলো লোক আনমনায় তাদের নাগালের বাইরে চ'লে যাওয়ামাত্র তারা ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের কাছে গিয়ে নিৰ্দ্দম প্রহারের তাড়নায় ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। তারপরে সেই বিশাল জনসাগর এগিয়ে চলতে লাগল, পেছনে ও পাশে তাদের পাঁচটি সওয়ার পুলিস কুকুর যেমন ক'রে পালে পালে মেষ তাড়িয়ে নিয়ে চলে, একটিকেও যূথভ্রষ্ট হতে না দিয়ে।

মহাদেব কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে ঢুকলেন না। সওয়ারদের কাণ্ড দেখেই তিনি ছেলেদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, এইখানে দাঁড়িয়ে থাক, এক পা নড়বে না।

স্থির ও স্থবির বাপের দু-পাশে দাঁড়াল। অস্থিরকে তিনি নিজের কাছে টেনে নিলেন। তাদের চোখের সামনে সেই প্রহৃত ও তাড়িত নরসমুদ্র দূর হতে ক্রমেই দূরতর হতে লাগল। ক্রমে তারা আবার রেড রোড পেরিয়ে ওপারে চ'লে গেল। তারপর সমস্ত ছবিখানার ওপর ধূসর কুয়াশার আবরণ প'ড়ে গেল।

জনশূন্য সেই ময়দানে মহাদেব তিন ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন —স্থির পাথরের মূর্তির মতন। ওই যে জনসমুদ্র পশুর মত তাড়িত হতে হতে চোখের সামনে মিলিয়ে গেল, তিনি যেন তাদেরই অন্তরাত্মা। তিনি যেন এই লাঞ্ছিত, প্রহৃত, অপমান বোঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত অপহৃত পশুমনোভাবাপন্ন মানবকুলের মূর্তিমান প্রতিবাদের মতন অটল হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্থবির একবার স্থিরের মুখের

দিকে চেয়ে দেখলে, তার অত বড় পালোয়ান এবং সর্ববিদ্যাবিশারদ বজ্রবাঁটুল বড়ালের বন্ধু ন-বছরের দাদার মুখ কিসের চিন্তায় যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। একবার আড়চোখে বাপের দিকে চেয়ে দেখলে, পিতার গৌরবর্ণ মুখের ওপর বালসূর্যের কিরণ প'ড়ে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রশস্ত ললাটের বাঁ দিকে একটা এক আঙুল চওড়া কাটা দাগ—ঠিক ভ্রূর নীচ থেকে আরম্ভ ক'রে সোজা মাথার ভেতর পর্যন্ত চ'লে গেছে। তাঁর স্বভাববিষণ্ণ গম্ভীর মুখ কি যেন একটা গভীর বেদনায় কাতর।

কিছুক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর মহাদেব অস্থিরকে কোলে তুলে নিয়ে ছোট্ট একটি কথায় বললেন, চল!

লোকের ভিড়কে যে দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, মহাদেব সেই দিক লক্ষ্য ক'রে চললেন। প্রায় দশ মিনিট মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে রাস্তা পার হয়ে তারা আর একটা মাঠে গিয়ে পৌঁছল। এখানে বিষম ভিড়, এইখানেই তামাশা দেখানো হবে।

স্থির আর স্থবির হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, যুদ্ধ আরম্ভ হয় নি তা হ'লে!

একটা মস্ত জায়গা দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। দড়ির চার-দিকে মানুষ দাঁড়িয়ে। কুয়াশা কেটে যাওয়ায় সব বেশ ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে। মহাদেব ঘুরে ঘুরে অপেক্ষাকৃত একটু ফাঁকা জায়গা আবিষ্কার ক'রে বয়সের তারতম্য ও উচ্চতা অনুসারে আগে অস্থির, তারপরে স্থবির ও পরে স্থিরকে দাঁড় করিয়ে সবার পেছনে তিনি আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন, ধাক্কা সামলাবার জন্যে।

তখনও চারিদিক থেকে দলে দলে পালে পালে লোক আসছে। দেখতে দেখতে মহাদেবের পেছনে আরও তিন-চার থাক লোক দাঁড়িয়ে গেল। লোকের ধাক্কাধাক্কিতে লাইন ঠিক রাখা মুশকিল। পেছন থেকে

মাঝে মাঝে আচম্‌কা এমন এক-একটা ঢেউ আসে, যার ঠেলা সামনের লোকেরা সামলাতে না পেরে দড়ির ওদিকে অর্থাৎ ঘেরা জায়গার মধ্যে গিয়ে পড়তে থাকে। দড়ির ওধারে দিশী কন্‌স্টেব্‌ল পাহারা দিচ্ছিল। তারা ছুটে এসে ছিট্‌কে-পড়া লোকদের রুলের আঘাতে জর্জরিত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাতৃকুলের উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে লাগল। কথায় যদি বংশবৃদ্ধি হ'ত, তা হ'লে বৎসরের প্রথম দিনের প্রভাতে এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কলকাতার লোকসংখ্যা বোধ হয় দ্বিগুণ হয়ে যেত।

ওদিকে মাঠের মধ্যে তখন মহাব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছে। খচ্চরবাহিত কামান-গাড়ি ঝমঝম আওয়াজ করতে করতে এসে এক দিকে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াতে লাগল। দলে দলে জঙ্গী গোরা ও ঘোড়-সওয়ার ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। তাদের দেখে স্থবিরের মনে হতে লাগল, আসল যুদ্ধ এখনও লাগে নি, এ বোধ হয় যুদ্ধের আগের ঝগড়াঝাঁটি চলেছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ব'লে উঠল, ওই দেখ, তুরুক-সওয়ার আসছে।

দেখা গেল, মাঠের এক দিক দিয়ে একদল ঘোড়-সওয়ার ছুটে আসছে। স্থবির ভাবতে লাগল, এগুলোকে তুরুক-সওয়ার কেন বলে?

হায় রে তুরুক! তুমি কবে এলে, কখন উড়ুক হয়ে গেলে, তার ওপরে ইতিহাসের অনেক পাতা চাপা প'ড়ে গেছে, কিন্তু তোমার ভূত এখনও আমাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ স্থবিরের চোখে পড়ল, যেন একখানা মাঠজোড়া রঙিন ছবি বনবন ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। কালো কুচকুচে পেণ্টুলান, লাল টকটকে কোট, অদ্ভুত এক রকমের টুপি মাথায়,

সঙিন-লাগানো বন্দুক উঁচু ক'রে সহস্র পায়ে এগিয়ে আসছে। অপরূপ সে ছবি! সকালের সোনালী রোদ ঝক্‌ঝকে কিরিচগুলোর ওপর প'ড়ে মনে হচ্ছিল, যেন কোন্ স্বপ্নপুরীর মানুষ তারা, বিদ্যুতের নিশান উড়িয়ে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছে।

খুব কাছে আসতে তবে তারা বুঝতে পারলে, সেটা একদল সৈন্য। ঠিক এই রকম পোশাক-পরা গোরা-সৈন্যের একটা রঙিন ছবি তাদের বাড়িতে আছে। স্থবির অস্থিরকে নাড়া দিয়ে বললে, দেখেছিস? ওরা সব সোল্‌জার।

কিছুক্ষণ বাদে ছোটলাট অর্থাৎ তখনকার দিনের লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর, তার একটু পরে বড়লাট অর্থাৎ গভর্নর জেনারেল বড় বড় ফিটনে চ'ড়ে এল। তারা আসতেই সেই কামানের সারির একটা একটা ক'রে ফুটতে লাগল, দুম্—দাম্।

স্থবির অস্থিরকে বললে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

তাদের সামনেই একেবারে দড়ি ধ'রে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, বয়েস তার সাতাশ-আটাশ বছর হবে, বেঁটে আর বেশ ষণ্ডা-গোছের চেহারা। বোধ হয় মাসখানেক আগে তার মাথা কামানো হয়েছিল, এখন আধ ইঞ্চিটাক খোঁচা খোঁচা চুল বেরিয়েছে—এই লোকটা এতক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে খুব মজার মজার কথা ব'লে লোক হাসাচ্ছিল। স্থবিরের কথা শুনতে পেয়ে সে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললে, যুদ্ধ এখনও শুরু হতে দেরি আছে খোকা।

লোকটা এমন ভাবে কথাগুলো বললে যে, আশপাশের লোকগুলো সব হেসে উঠল। স্থবির অপ্রস্তুত হয়ে এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল, যেন কথাগুলো তাকে উদ্দেশ ক'রে বলা হয় নি। ঠিক সেই সময় মাঠের মধ্যে চড়চড় ক'রে আওয়াজ হতেই সবাই সেদিকে ফিরে দেখলে

যে, গোরা-পল্টনের সার বন্দুক ছুঁড়ছে। গোরাদের বন্দুকের আওয়াজ শেষ হতেই দিশী সৈন্যেরা বন্দুক ছুঁড়লে। তার পরে ফটাফট চটাচট দুম্‌দাম্‌ শব্দের পাগলা হর্‌রা শুরু হয়ে গেল।

মাঠের মধ্যেকার এই মহাযুদ্ধ দর্শকের প্রাণেও অনুপ্রাণিত হতে বিলম্ব হ'ল না। হঠাৎ তাদের মধ্যেও ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। এই রকম যখন সামনে-পেছনে ভীষণ ঠেলাঠেলি চলেছে, সেই সময় পেছন থেকে একটা প্রবল ধাক্কা আসায় সামনের সেই বেঁটে ষণ্ডা লোকটা কি রকমে ছটকে একেবারে দড়ির ওপারে গিয়ে পড়ল। দড়ির ধারে ধারে ঘুরে যে পাহারাওয়ালা সেখানকার শান্তিরক্ষা করছিল, এই দৃশ্য দেখে সে তিন লাফে সেখানে এসে হাতের রুল দিয়ে লোকটার মাথায় সজোরে টাঁই টাঁই ক'রে আট-দশ ঘা বসিয়ে দিলে।

নিমেষের মধ্যে সেই বিষম ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি থেমে গেল। স্তম্ভিত জনমণ্ডলী নিৰ্বাক বিস্ময়ে সেই পাহারাওয়ালাটার দিকে চেয়ে রইল। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশের লোক সেই ভিড়ের মধ্যে ছিল—পাঁচ বছরের শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে সত্তর বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত—ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, ভদ্রলোক, ছোটলোক, কেরানী, ব্যবসাদার ও অন্য চাকুরে; কারুর মুখ দিয়ে একটা ছোট্ট প্রতিবাদ—একটু সহানুভূতির ভাষা বেরুল না।

এই অত্যাচারের মধ্যেই বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের বীজ প্রোথিত হয়ে ছিল।

মা'র খাবার সময় লোকটার মুখে যে যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠল, স্থবির চারিদিকে চেয়ে দেখলে, অনেকের মুখেই সেই যাতনার প্রতিবিম্ব পড়েছে। একবার পেছনে ফিরে দেখলে, স্থিরের চোখ দুটো ছলছল করছে।

মানুষ মানুষকে মারছে—এ দৃশ্য স্থবিরের চোখে নতুন নয়। তার বাবা তো প্রায় প্রতিদিনই স্থিরকে মারেন। পাঁচ বছর জীবনের মধ্যে সেও মার খেয়েছে অনেকবার। কিন্তু প্রহারের এমন বীভৎস রূপ ইতিপূর্বে সে দেখে নি। তার মনে হতে লাগল, ওই লোকটার বদলে তার বাবা যদি ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন! এই চিন্তা তার মনকে আঁকড়ে ধ'রে এমন পীড়া দিতে লাগল যে, সে অস্থির হয়ে উঠল।

বাবার হাতে প্রহারকে সে অত্যন্ত ভয় করত, কিন্তু সেদিন বুঝতে পারলে, পুলিসের মার বাবার মারের চেয়ে অনেক সাংঘাতিক।

প্রহৃত লোকটা ওই ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে দু-পা পেছিয়ে এসে আবার লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়াল। লজ্জায় অপমানে সে আর কারুর দিকে না চেয়ে মাঠের দিকে চেয়ে রইল। মিনিটখানেক এই ভাবে কাটবার পর ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন লোক চেঁচিয়ে তাকে বললে, এই, তোমার মাথা ফেটে গেছে, রক্ত পড়ছে যে!

সবার দৃষ্টি এক'ঙ্গে গিয়ে পড়ল তার মাথার ওপরে। দেখা গেল, তার দুই কাঁধ আর ঘাড়ের কাছে জামাটা রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে। স্থবির দেখলে, তার কানের পাশ দিয়ে রক্তের একটা সরু ধারা নেমে এসে জামার ওপর পড়ছে।

এই দৃশ্য দেখে জনতার মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। এদের মধ্যে যারা অসমসাহসী, তারা সেই কন্‌স্টেব্‌লের অমানুষিক: অত্যাচারের ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মাঠের মধ্যে তখনও দুম্‌দাম্, চড়পড় আওয়াজ চলেছে—হঠাৎ সেই চার-পাঁচ সার মানুষের স্তর ভেদ ক'রে মহাদেব একেবারে সামনে এসে আহত লোকটাকে ধ'রে চীৎকার ক'রে উঠলেন, এই, কে—কোন্ পাহারাওয়ালা তোমায় মেরেছে?

পাহারাওয়ালার মারের ধমক তখনও সে সামলে উঠতে পারে নি। তার হয়তো মনে হ'ল, এ লোকটাও বোধ হয় পুলিসেরই লোক। একজন মাথা ফাটিয়ে গেছে, এ বোধ হয় হাতটা-পাটা ভেঙে দেবে।

মহাদেব আবার চীৎকার ক'রে উঠলেন, কে মেরেছে, বল ?

ইতিমধ্যে যে পাহারাওয়ালাটা মেরেছিল, বীরদর্পে পা ফেলতে ফেলতে সে সেখানে এসে দাঁড়াল। আহত লোকটা কাঁপতে কাঁপতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, ওই লোকটা মেরেছে।

পাহারাওয়ালা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ধম্‌কে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে ?

মহাদেব তাকে বলতে লাগলেন, তুমি একে মেরেছ ? দেখ দিকিন, এর মাথাটা ফেটে গিয়েছে। পুলিসের চাকরি কর ব'লে কি মানুষের চামড়া তোমার গায়ে নেই ! ওর যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তো ওকে ধ'রে নিয়ে থানায় যাও, হাকিম আছে, সে সাজা দেবে। তুমি কে হে সাজা দেবার ?

পাহারাওয়ালা মহাদেবকে ধম্‌কে উঠল, তুমি কে হে ?

প্রশ্ন শুনে মহাদেব একটু হক্‌চকিয়ে গেলেন। কিন্তু পর-মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, আমাকে চিনতে পারছ না—আমি তোমার বাবা।

পেছনের লোকেরা হো-হো ক'রে হেসে উঠল। স্থির ও অস্থির—তারা এই বয়সেই বাপকে কিছু কিছু চিনেছিল, তারা হাসতে পারলে না। মহাবিপদের সূচনায় তাদের শিশুহৃদয় শঙ্কিত হয়ে উঠল। স্থবিরের মনে হতে লাগল, এই সময় মা যদি কাছে থাকত, তা হ'লে এ হাঙ্গামা আর বাধতেই পারত না।

মহাদেবের মুখে ওই কথা, তার ওপরে যে লোকগুলো এতক্ষণ তার দাপটের চোটে কেঁচো হয়ে ছিল, তাদের সেই ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি শুনে

পাহারাওয়ালা-পুঙ্গব একেবারে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে চীৎকার ক'রে উঠল, কি বললে?

মহাদেব নীচু হয়ে দড়ি গ'লে বাইরে একেবারে তার সামনে গিয়ে তারস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলেন, আমি তোর বাপ। এই নিরপরাধ লোককে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করার জন্যে আমি তোমায় এমন সাজা দোব যে, চিরকাল বাবাকে মনে থাকবে।

এবার আর জনতার মধ্যে হাসির হর্রা উঠল না, বরং ব্যাপারটা ক্রমেই সাংঘাতিক আকার ধারণ করছে দেখে ভিড়ের লোক আস্তে আস্তে স'রে পড়তে আরম্ভ করলে।

আজকের দিনে বাঙালীর চোখে এ ব্যাপারটা অত্যন্ত লজ্জাকর ঠেকতে পারে। কিন্তু ক্রীশ্চান আঠারো শো ছিয়ানব্বই অব্দে কলকাতার নকল যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পাহারাওয়ালাকে গালাগালি দেওয়া এবং মারতে উদ্যত হওয়া তো দূরের কথা, সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখতে পারে এমন লোকও এক লক্ষে একটাও ছিল না।

কথাগুলো ব'লেই মহাদেব গায়ের র‍্যাপারখানা খুলে ভিড়ের মধ্যে ফেলে দিতেই স্থির সেখানা লুফে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলে। ওদিকে পাহারাওয়ালাটা ফিরে গজ পঁচিশেক দূরে তার জুড়িদারকে হাঁকলে। জুড়িদার তখন সেদিকে ভিড়ের ওপর রুলের গুঁতো চালিয়ে শান্তিরক্ষার চেষ্টা করছিল। একবার এদিকে চেয়ে আবার সে নিজের কর্তব্যে মন দিলে।

জুড়িদারের মুখ দেখে পাহারাওয়ালার বুকে বোধ হয় সাহস ফিরে এল। সে রুল উঁচিয়ে মহাদেবকে বললে, শূয়োরের বাচ্চা, শিগগির দড়ির ওপারে যাও, নইলে এই রুল দেখছ—

মহাদেব এবার জামাটা খুলে মাঠের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে—

এই ব'লে তার হাত থেকে রুলটা টপাস ক'রে কেড়ে নিয়ে বললেন, মাথার পাগড়ি খোল, এর খালি মাথায় যেমন মেরেছ, তেমনই তোমারও খালি মাথায় মারব—যতক্ষণ না রক্ত বেরোয়।

মহাদেবের চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতি আর সাড়ে উনিশ ইঞ্চি বাহুর বেড় দেখে পাহারাওয়ালার বাচ্চা স্তম্ভিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মহাদেব চীৎকার করতে লাগলেন, খোল মাথার পাগড়ি। পাগড়ির ওপরে মারলে লাগবে না, তোমার খালি মাথায় মারব—ব্যাটা, মনে করেছ কি? খোল পাগড়ি।

প্রতি নিশ্বাসে তিনি যেন ফুলতে লাগলেন।

পাহারাওয়ালার মুখে বাক্য নেই। রুল ফেলে সে চ'লেও যেতে পারে না। ততক্ষণে ভিড় অনেক পাতলা হয়ে গেছে; ওদিকে একটু দূরে এমন ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেছে যে, তিন-চারটে পাহারাওয়ালা মিলে ভিড়ের ওপর নির্দ্দয় রুল পিটেও সামলাতে পারছে না। স্থবির ও অস্থির হাউহাউ ক'রে কান্না জুড়ে দিয়েছে। স্থির বেচারী বাপের র‍্যাপারখানা হাতে নিয়ে কাঁদ-কাঁদ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মাঠের মধ্যে দুম্‌দাম্ ফটাফট তো চলেইছে—সব আওয়াজ ছাপিয়ে মহাদেবের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—খোল পাগড়ি, নিজের হাতে খুলতে হবে। মাথায় রুলের বাড়ি কি রকম লাগে, তা তোমাকে একটু বুঝিয়ে দোব।

এদিকে ভিড় একটু পাতলা হতেই আহত লোকটি ব'সে পড়েছিল। মহাদেব যখন এই ভাবে চেঁচাচ্ছেন, তারই মধ্যে সে শুয়ে পড়ল। ভিড়ের লোকেরা বলতে লাগল, অজ্ঞান হয়ে গেছে, হাওয়া ছেড়ে দাও, স'রে যাও—

কথাগুলো মহাদেবের কানে যেতেই তিনি পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। তারপরে রুলটা মাটিতে ফেলে, একেবারে সেই লোকটার পাশে গিয়ে

ব'সে পড়লেন। পাহারাওয়ালা-নন্দন ইত্যবসরে তার রুলটা টপ ক'রে তুলে নিয়ে ধীরপদভরে বিপরীত দিকে হনহন ক'রে চ'লে গেল।

মহাদেব বললেন, কেউ দয়া ক'রে একটু জল এনে দিতে পারেন ?—লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন বললে, এখানে জল কোথায় ? ওই পুকুর আছে একটু দূরে।

মহাদেব একবার করুণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে টপ ক'রে মাটি থেকে জামাটা তুলে কাঁধে ফেললেন। তারপরে ঠিক সেই ভাবেই টপ ক'রে লোকটাকে দু-হাতে তুলে ভিড় ঠেলে ফাঁকায় গিয়ে চীৎকার ক'রে বললেন, স্থির, স্থবির, অস্থির, বেরিয়ে এস।

হুকুম পাওয়ামাত্র ছেলেরা ভিড ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপরে মহাদেব হু-হু শব্দে ছুটতে আরম্ভ ক'বে দিলেন—ছেলেরা তাঁর পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

আজকের বেঙ্গল ক্লাবের সামনে মাঠের মধ্যে যে বড় পুকুর আছে, মহাদেব দৌড়তে দৌডতে এসে সেখানে লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। দৌড়বার সময়, ঝাঁকুনিব চোটেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, লোকটার ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছিল। তাকে মাটিতে শুইয়ে দিতেই সে ফ্যালফ্যাল ক'রে চাইতে লাগল। মহাদেবের সেদিকে হুঁশই নেই, তিনি তড়তড় ক'রে পাড দিয়ে জলের দিকে নেমে গেলেন।

ঘাটবিহীন পুকুর, চারদিকেই আঘাটা। গড়ানে পাড় দিয়ে জলের দিকে এগুতে গিয়ে কি রকম ক'রে পা হড়কে মহাদেব একেবারে প্রায় কোমর-জলের মধ্যে পড়লেন। তারপরে সে কি টানাটানি আর ধস্তাধস্তি! পুষ্করিণী পাঁকে পরিপূর্ণ। মহাদেবের দুই পা একেবারে

হাঁটু অবধি পাঁকে ব'সে যাচ্ছে। এক পা তোলেন তো আর এক পা ব'সে যায়—ভারী শরীর, পাঁকে সামলাতে পারেন না। কিছুক্ষণ আগেই যে-লোক ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের পাহারাওয়ালাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, এক হাঁটু পাঁকের মধ্যে তাঁর এই আঁকুপাঁকু অসহায় অবস্থা দেখলে করুণার উদ্রেক হয়।

যা হোক, অনেক কষ্টে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে তো তিনি পাড়ে উঠলেন। এক পাটি জুতো জলের তলাতেই র'য়ে গেল। ওদিকে আহত লোকটি ততক্ষণে উঠে বসেছে। মহাদেব কোঁচা নিংড়ে নিংড়ে তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে লাগলেন। একবারে হ'ল না, বার দু-তিন কোঁচা ভিজিয়ে আনতে হ'ল। তারপরে কোঁচাটা ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ আরম্ভ হ'ল। সে এক অদ্ভুত ব্যাণ্ডেজ! একটা চোখের একটুখানি ছাড়া লোকটার কান মাথা মুখ গলা পর্যন্ত সব সেই ব্যাণ্ডেজে ঢাকা প'ড়ে গেল।

যা হোক, পঞ্চাশ বার খুলে, ঠিক ক'রে, আবার বেঁধে, আবার খুলে —এই রকমে ঘণ্টাখানেক ধ'রে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পালা শেষ ক'রে মহাদেব আবার জলে নামলেন জুতো খুঁজতে। কিন্তু আধ ঘণ্টা ধ'রে: জলের মধ্যে ডুবোডুবি ক'রেও সে পাটির যখন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তিনি হতাশ হয়ে উঠে পড়লেন। তাঁর মাথা থেকে পা সর্বাঙ্গ কর্দমলিপ্ত, ধুতি যতটুকু অবশিষ্ট আছে তার দ্বারা কোন রকমেই ভদ্রভাবে লজ্জা-নিবারণ হয় না।

অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে জামাটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে তিনি কাঁধে ফেলে স্থিরের হাত থেকে র‍্যাপারটা নিয়ে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিলেন। তারপরে সেই কাদা-লেপ্টানো এক পাটি জুতো হাতে নিয়ে ছেলেদের বললেন, চল।

লোকটা তখনও সেখানে ব'সে ছিল। দু-পা এগিয়ে গিয়ে মহাদেব

আবার তার কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাড়ি যেতে পারবে ?

ব্যাণ্ডেজমণ্ডিত মুখ তুলে মহাদেবের দিকে কৃতজ্ঞভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে বললে, বাবু, তুমি বড় ভাল লোক। তুমি বাড়ি যাও, আমি একলাই যেতে পারব।

মহাদেব একটু হেসে বললে, এমন তামাশা আর দেখতে এসো না, বুঝলে ?

চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে মহাদেব চলেছেন। আবক্ষ কালো দাড়ি কাদা ও জলে প্রায় জটিয়া-বাবা। গায়ে একখানা রুক্ষ কমলালেবু রঙের আলোয়ান, পরনে আধখানা ধুতি, হাতে কাদা-মাখানো এক পাটি জুতো। পেছনে তিন ছেলে গট্‌গট্‌ ক'রে চলেছে। দুধারী লোক এই অপূর্ব শোভাযাত্রা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখতে লাগল।

মহাদেবের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর দৃষ্টি একেবারে সম্মুখে নিবদ্ধ, মুখে বাক্য নেই, ছেলেদের উপদেশ দেওয়া বন্ধ। তারা পেছনে আছে কি না-আছে, সে জ্ঞানও তাঁর নেই—বন্‌বন্‌ ক'রে তিনি এগিয়ে চলেছেন। ছেলেরা তাঁর সঙ্গে সমানে চলতে পারছে না, ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছে। এমনই ক'রে পিতা ও পুত্রদের মধ্যে ব্যবধান বাড়তে লাগল। তারপর কখন যে তিনি দৃষ্টির আড়ালে জনতার মধ্যে হারিয়ে গেলেন, ছেলেরা তা বুঝতেই পারলে না।

স্থির, স্থবির ও অস্থির তাদের শিশুসামর্থ্যে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি চলেছে। বাপকে দেখতে না পেলেও রাস্তা তাদের চেনা। হঠাৎ স্থবিরের মনে পড়ল, পকেটের কমলালেবুটা তখনও অনাদৃত অবস্থায় প'ড়ে আছে। টপ ক'রে পকেটের মধ্যে হাত পুরে আধ-ছাড়ানো নেবুটা বের ক'রে সে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

আর এক রাত্রিশেষের কথা। মাঘ মাসের প্রায় মাঝামাঝি, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব চলেছে। রাত্রি প্রভাত হ'লেই ১১ই মাঘ, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। এই এগারোই মাঘ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোকদের বড়দিন। মহাদেব রাত্রি তিনটেয় উঠে উপাসনা সেরে ছেলেদের তুলেছেন। তারা মনে করেছিল, বাবা একলাই ভোরে মন্দিরে চ'লে যাবেন, কিন্তু তা হয় নি।

মফস্বলের অনেক ব্রাহ্ম-পরিবার এই উৎসব উপলক্ষ্যে কলকাতায় আসেন। এই ১১ই মাঘের দিনটা অনেকেই সারা দিন ও রাত্রের উপাসনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মন্দির ও মন্দিরপ্রাঙ্গণে কাটান। কলকাতাবাসী অনেকেও তাই করেন। এই সময়ে দূর থেকে এমন অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে আসে, যাদের বছরের মধ্যে উৎসবের এই দিনগুলি ছাড়া অন্য সময়ে আর আসা হয়ে ওঠে না। এই দিনগুলি ছোট ছেলেমেয়েদের মহা আনন্দের দিন। কত পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে, কত মজার কথা, কত রকমের খেলা—শাসনমুক্ত নিরঙ্কুশ সেই দুর্লভ দিন—চণ্ডালের খুলিতে স্বাতী নক্ষত্রের জলের মতন দুর্লভ সেই দিনটির সকাল মন্দিরে ব'সে উপাসনার জন্যে তৈরি হয় নি।

স্থির, স্থবির ও অস্থির তিনজনেই বাপের ডাকে উঠে পড়েছে বটে, কিন্তু বুকের মধ্যে আপত্তির ঘূর্ণিবায়ু মাথা খুঁড়ে মরছে।

মহাদেব ছেলেদের বললেন, উপাসনা সেরে নিয়ে চল, স্নান ক'রে মন্দিরে যেতে হবে।

মাঘ মাসে রাত চারটের সময় এমন কথা শুনলে পৃথিবীর কোন্ শিশুর মনে ভগবান সম্বন্ধে প্রেমভাব থাকতে পারে। তবুও হুকুম

পাওয়ামাত্র তিন ভাই টপটপ আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে গেল, তারপরে হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে ফেললে।

ছেলেদের মা প্রতিবাদ ক'রে বললেন, এই মাঘের শেষরাত্রে বুড়োমানুষে ঠাণ্ডা জল মুখে দিতে পারে না, আর তুমি এই কচি ছেলেগুলোকে নাইয়ে মারবে নাকি?

অন্য দিন হ'লে এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে লেগে যেত বাক্যের মহাসমর। কিন্তু এগারোই মাঘের প্রাতঃকাল, তার ওপরে মন্দিরে যাবার মুখে স্ত্রীর সঙ্গে একটা ঝগড়া-হাঙ্গামা হয়, এটা মহাদেব চান না। তাই বিশেষ কথা-কাটাকাটি না ক'রে তিনি বললেন, স্নান ক'রে দেহ ও মনে পবিত্র হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা-মন্দিরে যাবে—এর শীতকাল গ্রীষ্মকাল নেই।

বাস্! এমন অকাট্য যুক্তির ওপর ছেলেদের মা আর কোনও কথা কইলেন না। ছেলেরাও কোন আপত্তি জানালে না। আপত্তি করবার মতন দুঃসাহস তাদের নেই। বাপের মুখ থেকে দ্বিতীয়বার হুকুম বের হওয়ার আগেই ওয়ান—টু—থ্রী—ঠিক ড্রিলের চালে স্থির, স্থবির ও অস্থির অঙ্গের আবরণ ও লজ্জা-নিবারণ খুলে ফেলে বিনাবাক্যব্যয়ে কদম্বকণ্টকিত দেহে সুড়সুড় ক'রে চ'লে গেল একতলার উঠোনের কোণে জলের কলের কাছে। অত রাত্রে বা অত ভোরে কলে জল নেই। হিমঠাণ্ডা চৌবাচ্চার জলে নর্থওয়েস্ট সোপ-কোম্পানির সাবানের ঘর্ষণে তাদের দেহ পবিত্র হ'তে লাগল।

স্নান করাতে করাতে মহাদেব ছেলেদের বললেন, তোমরা ব্রাহ্মঘরে জন্মেছ, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।

ছেলেরা মনে মনে ধন্যবাদের ভাষা খুঁজতে লাগল। শিশু তারা, ভাষাজ্ঞান তখনও পরিপক্ক হয় নি।

সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির। এগারোই মাঘ উপলক্ষ্যে মন্দিরের ভেতর-বার নানা লতাপাতা ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। ভেতরে গ্যাসের বাতি জ্বলছে, সিলিঙে দুটো বড় বড় গ্যাসের ঝাড় জ্বলছে, আর চলেছে খোলকরতালসহ কীর্তন।

মহাদেব তিন ছেলেকে নিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে বেদীর নীচে যেখানে কার্পেট পাতা আছে, তারই এক কোণে গিয়ে বসলেন। তাঁদের আগেও দু-চারটি ব্যাকুলাত্মা এসে স্থান সংগ্রহ করেছেন। সর্বাঙ্গ র‍্যাপারে মোড়া এক-একটি আধুনিক ধ্যানীমূর্তির মতন দেখাচ্ছে তাঁদের। কার্পেটের আর এক কোণে কয়েকজন মিলে ভীষণ হুঙ্কারে কীর্তন করছেন, 'তীক্ষ্ণ বিষব্যালী সম সতত দংশায় রে—'

মহাদেব ব'সে চক্ষু বুজলেন। তাঁর দেখাদেখি ছেলেরাও চক্ষু বুজল। ঈশ্বর অকৃতজ্ঞ নন, স্নান করবার সময় বিনা কারণে তারা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল, তিনিও অচিরেই তাদের চোখে ঘুমের প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে ভোরে ওঠার দুঃখ ভুলিয়ে দিলেন।

কতক্ষণ এই ভাবে চলল। ঢুলতে ঢুলতে মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগায় স্থবিরের ঘুম ছুটে গেল। সে দেখলে, অস্থিরের মাথাটা ঢুলে একেবারে তার নাকের গোড়ায় এসেছে। অস্থিরের মাথাতেও চোট লেগেছিল। সেও চোখ চেয়ে দেখলে, স্থবিরের মাথাটা তার মাথার সামনে। দুজনে চোখাচোখি হতেই তারা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, বাপের চোখ কোথায়!

মহাদেব নির্বিকল্প হয়ে চোখ বুজে পিঠ সোজা ক'রে বুক চিতিয়ে ব'সে আছেন দেখে তারা নিশ্চিন্ত হ'ল বটে, কিন্তু চোখ বুজতে আর সাহস করলে না। কি জানি, বিশ্বাসঘাতক ঘুম ইতিপূর্বে পাঠমন্দিরে অনেক লাঞ্ছনার কারণ হয়েছে, ব্রহ্মমন্দিরে এত লোকের

সামনে সে ব্যাপারের পুনরভিনয় যাতে না হয়, সে বিষয়ে তারা সচেতন হবার চেষ্টা করতে লাগল।

স্থবির চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। কীর্তনীয়ার দল ততক্ষণে শ্রান্ত হয়ে যে-যার একটু জায়গা যোগাড় ক'রে র‍্যাপারে সর্বাঙ্গ ঢেকে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছেন। একটু আগেই এই লোকগুলিই যে বিবিধ ভঙ্গীতে বদনব্যাদান ও অস্বাভাবিক হস্তপদ চালনা ক'রে বিষব্যালীর দংশনের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাচ্ছিল, এখন তাদের শান্ত মুখমণ্ডল ও সমাহিত অবস্থা দেখে তা বোঝবার জো নেই। মন্দিরগৃহ লোকে পরিপূর্ণ। গ্যাসের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানলা-দরজা দিয়ে ভোরের মৃদু আলো আসায় ফুলসজ্জায় সজ্জিত মন্দিরগৃহ, দেওয়াল, থাম ও বেদী অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। কীর্তনীয়াদের কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই গগনভেদী আর্তনাদ স্তব্ধ হওয়ায় সেখানে অপূর্ব গাম্ভীর্য বিরাজ করছে। সকলেই উন্মুখ আগ্রহে যেন কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারেব বুকে হঠাৎ ভৈরবীর সুরধারা নেমে এল করুণার প্রস্রবণের মত—

"হেরি তব বিমল মুখভাতি,
দূর হ'ল গহন দুখ-রাতি।"

স্থবির দেখতে পেলে, তাদের একটু দূরে একজন কালো প্রিয়দর্শন যুবক কোকিলকণ্ঠে গান শুরু করেছে। গানের বাচ্যার্থ অথবা ভাবার্থ বোঝবার মতন বয়স বা শিক্ষা তার তখনও হয় নি, তবুও তার মনে হতে লাগল, তীক্ষ্ণ বিষব্যালীর ওপর এ যেন বিশল্যকরণীর প্রলেপ, কোথা থেকে—কোন্ অদৃশ্যলোক থেকে আসছে যেন আশার বাণী, কি আনন্দের উৎস রয়েছে ভৈরবের ওই ভৃঙ্গারে—রাত্রি চারটের সময় উঠে সেই ঠাণ্ডা জলে স্নান, সকালবেলাকার অমন আড্ডার

বদলে বয়স্কদের সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে তন্মনস্ক হয়ে ব'সে ঈশ্বরারাধনার কৃচ্ছ্রসাধন বালকের মনে যে বিদ্রোহের ঝড় তুলেছিল, নিমেষে তা অপসারিত হয়ে গেল।

গান শেষ হতেই আচার্য ঢুকলেন মন্দিরে। সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের মুখ্য আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ ব্যক্তি। লম্বা দাড়ির অধিকাংশই পাকা। মাথায় বিরল রুক্ষ কেশ। গায়ে একটা সবুজ রঙের ফ্ল্যানেলের শার্ট। মুখ দেখলেই মনে হয়, সাধারণ লোকের সঙ্গে এঁর যেন কোথায় একটা প্রভেদ রয়েছে। স্থবির শাস্ত্রী মশায়কে চিনত। চলতি কথায় বলতে গেলে, তিনি তাদের কুলগুরু। শাস্ত্রী মশায় তার পিতাকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন; মহাদেবের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মরা গুরু মানে না, তাই বোধ হয় গুরু না ভেবে তারা তাঁকে গুরুর চাইতে আরও বড় একটা কিছু মনে করত। যাক, শাস্ত্রী মশায় এসে বেদীতে উঠে বসলেন। দু-তিনটি যুবক খাতা পেন্‌সিল নিয়ে বেদীমূলে ব'সে গেল আচার্যের উপদেশ সঙ্গে সঙ্গে লিখে নেবার জন্যে। শাস্ত্রী মশায় বেদীর ওপরে আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে ভাঙা গলায় বললেন, সঙ্গীত।

সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে বাজনার শব্দ ও তার সঙ্গে গান আরম্ভ হয়ে গেল।

সঙ্গীতান্তে শাস্ত্রী মশায় চীৎকার ক'রে কি সব বলতে আরম্ভ করলেন। সে সব ভাল ভাল কথা, গূঢ় তার অর্থ, নানা অলঙ্কারপূর্ণ সে ভাষা—শিশুর কাছে তা প্রহেলিকা। স্থবিরের মনে হতে লাগল, এ যেন একটা ইস্কুল। বেদীর ওপরে ব'সে আছেন ওই মাস্টার মশায়—চেঁচিয়ে পাঠ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। চতুর্দিকে এই সব নরনারী, তারা

ছাত্র ও ছাত্রীর দল। এ ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীকে বোধ হয় 'নাড়ুগোপাল' হতে হয় না, গলায় তাদের ইটের মেডেলও ঝোলে না। সে একবার বাপের দিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত মনে চোখ বুজে ফেললে।

পেছনে হেলান দেবার একটু দেওয়াল পাবার ফলে এবারের নিদ্রাটি স্থবিরের বেশ গাঢ়ই হয়েছিল—হঠাৎ কান্নার আওয়াজে তার অমন মনোরম ঘুমটি ছুটে গেল। চোখ চেয়ে সে দেখতে পেল, তার পাশেই একটি বৃদ্ধ হেঁচকি তুলে কাঁদছে আর বিড়বিড় ক'রে কি বলছে।

ব্যাপারটা স্থবিরের কাছে ভারি অদ্ভুত ঠেকল। সে তার আশপাশে তাকিয়ে দেখলে, আরও দু-তিনজন ভদ্রলোক ওই রকম হেঁচকি তুলে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। স্থবিরের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে একটি ভদ্রলোক ব'সে ছিলেন, তাঁকে তারা চিনত। এই লোকটি সমাজের মধ্যে একজন নামজাদা গম্ভীর ও রাশভারী লোক। সে দেখলে, ইনিও নিঃশব্দে অশ্রুবিসর্জন করছেন। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল তাঁর বিশাল দাড়ির এখানে সেখানে আটকে নোলকের মত দুলছে।

এই দৃশ্য দেখে স্থবির স্থির বুঝতে পারলে, ব্যাপারটি বিশেষ সুবিধাজনক নয়। নিশ্চয় কোনও অপরাধের জন্যে শাস্ত্রী মশায় তাঁদের ধমক দিচ্ছেন।

ইতিমধ্যে শাস্ত্রী মশায় চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'ওই যে বিহঙ্গ শূন্যপথে মুক্তপক্ষে প্রয়াণ করিল'—

স্থবিরের পাশের লোকটি, যিনি এতক্ষণ কান্নার সঙ্গে বিড়বিড় ক'রে বকছিলেন, হঠাৎ তিনি ডাক ছেড়ে ডুকরে উঠলেন, জয় দয়াময়, জয় দয়াময়—

স্থবির ভাবলে, এবার বোধ হয় শাস্ত্রী মশায় বেদী ছেড়ে নেমে এসে এদের প্রহার আরম্ভ করবেন। সে সন্ত্রস্ত হয়ে র‍্যাপারখানা টেনে গায়ের সঙ্গে সেঁটে উদ্‌গ্রীব হয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়, তারই অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু শাস্ত্রী মশায় বেদী থেকে নামলেন না। তাঁর চীৎকারের মধ্যে ধমকের সুরটা যেন ক্রমেই ক'মে আসতে লাগল। ক্রমে তা যেন একেবারে করুণ সুরে এসে পৌছল। তাঁর কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে নামতে নামতে শেষে অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

শিবনাথ শাস্ত্রী স্থবিরের পিতৃগুরু। তিনি যতক্ষণ চীৎকার ক'রে পুরুষোচিত অভিব্যক্তিতে ব'লে যাচ্ছিলেন, ততক্ষণ তার ভালই লাগছিল। শুধু যে ভাল লাগছিল তা নয়, তাদেরই শাস্ত্রী মশায় যে এতগুলো লোককে ধমকে কাঁদিয়ে বিপর্যস্ত ক'রে তুলছিলেন, তার মধ্যে নিজেও সে খানিকটা গৌরব অনুভব করছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁরও সুর অনুনয়ের পর্দায় নেমে আসায় তার শিশুচিত্ত শুধু বিহ্বল নয়, কিছু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। স্থবিরের মনে হতে লাগল, কে সে নিষ্ঠুর, কোথায় তার বাড়ি, কেমন ভীষণ তার চেহারা, কত শক্তি সে ধরে, যাকে এমন ভাবে অনুনয় করা হচ্ছে, অতিবড় পাষাণও যাতে দ্রবীভূত হয়!

স্থবির স্থির করলে, বড় হয়ে এইজনকে খুঁজে বার করতেই হবে। আজও স্থবির তারই অনুসন্ধানে ফিরছে।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ। জন্মের ইতিহাস আমার জানা নেই। শুনেছি, প্রারব্ধ কর্মফলভোগের কিছু বাকি ছিল, তাই আমাকে জন্মাতে হয়েছে, নইলে আমি মুক্তপুরুষ। মৃত্যুর ইতিহাস লেখবার অবকাশ আমার হবে না—কারুরই হয় না। বিবাহের ইতিহাস লিখতে নেই, শাস্ত্রের মানা আছে। অতএব—অতএব অয়ম্ বিস্তারস্তু।

বাড়ির পাশেই ব্রাহ্মদের যে মেয়ে-ইস্কুল ছিল, তাতেই আমাকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হ'ল। সহ-শিক্ষা উচিত কি অনুচিত, তাই নিয়ে আজ পর্যন্ত দেশে আলোচনারই শেষ হ'ল না, কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগে আমার জীবনযাত্রা সহ-শিক্ষার সদর-রাস্তাতেই শুরু হয়েছিল।

আমাদের ক্লাসে ছিল জন পাঁচ-ছয় ছেলে ও গুটি ত্রিশেক মেয়ে। ছেলেদের বয়েস ছয় থেকে দশ, আর মেয়েদের বয়েস আট থেকে বারোর মধ্যে। এর চেয়ে কম বয়েসের মেয়েও ছিল, তবে তাদের সংখ্যা দু-তিনটির বেশি নয়।

ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন পুরুষমানুষ, এম. এ. পাস। এম. এ. পাস শুনলে আজকাল যেমন রাস্তার মুটের মনেও কোন সম্ভ্রম জাগে না, তখনকার দিনে তা ছিল না। তখন বি. এ. পাস না ক'রেও অনেকে হেডমাস্টারি করতেন, এবং এখনকার দিনের এম. এ.র পরেও আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ী হরপ লাগানো অনেকের চাইতে সে কাজে যশই অর্জন ক'রে গেছেন।

হেডমাস্টার মশায় ছিলেন ব্রাহ্ম। কালো লম্বা চাপদাড়ি, চোখ দুটি লাল টকটকে, পুরুষমানুষের পক্ষে বামন অবতার না হয়ে যতখানি বেঁটে হওয়া সম্ভব তত বেঁটে। দেহ বেশ পুষ্ট ও জোরালো। ইনি

ছাড়া আরও জন তিনেক পুরুষ মাস্টার ছিলেন। বাকি সব মহিলা শিক্ষয়িত্রী।

আমাদের ক্লাসে পাঁচ ঘণ্টায় দুজন মহিলা শিক্ষয়িত্রী পড়াতেন। উচ্চতায় তাঁরা যে কোন সাধারণ বাঙালী পুরুষের চেয়েও উঁচু ছিলেন, শরীরের ব্যাসও যথোপযুক্ত ছিল। হেডমাস্টার তাঁদের সামনে দাঁড়ালে তাঁকে বালকের মতন দেখাত। এখন মধ্যে মধ্যে ভাবি যে, সেকালকার দিনে তো এগারো-বারো হাত শাড়ি ছিল না, তাঁরা দশ হাত শাড়িতে লজ্জা-নিবারণ করতেন কি ক'রে! অথচ তাঁদের শাড়ি পরবার ধরন সে সময়ে অনেকে অনুকরণ করতেন। দেখতেও তাঁরা অসুন্দর ছিলেন না, বরং বাঙালী-ঘরের মেয়ের পক্ষে সুন্দরীই ছিলেন।

বাংলা দেশের অনেক মহিলা-জমিদার এবং দেবী-চৌধুরাণী প্রভৃতির প্রতাপের কথা অনেকেই শুনেছেন, কেউ কেউ দেখেছেনও। আমিও আমার জীবনে অনেক খাণ্ডারবাণী-শাশুড়ী, কোকেন-আড্ডার কর্ত্রী, মহল্লার চৌধুরায়েন প্রভৃতি দেখেছি; কিন্তু মেয়ে-ইস্কুলের কড়া শিক্ষয়িত্রীর সংস্পর্শে আসবার দুর্ভাগ্য যাঁর হয় নি, নারীর প্রতাপ কতখানি হতে পারে এবং সে প্রতাপ কিরূপ অখণ্ড, সে ধারণা তাঁর হতে পারে না।

সমস্ত ইস্কুলের মধ্যে বোধ হয় শ-দেড়েক ছেলেমেয়ে ছিল। এদের মধ্যে দু-চারজন ছাড়া সকলে একই সমাজের ছেলেমেয়ে। একেবারে ওপরের ক্লাস থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে নিম্নশ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রী প্রত্যেকেই প্রায় প্রত্যেককে চেনে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের প্রত্যেকেই প্রায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বাবা-মাকে চেনেন।

এখানকার মতন কাঞ্চনকৌলিন্য আমি আর কোন ইস্কুলেই দেখি নি। সেখানকার সেই শ-দেড়েক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট

বিভাগ ছিল। প্রথম যারা, তারা ধনীর ছেলেমেয়ে। দ্বিতীয় যারা, তারা সমাজের মাতব্বরদের সন্তান। এদের মধ্যে ধনীর সন্তানও অনেক ছিল। তৃতীয় যারা, তারা হচ্ছে আসলে দরিদ্রের ছেলেমেয়ে, ভদ্রতা হিসাবে যাদের এখনও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেপিলে বলা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের এই রকমে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক দল শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী, তাঁরা প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অতিশয় মমতাসম্পন্ন ছিলেন। দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রতি বিশেষ মমতাসম্পন্ন হ'লেও প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীই তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রীদের বিদ্যানুশীলন ও তাদের আচার-ব্যবহারের প্রতি খুব কড়া নজর রাখতেন। শুধু তাই নয়, তাদের কোনও অপরাধ বা সামান্য ত্রুটি তাঁরা উপেক্ষা করতেন না। বিশেষ ক'রে অপরাধী যদি ছেলে হ'ত এবং ফরিয়াদী পক্ষ যদি তাঁদের অনুগৃহীত কোনও পক্ষের ছেলে অথবা মেয়ে হ'ত।

শিক্ষয়িত্রীদের নামের সঙ্গে 'দিদি' কথাটি যোগ দিয়ে ডাকাই আমাদের রীতি ছিল। অবশ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের অনেক ছেলেমেয়েই এঁদেব কেউ বা 'মাসী' কেউ বা 'পিসী' ব'লে ডাকত। পুরুষ শিক্ষকদের সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা 'অমুকবাবু' ব'লে ডাকত। তাঁদের কারুকে কেউ 'খুড়ো' 'মামা' বা 'মেসোমশায়' বলত না।

আমি অভাগ্য ছিলুম এই তৃতীয় বিভাগের লোক। আমার বাবা ধনী তো ছিলেনই না; তাদের অনেকেরই সম্বন্ধে তাঁর ঘৃণা অতিমাত্রায় প্রকাশমান ছিল। তিনি ছিলেন বদরাগী, ও দুনিয়াকে গ্রাহ্য না করার জন্য কুখ্যাতই ছিলেন। এই সব অমার্জনীয় অপরাধের ওপর আবার আমি ছিলুম পুরুষ-শিশু। কি হিংস্রভাবে আমার ওপর অত্যাচার চলত,

সে কথা স্মরণ করলে আজও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সান্ত্বনা এই যে, এ জীবনে আর কখনও মেয়ে-ইস্কুলে পড়তে হবে না। আর যদি-বা পড়তে হয়, তা হ'লেও বাঁচোয়া এই যে, যাঁদের হাতে ইস্কুলে আমার বিদ্যারম্ভ হয়েছিল, তাঁরা সকলেই ঈশ্বরের কৃপায় আজ পরলোকগত।

অত্যাচার যে কোথা দিয়ে কেমন ভাবে আসত, তার হদিস্ই পেতুম না। দু-একটা নমুনা দেবার প্রলোভন সামলাতে পারছি না।

সে সময় আমাদের প্রতিদিন 'কপাটি' খেলা হ'ত। ইস্কুল বসবার আগে ও টিফিনের সময় খুব জোর কপাটির প্রতিযোগিতা চলত। এই খেলায় ছোট বড় সব মেয়ে ও ছেলেই থাকত। কপাটি-খেলায় কয়েক-দিনের মধ্যেই আমি মহা মাতব্বর হয়ে উঠলুম। আমি ধরলে দু-তিনটি ছেলে ছাড়া আর কেউ পালিয়ে যেতে পারত না। ইস্কুলে গুটিকয়েক বড় মেয়ের গায়ের জোরের ভারি গর্ব ছিল। একদিন এদের দু-তিন-জনকে আমি আমাদের কোটে এমন ধরলুম যে, তারা আমার হাত ছাড়িয়ে পালাতে পারলে না। আমার মত ছোট ছেলের হাত ছাড়িয়ে পালাতে না পারায় তাদের অভিমানে আঘাত লাগল ও আমার ওপরে চ'টে রইল, যদিও তারা আমার চেয়ে অনেক উঁচু ক্লাসে পড়ত।

একদিন ইস্কুল বসবার আগে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গায়ের জোরের কথা হচ্ছে, এমন সময় আমি বীরত্ব ক'রে বললুম, অমুক অমুক ছেলে ছাড়া আর কোনও ছেলে কিংবা মেয়ে আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পারে না। আমার সঙ্গে চালাকি করতে এলে মজা টের পাইয়ে দোব।

একজন বড় মেয়ে বললে, তা হ'লে হেডমাস্টার মশায়ও তোর সঙ্গে পারেন্ না?

আমি বললুম, তা কেন?

তা নয় কেন? তুই বললি, কোনও ছেলে পারে না;—হেডমাস্টার মশায় কি ছেলে নন?

তখনই সবাই হৈ-হৈ ক'রে উঠল। দশ মিনিটের মধ্যে সারা ইস্কুলময় র'টে গেল—স্থবির বলেছে যে, হেডমাস্টার মশায় তার সঙ্গে গায়ের জোরে পারেন না, তিনি যেন তার সঙ্গে বেশি চালাকি না করেন।

ইস্কুল ব'সে যাবার মিনিট পাঁচেক পরেই লাইব্রেরি-ঘরে আমার ডাক পড়ল, হেডমাস্টার মশায় আমাকে ডাকছেন।

ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের মৃদু গুঞ্জন কানে গেল। আমি মনে মনে দয়াময়, দয়াময়' নাম জপতে জপতে লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে ঢুকলুম।

হেডমাস্টার মশায় আমারই অপেক্ষা করছিলেন। আমি গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই তিনি সেই লাল চক্ষু তুলে কটমট ক'রে আমার দিকে চাইলেন। অহো, সে কি দৃষ্টি! আমি চিত্রকর নই, তা হ'লে সে কটাক্ষ তুলি দিয়ে লিখে অমর ক'রে রাখবার চেষ্টা করতুম। মহিষের চোখে মানুষী ক্রোধ ফুটিয়ে তোলা যদি সম্ভব হয়, তা হ'লে তার সঙ্গে সে দৃষ্টির তুলনা করা যেতে পারে।

কিছুক্ষণ সেই ভাবে আমার দিকে চেয়ে থেকে ডান হাতে বেশ ক'রে আমার বাঁ কানটি বাগিয়ে ধ'রে রগড়াতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেক এই ভাবে 'সাইলেণ্ট প্যানটোমাইম' চলবার পর 'টকি' শুরু হ'ল, কেন্ রে? আমার ওপর তোর এত রাগ কেন্ রে? আমাকে তুই কি বুঝোবি রে? হ্যাঁ, দাঁড়া, কালই তোর বাবাকে গিয়ে বলছি—

কথার সঙ্গে 'অ্যাক্শন' অর্থাৎ কর্ণবিমর্দন সমভাবেই চলতে লাগল এই রকম আধ ঘণ্টা দলনমর্দনের পর কানটা ছেড়ে দিয়ে আমাকে

একটা জোর ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, যা, ক্লাসে যা, তোর বাবার সঙ্গে একবার দেখা হ'লে হয়।

ক্লাসে ঢুকতে না ঢুকতে আমাকে দেখে সমস্ত ছেলেমেয়ে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। শিক্ষয়িত্রী তাদের ধমক দিয়ে থামিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হলেন। অবসর বুঝে আমি পাশের মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলুম, হাসছিলে কেন?

সে বললে, তোমার একটা কান কালশিরে প'ড়ে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে, আর একটা লাল টকটকে। যা চেহারা হয়েছে! দেখলে হাসি পায়।

সেদিন টিফিনের ছুটির সময় সমস্ত ছেলেমেয়ে আমাকে 'লাল-কালো' ব'লে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলে। অপমানে লজ্জায় ভয়ে আমি তাদের চোখের আড়ালে থেকে ছুটিটা কাটিয়ে দিলুম।

রাত্রে কানের যন্ত্রণায় ঘুমুতে পারলুম না। সেই থেকে আজ অবধি আমার বাঁ কানটা জখম হয়ে আছে।

বাড়িতে এক অস্থির ছাড়া ব্যাপারটা আর কাউকে জানাই নি। অদৃষ্ট কিছু সুপ্রসন্ন থাকায় কানটা অন্য কেউ তেমন লক্ষ্য করে নি। পরের দিন বিকেলবেলায় কানের অবস্থা হঠাৎ মার চোখে পড়ায় তিনি একেবারে শিউরে উঠলেন। কি ক'রে কানের এই মুমূর্ষু অবস্থা হ'ল, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আমাকে না ক'রেই বাবার উদ্দেশ্যে নানা কথা বলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন—এই রকম ক'রে ছেলেগুলোকে খুন ক'রে ও কোন্ দিন ফাঁসি যাবে! আমার মরণ হয় না, এত লোকে মরে, ইত্যাদি—

বাবা আপিস থেকে না ফেরা অবধি অত্যন্ত শঙ্কায় সময় কাটতে লাগল। .কি জানি, ব্যাপারটা এবার কোন্ দিকে গড়াবে!

বাবা আপিস থেকে ফেরামাত্র মা তাঁকে বকতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। তারপর আমাকে টেনে এনে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে কানটা দেখিয়ে কেঁদে বললেন, এ কি করেছ দেখ তো, এই কচি দেহ—

মা কাঁদতে লাগলেন।

বাবা তো আমার কানের রঙ্‌চঙে চেহারা দেখে একেবারে চমৎকৃত। আমরা তিন ভাই-ই বলতে গেলে সকালে কি সন্ধ্যায় প্রায় নিয়মমত প্রহার সেবন করতুম। তার মধ্যে কোন্ দিনের অপরিমিত সেবনের ফলে যে এই ব্যাপারটা ঘটেছে, তা অনুমান করবার চেষ্টাও তিনি করলেন না। আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে আদর ক'রে বলতে লাগলেন, বাবা স্থবির, তুমি তো আমার ভাল ছেলে, ভাল ক'রে লেখাপড়া করবে, আমাদের কথা শুনবে, তা হ'লে তো আর মারতে হয় না। কথা না শুনলেই আমার রাগ হয়, আর রাগ হ'লে আমার জ্ঞান থাকে না।

একটা পতাকী ফাঁড়া কেটে গেল।

এর পরে সেই হেডমাস্টার তিন বছর আমাদের ইস্কুলে ছিলেন। এই তিন বছরের মধ্যে যতদিন যতবার তাঁর চোখের সামনে পড়েছি, ততবার তিনি আমাকে ব্রাহ্মভাষায় গালাগালি দিয়েছেন। একদিনের জন্যেও তাঁর মুখে একটা সহানুভূতির কথা শুনি নি।

ইনি এখনও বেঁচে আছেন এবং সাধুচরিত্রের লোক ব'লে সমাজে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর কথা যখন মনে পড়ে, তখন ভাবি, রত্নাকর হে! তুমি ধন্য! কি পন্থাই বাতলে দিয়ে গিয়েছ গুরু, তোমায় শতকোটি নমস্কার! তোমার রামায়ণ যদি কোনদিন জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়, তবুও তোমার স্মৃতি জাগিয়ে রাখবার লোকের অভাব বিশ্বে কোনদিনই হবে না।

বাল্যকাল অতি সুখের কাল! কে বললে, বাল্যকাল অতি সুখের কাল? অধিকাংশ লোকেরই বাল্যকাল অতি দুঃখেই কাটে। সেই দুঃখের গভীরতা বোঝবার ক্ষমতা বালকের প্রায়ই থাকে না, তাই পরিণত পাটোয়ারী মস্তিষ্কের প্রবীণরা বেপরোয়া ব'লে দেন, বাল্যকাল অতি সুখের কাল।

এ কথা সত্য যে, বাল্যকালে স্ত্রীপুত্রপরিজন প্রতিপালন করবার দায়িত্ব থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে এও সত্য যে, স্ত্রীপুত্রপরিজন থাকার সুখ থেকেও সে বঞ্চিত। যাঁরা বলেন, বাল্যকাল অতি সুখের কাল, তাঁদের বাল্যকাল হয়তো সুখেই কেটেছে কিংবা তাঁরা বর্তমান জীবনের দুর্দশার তুলনায় অতীতকে সুন্দর দেখেন কিংবা বাল্যকালে তাঁদের সূক্ষ্ম অনুভূতি ছিল না।

বাল্যকাল মোটেই সুখের কাল নয়। মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি এই ধরণীতে প্রাণবন্ত যা কিছু আছে, তার সম্যক বিকাশের জন্য চাই স্বাধীনতা। বাল্যকালের প্রতি মুহূর্তেই সেই স্বাধীনতা আহত হয়। ওরে, রাস্তায় বেরুস নি, ছাতে উঠিস নি, কেন শিস দিচ্ছিস? ওই ছেলেটার সঙ্গে আবার কথা বলবি তো হাড় গুঁড়িয়ে দোব। 'ষন্নবতি' বানান কর্ তো। বেরালছানা, কুকুরছানা, পাখির ছানা—কোথা থেকে আপদ জুটিয়ে নিয়ে এলি? প্রতি পদে বাধা, প্রতি পদে আঘাত।

তারপর বাল্যকালের বিদ্যাভ্যাস!

যাঁদের মতে বাল্যকাল অতি সুখের কাল, তাঁদের হিসাবমত আমার বাল্যকাল পরম সুখে কেটেছে। কিন্তু আমি বলছি, আমার বাল্যকাল অতি দুঃখেই কেটেছে। বালকের মনের কথা অতি অল্প লোকেই বুঝতে পারে। বাল্যে মানুষের মন অত্যন্ত কোমল ও ভাবপ্রবণ

থাকে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে দীন বালক কাতরস্বরে ভিক্ষা করে, তারও প্রচণ্ড মান-অপমান-জ্ঞান আছে—সব অনুভূতিই তার প্রখর। আর যে বালকের অন্তর সামান্য আঘাতেই উদ্বেল হয়ে ওঠে, চারিদিকের প্রাচুর্যের মধ্যে নিজের জীবনের এবং সংসারের দৈন্য নিয়ত যার চিত্তকে আঘাত করে, দারিদ্র্যবিলাস যার অন্তরে কোনও গৌরববোধই জাগিয়ে তুলতে পারে না, অবজ্ঞা অবহেলা ও শারীরিক শাসনে যার সমস্ত সত্তা পীড়িত হয়, সে বাল্যজীবনে সুখ কোথায়?

বাল্যকালে আমাদের ওপরে কড়া হুকুম ছিল, দোতলা থেকে একতলায় নামতে পারবে না। দুপুরবেলায় সংসারের কাজকর্ম সারা হয়ে যাবার পর মা ঘুমুতেন। আমি আর অস্থির দুজনে রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে চুপ ক'রে রাস্তার দিকে চেয়ে ব'সে থাকতুম। 'কথামালা' আর বিদ্যেসাগর মশায়ের 'দ্বিতীয় ভাগ' খোলা থাকত আমাদের সামনে, কিন্তু আঁখি-পাখি পক্ষবিস্তার করত তার কল্পলোকে—যেখান দিয়ে ঘোড়ায় ট্রাম টেনে নিয়ে চলেছে, কত রকম-বেরকমের ঘোড়ায়-টানা গাড়ি, গরুর গাড়ি চলেছে। কত রকমের মানুষ, ফেরিওয়ালা, ভিখারী চলেছে কত অঙ্গভঙ্গী ক'রে। আমাদের মনও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চ'লে যেত—কোথায় তাদের বাড়ি, কেমন তাদের জীবনযাত্রা!

ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেই আমরা ডাক দিতুম, কি ভাই, কোথায় যাচ্ছ? অনেকেই মুখ তুলে একবার দেখে চ'লে যেত। যে কথার উত্তর দিত, সে হ'ত আমাদের বন্ধু। বন্ধুকে কিন্তু ওপরে ডাকতে পারতুম না, বাইরের ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসার মহা-অপরাধে অনর্থ ঘটবে এই আশঙ্কায়।

বাল্যকালে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে এক ভিখারিণী বালিকা ভিক্ষা করতে চ'লে যেত। বেচারীর হাঁটু থেকে পায়ের বাকি

অংশটা ছিল বিকৃত। সে দু-হাত আর দু-হাঁটুতে জুতো প'রে হামাগুড়ি দিয়ে ঘেঁষড়ে ঘেঁষড়ে চলত। তার মুখখানি ছিল করুণ, আর ভারি একটা কমনীয়তা ছিল সে মুখে। এমন অদ্ভুত চাহনি ছিল তার চোখে, যা আজও পর্যন্ত আমি ভুলতে পারি নি। তখন তার বয়ঃসন্ধি। আসন্নযৌবনসমারোহের আগমনী বিচিত্র রাগিণীতে তার দেহে লীলায়িত হতে আরম্ভ করেছে মাত্র। হয়তো তাকে দেখে আমার সুপ্ত মানসলোকে যৌনচেতনা সাড়া দিত, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক, আমাকে সে খুব বেশি আকর্ষণ করেছিল। আমার রাস্তায় নামবার হুকুম ছিল না। আমি থাকতুম বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আর সে থাকত রাস্তায়। সেইখান থেকে সে মুখ তুলে কাতর সুরে আমাকে ডেকে বলত, রাজাবাবু, একটা পয়সা দে। আর আমার চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসত, আমার সঙ্গে অস্থিরও কাঁদতে থাকত।

ভিখারিণী প্রতিদিন আসত না। কিন্তু যেদিন সে আসত, সেদিন আমার মন একেবারে উদাস হয়ে পড়ত। কোথায় তার বাড়ি, কি খায় সে? তার বাপ-মা আছে কি না? তার বাপ তাকে মারে কি না? বাবা হয় অথচ মারে না—এমন অবস্থা আমরা কল্পনা করতে পারতুম না কিনা। সন্ধ্যেবেলা পড়তে ব'সে তার কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে পড়ার ফলে একাধিকবার জীবনসঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, তবুও তাকে ভুলতে পারতুম না।

একদিন ভিখারিণী আমাদের বারান্দার সামনে এসে ওই রকম কাতরভাবে অনুনয় করতে লাগল, রাজাবাবু, একটা পয়সা দে। তুই রাজা হবি। তুই রোজ বলিস, কিন্তু পয়সা দিস না। তুই রাজা হবি, দে একটা পয়সা।

রাজপুত্র না হয়েও ভবিষ্যতে রাজত্ব লাভের সম্ভাবনায় মনটা তখনই

রাজোচিত দাক্ষিণ্যে ভ'রে উঠল। ঠিক করলুম, আজ মার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে নিশ্চয় তাকে দোব। তক্ষুনি মার সন্ধানে ছুটলুম, কিন্তু সারাবাড়ি ঘুরে মাকে কোথাও খুঁজে পেলুম না, মা তখন কলতলায়। মায়ের পয়সা আলমারির কোন্ তাকে থাকে, তা আমাদের সব ভাইয়েরই জানা ছিল। সেখান থেকে মাকে না ব'লেই একটি পয়সা নিয়ে দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে ভিখারিণীর হাতে দিয়েই আবার দরজার দিকে ফিরে দৌড়তে যাব, এমন সময় সামনে দেখি—বাবা!

আর কথা নেই। অমনই তিনি এক হাতে আমার কোমরটা ধ'রে শূন্যে তুলে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এসে উঠোনে মারলেন এক আছাড়। আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হবার অবস্থা। তখনও কিন্তু ভিখারিণীর জয়স্তুতি আমার কানে মধুবর্ষণ করছিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়তে না পড়তে বাবা আমার ঘাড়টা এক হাতে ধ'রে, কুকুরের বাচ্চাকে যেমন ক'রে নিয়ে যায় সেই ভাবে, ওপরে অর্থাৎ দোতলায় নিয়ে এলেন।

তার পরের অবস্থাটা আর বর্ণনা ক'রে কাজ নেই। প্রলয়ের শেষে প্রকৃতি একটু সাম্যাবস্থা পাবার পরের দৃশ্য—মা কলঘর থেকে বেরিয়েছেন, প্রদীপ জ্বালা হয়েছে, শতরঞ্চির কোণ ঘেঁষে দাদা ও অস্থির বসেছে, তাদের সামনে বই খোলা রয়েছে, আর আমি বাবার সামনে ব'সে।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন রাস্তায় গিয়েছিলে, বল?

কোন উত্তর নেই।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার কিছু চুল বেহাত অর্থাৎ বাবার হাতে চ'লে গেল।

উত্তর দাও।

কোন উত্তর নেই। উত্তর দিতে গেলে বলতে হবে, মাকে না ব'লে

পয়সা বের ক'রে নিয়ে ভিখারিণীকে দিয়েছি। সে অপরাধের সাজা কল্পনা করতেও মূর্ছা আসে, তাই উত্তর নেই।

সঙ্গে সঙ্গে চপেটাঘাত এবং সর্ষপকুসুমদর্শন।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলবার পর অনেক ভেবে-চিন্তে ব'লে ফেলা গেল, একটা ভিখিরী ডেকেছিল ব'লে নীচে নেমেছিলুম।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। আমার কথা শুনে পাশের ঘর থেকে চুল বাঁধতে বাঁধতে হাউমাউ ক'রে মা বেরিয়ে এসে বলতে লাগলেন, ওমা, আমি কোথায় যাব! এ ছেলেকে নিয়ে আমি কি করব? ভিখিরী ডাকলে, আর তুই নীচে নেমে চ'লে গেলি তার কাছে! আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। ভিখিরীরা এই রকম ক'রে ছেলেদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে হাতটা-পাটা ভেঙে দিয়ে ভিক্ষে করায়।

এই রকম বলতে বলতে মা এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করলেন যে, বাবা পর্যন্ত দস্তুরমতন ভড়কে গেলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হতে লাগল যে, ভিখিরীদের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে তিনিও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করবেন—এই রকম একটা সঙ্কল্প মনে মনে আঁটছেন।

ইতিমধ্যে পাড়ার একটি বর্ষীয়সী মহিলা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আমাদের সেই সান্ধ্য-বৈঠকে। এঁকে বাবা 'দিদি' ব'লে ডাকতেন এবং কি জানি তাঁর কথার উপরে বাবা কখনও কথা বলতেন না বা তর্ক করতেন না। আমরা তাঁকে পিসীমা ব'লে জানতুম, কিন্তু ডাকতুম 'মা' ব'লে। আমাদের তিন ভাইকে ইনি নিজের সন্তানের মতন দেখতেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা নিজের ভাইয়ের মতন আমাদের দেখত এবং তারা যে আমাদের আপন পিসতুতো ভাইবোন নয়, বেশ বড় হয়ে তা জানতে পেরেছি। ভিখারীতত্ত্বে মার এই পাণ্ডিত্য দেখে আমাদের

এই মারও তাক লেগে গেল। বাবার মুখ দেখে তো আমার ওই অবস্থাতেও হাসি পেতে লাগল।

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে হকচকিয়ে চেয়ে থেকে হঠাৎ বাবা ক্ষিপ্তের মত গ'র্জে উঠে দুদ্দাড় ক'রে আমায় প্রহার করতে শুরু ক'রে দিলেন। ভাগ্যে মা (পিসীমা) ছিলেন, নয়তো সেই দিনই পুত্রহত্যার অপরাধে পিতাজী নিশ্চিত চালান হতেন। মা (পিসীমা) বাবাকে যাচ্ছেতাই অর্থাৎ ব্রাহ্মভাষায় যাচ্ছেতাই বকতে লাগলেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—তুমি অত্যন্ত রাগী ; ছেলেপুলে শাসন করা ও তাদের মানুষ করার পদ্ধতি এ নয় ; ইত্যাদি।

নিরবচ্ছিন্ন খারাপ ব'লে পৃথিবীতে কিছু নেই। বাল্যজীবনের সুখ আমি কিছু অনুভব করলুম বটে, কিন্তু দাদা আর অস্থির সেদিন পড়ার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেল।

অনেক রাত্রে খেতে বসবার সময় দাদা আমাকে বললে, কোন্ ভিখিরীটা তোকে ডেকেছিল আমায় একবার দেখিয়ে দিস তো। ব্যাটা কত বড় ভিখিরী একবার দেখে নোব।

সেদিন শোবার সময় মা আমাকে ডেকে বললেন, স্থবির্‌রে, আমার কাছে শুবি আয়।

আমরা মার কাছে শুতে পেতুম না। মা ডাকামাত্র তড়াক ক'রে উঠে মার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভিখারীদের সম্বন্ধে কত কথাই বলতে লাগলেন, আমার কানে তখন কোন কথাই যাচ্ছিল না। প্রাণপণে মাকে আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে রইলুম। তারপরে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম মনে নেই।

আমাদের বাল্যকালে কলকাতার অধিবাসী প্রায় সকল বাঙালীর বাড়িতেই হিন্দুস্থানী চাকর থাকত। এদের সাধারণত 'খোট্টা' বলা হ'ত। এরা বেশির ভাগই আসত বিহারের গয়া ছাপরা ত্রিহুত প্রভৃতি জায়গা থেকে—তখন বিহার বাংলা দেশেরই অন্তর্গত ছিল। পাঁচ টাকা থেকে আরম্ভ ক'রে আট টাকা ছিল এদের মাইনে। এরা বাঙালীর হেঁসেলে খেত না, কারণ তখনকার দিনে পাঞ্জাব ছাড়া সারা ভারতবর্ষের লোক বাঙালীকে ম্লেচ্ছ জ্ঞান করত। সেই মাইনেতে তারা নিজেরা দু-বেলা রেঁধে খেত, কাপড় পরত আর দেশেও টাকা পাঠাত।

আমাদের ঘরে শাপভ্রষ্ট হয়ে যে মহাপুরুষ এসেছিলেন, তাঁর নাম ছিল দুখিয়া। আমরা তাঁকে 'দুঃখী' ব'লে ডাকতুম। দুঃখের এমন জীবন্ত প্রতিমূর্তি আমি আজও দেখি নি। সে বেচারী ছিল বুড়ো আর রাতকানা। রাত্রিবেলা সে পা ঘেঁষ্‌টে ঘেঁষ্‌টে চলত। আমরা দূর থেকে বুঝতে পারতুম, দুঃখী মহারাজ আসছেন। মার কোনও বকুনি-ধমকানির জবাব সে দিত না। তার মাইনে ছিল ছ-টাকা। তা থেকে প্রতি মাসে সে তিনটি টাকা দেশে পাঠাত—ছাপরা জেলার কোন্‌ এক গ্রামে, যেখানে তার বুঢ়িয়া 'বহু' আর ছেলেরা থাকে।

একটা সিঁড়ির তলায় সে থাকত, সেখানে থাকত তার একটা পোঁটলা আর সেখানেই তোলা-উনুনে তার রান্নাবান্না চলত।

রাত্রিবেলা সব কাজকর্ম সারা হয়ে যাবার পর আমি আর অস্থির মাঝে-মাঝে সবার অগোচরে এই সিঁড়ির তলায় তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হতুম। আমাদের তিনজনের সেখানে জমাট আসর বসত। অতি-মৌন দুখিয়া আমাদের কাছে মুখর হয়ে উঠত। তার দেশের কত রকম গল্প করত।

পেতলের কানা-উঁচু থালায় বেরালে ডিঙুতে পারে না এমনই

ভাতের পর্বতের ওপর খানিকটা অড়র-ডালসেদ্ধ ঢেলে দুখিয়া শপশপ আওয়াজ ক'রে খেত, আর আমরা দু-ভাই বলাবলি করতুম, বেড়ে ডিনার চলেছে।

দুখিয়ার সেই দুঃখী-ডিনার দেখে আমাদের দুঃখ হ'ত। আমরা বলতুম, দুখিয়া, তুই আমাদের সঙ্গে খাস না কেন?

ও বাবা, জাত যাবে।

জাত যাওয়ার ব্যাপার আমাদের সমাজে চলন ছিল না, কাজেই ও-জিনিসটার গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারতুম না। আমরা ভাবতুম, এই বুদ্ধি না হ'লে ও আর চাকর হয়েছে!

যা হোক, তবুও দুখিয়া ছিল আমাদের পরম বন্ধু। কত 'প্রাইভেট' কথা যে তার সঙ্গে হ'ত, তার ঠিকানা নেই।

হঠাৎ একদিন কি কারণে দুখিয়ার চাকরি চ'লে গেল। সে দিনটি আজও আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে শুনলুম, দুখিয়ার চাকরি গেছে। দুই ভাইয়ে একেবারে দ'মে গেলুম। অনধিকারচর্চা ক'রে বললুম, কেন মা, দুখিয়া তো বেশ লোক।

মা বললেন, না বাবা, ও বুড়ো হয়ে পড়েছে, খাটতে পারে না,—আমিও সামলাতে পারি না।

বুড়ো হয়ে খাটতে না পারার অপরাধের গুরুত্ব সেদিনও বুঝি নি, আজও বুঝতে পারি না।

সে রাত্রে আমরা যখন দুখিয়ার ডিনারের সময় তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম, তখন সে সেই পেতলের কানা-উঁচু থালায় যবের ছাতু মেখে খাচ্ছিল। দুখিয়া বললে, কাল ভোরে উঠেই সে চ'লে যাবে, তাই আজ আর রান্নার হাঙ্গামা করে নি।

আমরা তাকে অনেক কথা বলতে লাগলুম—দুখিয়া, তুই যাস নি, কোথায় যাবি আমাদের ছেড়ে, ইত্যাদি।

ছাতু গিলতে গিলতে সে মাঝে মাঝে আমাদের দিকে চাইতে লাগল। দেখলুম, দুখিয়ার রাতকানা চোখ দুটো কথা বলতে বলতে সজল হয়ে উঠছে।

সকালবেলা দুখিয়া তার ছোট পুঁটলিটা পিঠের সঙ্গে বেঁধে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। আমি আর অস্থির তার পেছনে পেছনে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে রাস্তার জনস্রোতে দুখিয়া ডুবে গেল।

অপস্রিয়মাণ ন্যুব্জ দুখিয়া-মূর্তি আজও মনের মধ্যে ঝকঝক করছে। তার কথা স্মরণ ক'রে রাত্রে বিছানায় শুয়ে কতদিন কেঁদেছি, তার ঠিকানা নেই। মনের এ বোঝা কারু কাছে নামাবার উপায় নেই—না বাড়িতে, না ইস্কুলের বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে। এ দুঃখ অনুভব করবার শক্তি যে অভাগ্য বালকের আছে, সে ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। বাল্যকাল সুখের কালই বটে!

যাক, আবার বাল্যকালের ইস্কুল-জীবনে ফিরে যাই। আগেই বলেছি, আমাদের ক্লাসে দুজন শিক্ষয়িত্রী পড়াতেন। একের নম্বর ছিলেন কিছু বেশি কঠিনা। দ্বিতীয়াও কঠিনা কম ছিলেন না, তবে একের নম্বরের তুলনায় কিছু কম। ইস্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় ঘণ্টায় দুই নম্বরের শিক্ষয়িত্রী আমাদের অঙ্ক আর ইংরেজী শেখাতেন। ক্লাস বসলেই সর্বপ্রথম কার্য ইংরেজী হাতের লেখা দেখানো। একদিন তিনি হুকুম দিলেন—কাল থেকে সবাই রুল-টানা এক্সারসাইজ বুকে হাতের লেখা লিখে আনবে।

বাড়িতে বাবার কাছে এক্সারসাইজ বুকের কথা বলতেই বাবা

বললেন, না না, ওসব বিলাসিতা চলবে না। কেন, বালির কাগজ কি খারাপ? বিদ্যাসাগর মশায়, কি গুরুদাস বাঁড়ুজ্জে লেখাপড়া শেখেন নি? সেই কেরী সায়েবের আমল থেকে এই কাগজে লিখে বাঙালী মানুষ হ'ল, আর আজ বাবুর এক্সারসাইজ বুক চাই! ইস্কুলে বলবে, বাবা বলেছেন—এ রকম বিলাসিতা করা ঠিক নয়।

তাঁদের ছেলেবেলা তাঁরা কত কষ্টে কাগজ যোগাড় করতেন, তারও একটা ফিরিস্তি শুনতে হ'ল।

পরের দিন সব ছেলেমেয়েই এক্সারসাইজ বুকে হাতের লেখা লিখে নিয়ে এল। সবার দেখে শিক্ষয়িত্রী হাঁকলেন, কই স্থবির, হাতের লেখা দেখালি নি? তোমায় না ডাকলে বুঝি মনে থাকে না?

অগত্যা সেই বালির কাগজের খাতা নিয়েই হাজির হলুম। শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, এক্সারসাইজ বুক কোথায়?

বিলাসিতা সম্বন্ধে পিতৃপ্রদত্ত উপদেশগুলি উদ্গার করব কি না ভাবছি, ইতিমধ্যে কর্ণে আকর্ষণ অনুভব করলুম। দু-তিনটি মধ্যম রকমের টিপ্পনি পড়তেই কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলেন। ব'লে ফেললুম, বাবা বলেছেন, এই খাতাটা শেষ হয়ে গেলে তার পরে এক্সারসাইজ বুক কিনে দেবেন।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই শুনে আসছি—সদা সত্য কথা কহিবে; সত্য বিনা কদাচ মিথ্যা কহিবে না। বাল্যজীবনে সেই সূত্র অনুসরণ ক'রে যদি চলতুম, তা হ'লে বার্ধক্যে এই সত্য বলবার অবকাশই ঘটত না। কর্ণমর্দনের ফলে টপ ক'রে কিছু বানিয়ে ব'লে ফেলার প্রতিভা সেই দিন থেকে যে আমার খুলে গেল, তারই কৃপায় ভবিষ্যতে অনেক সাংঘাতিক বিপদের হাত থেকে ত্রাণ পেয়েছি। এর জন্যে কার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব? পিতার কাছে? আমার কর্ণবিমর্দিনীর

কাছে? না, সৃষ্টির আদিমতম যুগ থেকে আত্মরক্ষার যে নীতি অপ্রতিহতরূপে ধরণীতে প্রবাহিত হচ্ছে, তার কাছে?

মাসখানেক বাদে আবার যেদিন বালির কাগজের নতুন খাতায় হাতের লেখা নিয়ে উপস্থিত হলুম, তখন আমার শিক্ষয়িত্রী ক্ষেপে গিয়ে মহা চীৎকার শুরু ক'রে দিলেন।

একটা বড় মার্বেল-পাথরের ঠাকুর-দালানে আমাদের ক্লাস বসত; আমাদের পাশেই সেই দালানে আর একটা ক্লাসও বসত। আমার শনি-মহারাজ বোধ হয় সে সময় রন্ধ্রগত ছিলেন। কারণ সেই ক্লাসে তখন আমাদের একের নম্বরের শিক্ষয়িত্রী পড়াচ্ছিলেন। দুয়ের নম্বরের চীৎকার ও চটাচট চপেটাধ্বনি শুনে তিনি সবৎসা ধেনুর মতন মন্থর গমনে আমাদের ক্লাসে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

দুয়ের নম্বর উত্তর দিলেন, দেখ দিকিনি! এ ছেলেকে নিয়ে আমি কি করব? একটা কথা শোনে না! আজ এক মাস ধ'রে একে দিয়ে একখানা এক্সারসাইজ বুক কেনাতে পারলুম না!

একের নম্বর অগ্রসর হয়ে বললেন, কিস্সু হবে না এর, দেখে নিও। আমার হাতে পড়লে দু দিনে সিধে ক'রে দিতুম।

বলা বাহুল্য, দৈনিক তিন ঘণ্টা ক'রে তিনি আমায় সিধে করবার চেষ্টা করতেন এবং প্রতি কর্ণমর্দন ও চপেটাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করতেন—কিস্সু হবে না এ ছেলের, আমি ব'লে দিচ্ছি, লিখে রাখ তোমরা, কিস্সু হবে না এর।

হে অসামান্যা ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টিসম্পন্না ঘোরে! মর্ত্যপুরুষ শিশুদলনে পটিয়সী হে অমর্ত্যলোকবাসিনী বিদেহী! আপনার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। আমার কিস্সুই হয় নি। কিস্সুই হবে কি ক'রে? যে শিশুর জীবনযাত্রা শুরুই হ'ল মেয়ে-চড় খেতে খেতে, তার

ভবিষ্যৎ জীবন যে কেবল চুম্বন ও আলিঙ্গনেই ভ'রে উঠবে না, সে তো জানাই কথা।

এই ব্যাপারের পর প্রায় তিন মাস অর্থাৎ পুজোর ছুটির কিছু আগে পর্যন্ত প্রতিদিন ইস্কুলের প্রথম ঘণ্টায় আমার জন্য রকমারি শাস্তি তোলা থাকত। দ্বিতীয় বার বাবার কাছে এক্সারসাইজ বুক চাইবার সাহস হ'ত না। আবার বাবা যা বলেছেন, তা ইস্কুলে বলবার সাহস হ'ত না। প্রতিদিন অতি ক্ষুণ্ণমনে নিরুৎসাহিত চিত্তে ইস্কুলে গিয়ে শাস্তির জন্য অপেক্ষা করতুম। শাস্তির ঘণ্টা পার হয়ে গেলে (অবশ্য শাস্তি পেয়ে) তবে শান্তি পেতুম।

যে ছেলে প্রতিদিন ইস্কুল বসতে না বসতেই শাস্তি পায়, তার সুনাম থাকে কি ক'রে। এরই মধ্যে একটা দিনের কথা কষ্টিপাথরে সোনার কষের মতন মনের মধ্যে আজও ঝকঝক করছে।

আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল ক্রীশ্চানদের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি মিশন। এখানে থাকতেন পাদ্রী ব্রাউন সায়েব। অতিশয় মহাজন ছিলেন এই রেভারেণ্ড ই. এফ. ব্রাউন। দুনিয়ার লোকের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রেমভাব। তিনি যখন রাস্তা দিয়ে চলতেন, রাজ্যের ছেলেরা তাঁকে ঘিরে চলতে থাকত। তিনি তাঁর পাদ্রীয় জোব্বার দুই পকেট থেকে ছবিওয়ালা কার্ড বের ক'রে ক'রে তাদের বিলোতেন। পথ দিয়ে চলতে চলতে বারান্দার ওপর থেকে কিংবা অন্য ফুটপাথ থেকে কেউ ডাক দিলে, তিনি সেইখানে দাঁড়িয়েই চীৎকার ক'রে তাদের সঙ্গে বাংলায় আলাপচারী করতে থাকতেন। চেনা লোক দেখলে, সে ছেলেই হোক কি বুড়োই হোক, তাকে জড়িয়ে ধ'রে দু-গালে চুমু খেয়ে ভালবাসা জানাতেন। মনে আছে, একদিন খাটা-পায়খানার মেথরকে

চুমু খেয়েই আমাদের দুই ভাইকে চুমু খাওয়া মাত্র আমরা বাড়িতে ফিরে আধ ঘণ্টা ধ'রে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়েছিলুম।

দাদা, আমি আর অস্থির সায়েবকে 'দাদা' ব'লে ডাকতুম। তিনিই 'দাদা' ব'লে ডাকতে শিখিয়েছিলেন। অন্য লোকের চাইতে সায়েবের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর। তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং আমাদের মার সঙ্গেও গল্পগুজব করতে তাঁকে দেখেছি।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে ব্রাউন সায়েবের ঘনিষ্ঠতার একটু কারণ ছিল। কারণটা বলি—

আমার জ্ঞান-সঞ্চার হবার কিছু পূর্বে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের ঠিক সামনে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ওপরেই একটি নারীহত্যা হয়েছিল। মন্দিরের ধারের সরু গলির মধ্যে অনেক ব্রাহ্ম-পরিবার বাস করতেন। এই সব পরিবারের অনেক মেয়ে বেথুন কলেজে অথবা মিস নীলের ইস্কুলে পড়তে যেতেন। হেদোর সামনে যে গির্জা আছে, তারই সংলগ্ন ছিল মিস নীলের ইস্কুল। সে ইস্কুলের প্রকাণ্ড বাড়ি এখন বেথুন কলেজ কিনে নিয়েছে।

মিস নীল ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিয়ে বিলেতে চ'লে যাবেন, সেই উপলক্ষ্যে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ইস্কুলে ছিল জলসা। ব্রাহ্ম-পাড়া থেকে মিস নীলের ছাত্রীরা গিয়েছিলেন সেই উৎসবে যোগ দিতে। রাত্রে ইস্কুলেরই বাস-গাড়িতে তাঁরা বাড়ি ফিরলেন। সমাজ-পাড়ার সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে—মেয়েরা একে একে নেমে যাচ্ছে, এমন সময় আততায়ীরা এসে একটি মেয়েকে হত্যা করে। মেয়েটি ছিল হিন্দু ঘরের বিধবা। 'নব্যভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর গৃহে আশ্রিতা এবং সেইখানে থেকেই সে লেখাপড়া শিখছিল। কেন এই মেয়েটিকে হত্যা করা হ'ল, হত্যাকারী কারা—সে এক অন্য ইতিহাস।

আমার বাবার সে সময় ছিল চামড়ার কারবার। বেশ সমারোহের সঙ্গে কারবার চলছে। ব্রাহ্মণসন্তান চামড়ার কারবার করেছেন, এই গৌরবে তাঁর মতে শহরের মধ্যে বেশ প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। এই সময় এক রাত্রে কাজকর্ম সেরে বাড়িতে ফিরে রাত্রি প্রায় দশটার সময় আহারে বসেছেন, এমন সময় নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে নারীকণ্ঠের করুণ চীৎকার উঠল—বাবা গো, মেরে ফেললে!

বাবা খাওয়া ফেলে এঁটো হাতেই ছুটে রাস্তায় গিয়ে দেখলেন, তিনজন লোক মিলে একটি মেয়েকে রাম-দা দিয়ে কোপাচ্ছে। রাস্তায় অন্য লোকজন, এমন কি একটি পাহারাওয়ালা পর্যন্ত, নেই—দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে। শুধু বাস-গাড়ির ঘোড়া দুটো অবাক হয়ে মানুষের এই কীর্তি দেখছে।

বাবা এই দৃশ্য দেখে তখুনি তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মেয়েটিকে উদ্ধার করবার জন্যে। বারান্দার ওপর থেকে যাঁরা এই দৃশ্য দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু-তিনটি মহিলার কাছে আমরা শুনেছি যে, চোর-চোর খেলার মতন দুই ফুটপাথে সেই মেয়েটিকে নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে দৌড়োদৌড়ি হতে লাগল। কখনও বা তাদের কাছ থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে বাবা বাড়ির দিকে দৌড় দেন, কখনও বা তারা তিনজনে তাঁর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেয়। রাস্তায় রক্তস্রোত বইছে, এমন সময় একটা লোক এসে বাবার মাথায় মারলে এক রাম-দার কোপ। হাতের কাছে পেয়ে তিনি তখুনি তাকে তুলে মারলেন এক আছাড়। লোকটা আঘাত পেয়ে সেইখানেই অর্ধমূর্ছিত হয়ে প'ড়ে রইল। মাথায় তখনও রাম-দাখানা গেঁথে ব'সে আছে, সেই অবস্থাতেই মেয়েটির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময় আর একটা লোক এসে তাঁর মাথা থেকে রাম-দাখানা সাঁ ক'রে টেনে নিলে।

সঙ্গে সঙ্গে তার রগে একটা চপেটাঘাত পড়ল, যার ফলে চোখের কতগুলো শিরা তার ছিঁড়ে গেল এবং তারই যন্ত্রণায় হাসপাতালে গিয়ে সেই রাত্রেই সে ধরা পড়ে।

আততায়ীরা দুজন রাম-দাখানা নিয়ে পালিয়ে গেল। মেয়েটি ফুটপাথের ওপরে প'ড়ে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। হতভাগিনীকে দুর্বৃত্তেরা চব্বিশ ঘা কোপ মেরেছিল।

বাবার মাথার মধ্যিখান থেকে ডান চোখের ভুরু অবধি একেবারে দুখানা—বাক্‌শক্তি তাঁর রহিত হয়ে গেছে, ডান চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। মেয়েটিকে মাটি থেকে তুলছেন আর ঘুরে ঘুরে আছাড় খেয়ে পড়ছেন।

কল্পনার চোখে একবার সে দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করুন। ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা শহরের কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ওপরে একটি মৃতকল্প নারীকে একজন মরণাপন্ন আহত যুবকের অন্তিম-সাহায্যের সেই বিফল প্রয়াস! এমনই সময় মিস নীল হেদোর ধার থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। খুনের ব্যাপার আরম্ভ হতেই সহিস-কচুয়ানেরা গাড়ি ফেলে দৌড় মেরেছিল। তারাই মিস নীলকে গিয়ে খবর দেয়।

মিস নীল মেয়েটিকে বাসে তুলে নিয়ে হাসপাতালে চ'লে গেলেন, আর বাবা চললেন হেঁটে মেডিকেল কলেজের দিকে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর পাড়ার এক হিন্দুস্থানী খাবারের দোকানের লোকেরা তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে ধ'রে বাড়িতে নিয়ে এল। তার কিছু পরে পাড়ার লোকেরা এসে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

এর পরের অধ্যায়টা তত করুণাত্মক নয়। চারিদিক থেকে বাবার নামে চিঠি প্রশংসাপত্র ইত্যাদি আসতে শুরু হয়ে গেল। যার নামে

চিঠি আসতে লাগল—এমন বীরের পত্নী তিনি, তাঁর মতন ভাগ্যবতী আর কে আছে!

আট-দশটা ঘড়ি ও মেডেল তো আমরাই দেখেছি।

বাবার যেমন বড় কারবার, তেমনই বড় লেনদেনও ছিল। পাওনাদারেরা মিলে ব্যবসা, মালপত্র, জমিজমা কেড়ে নিলে। কি ক'রে যে কি হ'ল, মা তা বুঝতেও পারলেন না। তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা, তার ওপরে স্বামী-চিন্তায় তাঁর অন্য কোনও জ্ঞানই ছিল না। প্রায় চল্লিশ দিন পরে বাবা প্রথম চোখ চাইলেন ও প্রায় ছ-মাস পরে তিনি বাক্‌শক্তি ফিরে পেলেন।

ইতিমধ্যে প্রশংসাপত্র রোজ আসতে থাকে বিশ-পঞ্চাশখানা। সংসার অচল। দাদাকে ও আমাকে আমাদের অন্য মা অর্থাৎ পিসীমা নিয়ে গেলেন। আত্মীয় যাঁরা, তাঁরা বাবা ব্রাহ্ম হওয়ার জন্য বিষম বিমুখ। অমিত্রনীদের ঘনঘটায় 'পন্থ বিজন অতি ঘোর', এমনই দুর্দিনের এক সকালে মার নামে একখানা চিঠি এল। খাম খুলে দেখা গেল, তার মধ্যে একশো টাকার একখানি নোট আর একখানি ছোট্ট চিঠি—ইংরেজী ভাষায় লেখা। পত্রপ্রেরকের নাম-ধাম কিছুই লেখা নেই।

বাবা সেরে উঠতে অর্থাৎ চ'লে ফিরে বেড়াতে প্রায় দেড় বৎসর সময় লেগেছিল। এই সময় একদিন ব্রাউন সায়েবই বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কথায় কথায় প্রকাশ পেল যে, সেই একশো টাকার নোটখানা তিনিই পাঠিয়েছিলেন। ব্রাউন সায়েবই চেষ্টা ক'রে সরকারী আপিসে বাবার চাকরি ক'রে দিয়েছিলেন। এই চাকরির মেয়াদ শেষ ক'রে পেন্‌শন ভোগ করতে করতে তাঁর ইহলীলা সাঙ্গ হয়েছে। এই ব্রাউন সায়েব অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের পরিবারের

অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বাবা, মা ও আমাদের তিন ভাইকে যে তিনি কত স্নেহ করতেন, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারা যায় না।

আমাদের তিন ভাইয়ের বিনা অনুমতিতে দোতলা থেকে একতলায় নামবার হুকুম ছিল না বটে; কিন্তু ব্রাউন সায়েবের বাড়ি গেলে বাবা কিছু বলতেন না। দাদা রোজ সেখানে যেত ফুটবল খেলতে। অক্সফোর্ড মিশনের পিছনে খানিকটা খালি জমি প'ড়ে ছিল, যেখানে এখন অক্সফোর্ড মিশন হস্টেল হয়েছে, এই জমিতে ছেলেদের খেলা হ'ত। দাদা রোজ সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে ফিরে আমাদের কাছে খেলার নানা কায়দা দেখাত ও বোঝাত। একবার কি একটা অপরাধে দাদার অক্সফোর্ড মিশনে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

মিশনে যাওয়া বন্ধ হ'ল ব'লে খেলা বন্ধ হ'ল না। আমাদের ফুটপাথেই পাশাপাশি কতকগুলো বড় কদমগাছ ছিল (তার একটাও আজ নেই)। তখন বর্ষাকাল। দাদা নিত্য কোন সুযোগে বিকেলবেলা চট ক'রে একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে একরাশ কদম নিয়ে আসতে লাগল। এই কদম দিয়ে প্রতিদিন দোতলার ওপরকার নেড়া ছাদে আমাদের তিন ভাইয়ের ফুটবল খেলা শুরু হয়ে গেল। দাদা থাকত একা এক দিকে, আমি আর অস্থির আর এক দিকে।

খেলা খুবই জ'মে উঠতে লাগল। দাদা রোজ আমাদের 'ক্যারি', 'ডজ', 'ড্রিবলিং' সব নতুন নতুন প্যাঁচ শেখাতে লাগল। শেষকালে একদিন মোক্ষম প্যাঁচ শেখালে—"পুশ"—Push।

পুশটা কিন্তু জমল সবচেয়ে বেশি। দাদা আমায় লাগায় পুশ, আমি দাদাকে লাগাই পুশ—এই রকমে প্রতিযোগিতা বাড়তে বাড়তে দাদা একবার আমায় এমন একটি পুশ লাগালে যে, আমি ঠিকরে প'ড়ে একেবারে আলসে থেকে বেরিয়ে পড়লুম। দাদা তখুনি ছুটে এসে

আমার পা দুটো ধ'রে ফেললে। আমার মাথাটা নীচু দিকে, পা দুটো দাদার হাতে, ফুটপাথ থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচুতে শূন্যে ঝুলতে লাগলুম। দাদার সঙ্গে অস্থিরও এসে যোগ দিলে। দুই ভাই মিলে টানাটানি ক'রে আমাকে ওপরে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু তাদের সাধ্য কি! তখন আমায় মাধ্যাকর্ষণে টেনেছে—তারা তো তখন বালক, কতটুকু শক্তি তাদের!

আমার কিন্তু আলসের ধারে পড়ামাত্র প্রায় সংজ্ঞালোপ হয়েছিল। স্বপ্নের মতন বোধ হচ্ছিল, যেন দাদা আর অস্থির আমার পা ধ'রে টানাটানি করছে। কিছুক্ষণ সেই ভাবে ঝুলে থাকবার পর তাদের হাত ফস্কে একেবারে রাস্তায় এসে পড়লুম।

রাস্তায় পড়লুম বললে ঠিক বলা হবে না। গত জন্মে এক ব্যক্তি আমার কাছে প্রভূত ঋণ ক'রে স'রে পড়েছিল। সেই আমার জন্মান্তরের খাতক সে সময় আমাদের বাড়ির ধার দিয়ে গুটিগুটি চ'লে যাচ্ছিল—আমি এসে পড়লুম তার পিঠের ওপরে।

আমার যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখলুম, উঠোনে বসিয়ে আমার মাথায় বালতি বালতি জল ঢালা হচ্ছে আর মা ছুটে আসছেন। আমি 'মা' ব'লে চীৎকার করতেই তিনি আমায় কোলে তুলে ওপরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

তারপরে মার কান্না, বাবার চেঁচামেচি, ডাক্তার ডাকাডাকি ইত্যাদি।

আমার সেরে উঠতে বোধ হয় দিন দুয়েক সময় লেগেছিল। ছাত থেকে পড়ার সময় বারান্দার রেলিঙে বাঁ পায়ের হাঁটুটায় চোট লেগেছিল। দিন দুয়েক মালিশ-টালিশ করতেই ভাল হয়ে গেল। ঠিক চার দিনের দিন আবার বালির কাগজের খাতায় হস্তলিপি নিয়ে, ইস্কুলে গিয়ে হাজির হলুম।

প্রথম ঘণ্টায় যথারীতি দুই নম্বরের শিক্ষয়িত্রী সবার হাতের লেখা দেখে নাম-সই ক'রে দিলেন। প্রতিদিন কার্যারম্ভেই যে হতভাগ্য তাঁর মেজাজ বিগড়ে দেয়, সে না থাকায় হয়তো মনটা তাঁর খুশিই ছিল। 'রয়েল রিডার ওল্ড নং ১'-এর ঘোড়ার গল্প খুলে পড়াতে গিয়ে আমার দিকে চোখ পড়তেই তিনি বললেন, কে রে, স্থবির এসেছিস! আয় আয়, এদিকে আয়।

এ যেন একেবারে অন্য কোন লোক! আমি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছিস?

ভাল আছি।

তিনি আমাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, কাল তোর মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি কত দুঃখ করতে লাগলেন। তোর নাকি আরও ফাঁড়া আছে, আর ছাতে উঠিস নি—ইত্যাদি কত কি যে বলতে লাগলেন, বিস্মৃতির অতল সাগরে সেসব কথা তলিয়ে গেছে। শুধু মনে আছে, তাঁর স্নেহের সেই স্পর্শ, তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে আমার সুখদুঃখের প্রতি গভীর সহানুভূতি আমার মর্মে গিয়ে আঘাত করতেই দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনমাসব্যাপী প্রতিদিনের সেই পীড়নের ইতিহাস অশ্রুজলে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। কুকুর যেমন নিঃশব্দে মনিবের আদর গ্রহণ করে, তাঁর স্নেহের পরশ আমি তেমনই ক'রে উপভোগ করতে লাগলুম। কত কথা, কত কৃতজ্ঞতা সেই শিশুমনের মধ্যে গুমরে গুমরে ফুলতে লাগল, তা কোনদিন প্রকাশ করবার অবকাশ পাই নি। আজ সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁর সেই ঋণ স্বীকার করছি।

আমার আরও ফাঁড়া আছে—এ কথাটা যে কেমন ক'রে বাড়ির

লোক জানতে পারলে, জানি না। রাস্তায় বেরুনো বন্ধ তো ছিলই, এই ঘটনার পর ছাতে ওঠাও আমাদের বন্ধ হয়ে গেল। পুজোর ছুটির সময় পাছে সারাদিন দুরন্তপনা ক'রে বেড়াই, সেই ভয়ে ছুটি হতে না হতে আমাকে মার সঙ্গে চালান ক'রে দেওয়া হ'ল পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে। আমার তত্ত্বাবধানের জন্যে দেবীসিং দরওয়ান চলল আমার সঙ্গে।

এই ছ-বছর বয়সে বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হ'ল। এর আগে কলকাতার আশেপাশে দু-একটা বাগানবাড়ি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পল্লীগ্রামে এসে আমার মনে হ'ল, আমি যেন প্রকাণ্ড একটা বাগানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আহা! আহা! কি মজা! কি মজা! শিশুচিত্তের সে উল্লাস আমি কোন্ ভাষায় বর্ণনা করব! আজকের পল্লীমাতার অঙ্গ দুর্গন্ধে ভ'রে উঠেছে, কিন্তু সেদিন প্রথমেই আমায় আকর্ষণ করেছিল পল্লীগ্রামের সেই গন্ধ—যা শহরে দুর্লভ। দিনের বেলায় কত ফুল চারিধারে ফুটে থাকে! কি বিচিত্র রঙ ও রেখার কারিগরি! তাদের নাম জানি না, কিন্তু দেখামাত্র মনে হয়, কত দিনের পরিচয় যেন তাদের সঙ্গে! কত অদ্ভুত পোকা, কত রঙ-বেরঙের পাখি! কত বাহারের নামই বা তাদের! রাত্রে রহস্যময় শেয়ালের ডাক—যে শেয়ালের গল্প শুনতে শুনতে কত দিন মার কাছে ঘুমিয়েছি; আর গাছে গাছে জোনাকির ফুলঝুরি—কোথায় লাগে কালীপুজোর ফুলঝুরি তার কাছে! প্রকৃতির সঙ্গে কত ভাবে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে লাগল। আরও বাকি থাকে—প্রতিদিনই নতুন কিছু দেখি, নতুন কিছু শিখি। প্রকৃতির ভাণ্ডারে কত রত্ন! পাঁচ-ছ মাস ইস্কুলে যাতায়াত ক'রে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, এখানে এসে যেন বেঁচে গেলুম।

দু-দিনেই বন্ধুবান্ধবী জুটে গেল বোধ হয় বিশ-পঁচিশটি। তাদের সঙ্গে যেন কত দিনের পরিচয়! এই আনন্দের মধ্যে অস্থির ও দাদার জন্যে মাঝে মাঝে ভারি কষ্ট বোধ হ'ত। রাত্রে মার পাশে শুয়ে তাঁর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে খোশামোদ করতুম, দাদা আর অস্থিরকে নিয়ে এস না মা।

মা বলতেন, আর দাঁড়াও বাপু! তোমাকে এখন ভালয় ভালয় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। যা ছেলে জন্মেছ তুমি!

একেবারে দ'মে যেতুম।

নিরবচ্ছিন্ন ফুর্তির আর একটি বাধা ছিল আমার দেবীসিং। যেখানেই যাই, ছায়ার মতন বেটা সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, আর আধ ঘণ্টা অন্তর আমাকে মন্ত্রপূত শরবৎ খাওয়ায়, বোধ হয় ফাঁড়া কাটাবার জন্যে। এই দুটি বাধা ছাড়া—ওঃ, কি ফুর্তি! কি ফুর্তি!

ফুর্তির আরও একটু বাকি ছিল। সেই কথাটাই এখন বলি।

আমরা যাঁদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলুম, তাঁরা হচ্ছেন জমিদার। সেখানকার হালচালই আলাদা। সে হালচাল কলকাতার সাধারণ লোক কল্পনাই করতে পারবে না। একটা উদাহরণ দিই—লাট্টু ঘোরাতে আমি বড্ড ভালবাসতুম এবং সেই বয়সেই একটি পাকা লাট্টু-ঘুরিয়ে হয়ে উঠেছিলুম। আমার নিজের আট-দশটা লাট্টু ছিল। কিন্তু আসবার সময় ভুলে সেগুলো কলকাতাতেই ফেলে এসেছিলুম। এখানে এসে লাট্টুর শোকে মার জীবনটি অতিষ্ঠ ক'রে তুললুম। পাড়াগাঁয়ে তিনি লাট্টু পাবেন কোথায়! সবেমাত্র তেতলার ছাত থেকে প'ড়ে বেঁচে-যাওয়া ছেলেকে যে অন্য শিক্ষা দিয়ে লাট্টুর শোক ভুলিয়ে দেবেন, তাও প্রাণ ধ'রে পেরে উঠছেন না। এমন সময়ে

একদিন লাট্টুর জন্যে আমাকে কাঁদতে দেখে জমিদার-গিন্নী বললেন, কি হয়েছে বাবা, চোখে জল কেন?

লাট্টু।

তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, লাট্টু কি?

লাটিম।

ও, লাটিম চাই? এই কথা! তা কান্না কিসের?

তখুনি কুঁদো কুঁদো কাঠ এসে গেল। কোথায় ছিল মিস্ত্রীর দল, তাদের ডেকে আনা হ'ল। তারা চাকা ঘুরিয়ে লাট্টু কুঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। রাজ্যের ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়াল উঠোন ঘিরে। সন্ধ্যে নাগাদ প্রায় পঞ্চাশটা লাট্টু এসে গেল আমার খাস তাঁবে।

আমার মনে হতে লাগল, এই যেন আমার আসল জায়গা। এইখান থেকে উপড়ে নিয়ে গিয়ে আমাকে শহরের টবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তারপর যেদিন শুনলুম, গ্রামের ত্রিসীমানার মধ্যে ইস্কুল ব'লে কোনও পদার্থের বালাই নেই, তখন মাকে ব'লে ফেলা গেল, মা, আমি এইখানেই থাকব।

জমিদার-বাড়ির কয়েকজন মহিলা আমায় বললেন, আমরা তোমায় যেতে দোব না, তোমার মাকেও না। তোমরা এইখানেই থাকবে।

ফুর্তির চোটে তিন লাফ মেরে বেরিয়ে পড়লুম বাড়ি থেকে। দেবীসিং ছুটল পিছু পিছু।

ছুটলুম নদীর ধারে—যেখানে রঙ-বেরঙের হাঁস সারাদিন চ'রে বেড়ায়, সন্ধ্যেবেলা কোথায় উড়ে চ'লে যায়—হিমালয়ের বুকে মানস-সরোবরে; যেখানে পাড়ে কত রকমের পোকা-মাকড়, শামুক—ছোট ছেলে দেখলেই গর্তে ঢুকে পড়ে, ধরতে পারা যায় না; মাটির বুকে

যেখানে নদীর স্রোত প্রতিদিন বিচিত্র অক্ষরে মনের কথাটি লিখে রেখে যায় ; দেবীসিং ব্যাটা তার কি বুঝবে !

জমিদার-বাড়িতে খুব ধুম ক'রে সমস্ত পুজো হ'ত। সেদিন বোধ হয় কালীপুজোর ভাসানের দিন। শোনা গেল, নদীতে বাচ-খেলা হবে আর হবে বাই-নাচ। সমস্ত দিন উৎকণ্ঠায় কাটতে লাগল। বাচ-খেলা আবার কি রকম খেলা ? ফুটবল-খেলার ধকল কাটতে না কাটতে এ আবার এক নতুন খেলা—এ খেলার নাম দাদা পর্যন্ত শোনে নি নিশ্চয় !

বাই-নাচ জিনিসটাই বা কি রকম ? পুতুল-নাচের কথা শুনেছিলুম বটে, কিন্তু চোখে কখনও দেখি নি। বাই-নাচ যে কি জিনিস, তা কল্পনা করতে চেষ্টা করতে লাগলুম। আমার মানসপটে স্থাবর জঙ্গম যা কিছু সব বিবিধ অঙ্গভঙ্গীতে নাচতে শুরু ক'রে দিলে।

সন্ধ্যে হতে না হতে দেবীসিং সনাথ নদীর ধারে গিয়ে হাজির হলুম। কতকগুলো গাধাবোট-গোছের নৌকো পাশাপাশি বেঁধে তারই পাটাতনের ওপর বড়-গোছের একটি ঢালা বিছানা পাতা হয়েছে। দুটি স্ত্রীলোক খুব সেজেগুজে সেই আসরের এক কোণে চুপ ক'রে ব'সে আছে। তাদের আশেপাশে দু-তিন জোড়া তবলা-বাঁয়া। আসরে ছোট ছেলেপুলে কেউ নেই, জমিদার-বাড়ির আমারই বয়সী একটি মেয়ে ছাড়া ; আর যারা আছে, তাদের সকলেরই বয়েস অন্তত ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। আমি আসতেই তাঁরা সকলেই হৈ-হৈ ক'রে আমার অভ্যর্থনা করতে আরম্ভ করলেন, আসুন, আসুন স্থবিরবাবু, আসুন। বাড়ির সকলে ভাল তো ? ইত্যাদি। যেন আমিই সে আসরের প্রধান অতিথি।

ব্যাপারটা যে আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে, তা বুঝেও যতদূর সম্ভব

গাম্ভীর্য অবলম্বন ক'রে তো নৌকোতে উঠলুম। আমার অঙ্গে টকটকে লাল বনাতের কোট। তার পিঠে হাতে সব জরির কল্কা দেওয়া। পরনে লাল জরিপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি—কোঁচানো। পায়ে লাল ফুলমোজা, তার ওপরে ডসনের বাড়ির সামনে পেতলের নাল লাগানো বুটজুতো, মাথায় ঘন কোঁকড়া চুলে যতখানি সম্ভব কলকাতাই অ্যাল্‌বার্ট টেরি।

এই সজ্জায় সজ্জিত হয়ে বাঁ হাতে কোঁচার ফুলটি আলগোছে ধ'রে যখন আসরস্থ হলুম, তখন বয়স্কদের মধ্যে হাসির ধুম প'ড়ে গেল। দেবীসিং বসল আমার পাশে।

নৌকো চলতে শুরু হ'ল। জলের মধ্যে নানা রকমের আতশবাজি ছাড়া হতে লাগল। সেগুলো চ্যাঁ-চোঁ আওয়াজ করতে করতে পাগলের মতন জ্ঞানশূন্যভাবে দিগ্বিদিকে ছুটে লাফিয়ে বেড়াতে আরম্ভ ক'রে দিলে। ব্যাপারটা বেশ মজার লাগতে লাগল।

কিছুক্ষণ আগুনের খেলা চলবার পর গানের হুকুম হ'ল। তবলা বাঁধা শুরু হ'ল—তবলা বাঁধা শেষ হল। যতদূর মনে পড়ে, হারমোনিয়াম ছিল না, সারেঙ্গীর সঙ্গে গান আরম্ভ হ'ল।

সে ধরনের গান আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনি নি। আমাদের মন্দিরে, বাড়িতে কিংবা ইস্কুলে উপাসনার আগে যেসব গান শুনেছি এর সঙ্গে তার কোন মিলই নেই। একটার পর একটা গান চলতে লাগল—কখনও বাংলায়, কখনও হিন্দীতে। গান শুনতে শুনতে বাবুদের উষ্মা যেন ক্রমেই প'ড়ে আসতে লাগল। একজনের চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরতে দেখলুম। কেউ কেউ চোখ মুছতে লাগলেন, কেউ বা অশ্রু-ভারাক্রান্ত জড়িত-কণ্ঠে তারিফ করতে লাগলেন, বা বাইজী, বা!

বেশ—বেশ!

আমি সেই সঙ্গীত বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলুম। তান-কর্তব-বাটের

মধ্যে গানের ভাষা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কখনও ভাল লাগে, আবার কখনও হাসি পায়, এইরকম করতে করতে কখন যে সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে গেলুম জানি না। আমার মনে হতে লাগল, সমস্ত আকাশ জুড়ে একটা বিরাট আকৃতির ঝড় বইছে। তার মধ্যে কি আকুলতা, কি অনুনয়! কে যেন নিষ্ঠুর চ'লে গেছে—কে সে, তার কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। সে আসবে না, সে আসে না, কিন্তু তাকে পাওয়াই চাই। সে অনুনয়ের মধ্যে মিনতি আছে, কিন্তু অশ্রু নেই, সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে তার কাছে অতি হীন হতে চাই, কিন্তু তবুও সে নিঃস্বতার মধ্যে অগৌরব নেই।

আমাদের মাথার ওপরে তারকাখচিত অতি ঘনকৃষ্ণ চন্দ্রাতপ, নীচে কল্লোলময়ী কালিন্দী। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার, নৌকোর মধ্যে যে আলো জ্বলছে, তাতে আসরের সবটা আলোকিত হয় নি। কোনও রকমে সকলের মুখ দেখা যাচ্ছে মাত্র। মধ্যে মধ্যে সুরের জাল ভেদ ক'রে দাঁড়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—ছপ্ ছপ্।

গান শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যেও যেন একটা আকুলতা জাগতে লাগল। সে যেন এক বেদনাময় আকুলতা। কাকে যেন চাই, তার সঙ্গে আমার কত দিনের পরিচয়! সে বাবা-মা-ভাই-বোনদের মধ্যে কেউ নয়। কে সে? এই কি যৌন-চেতনার উন্মেষ? না, শিশুচিত্তের এই প্রথম জাগরণ?

আবার মুখ তুলে সবার দিকে ভাল ক'রে দেখলুম। সবার মুখই যেন বিষাদে ম্রিয়মাণ। আমার মনে হতে লাগল, আমার মুখও কি ওদের মতই বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে?

তাদের দেখতে দেখতে আমার চিন্তাধারা আবার অন্য মুখে প্রবাহিত হ'ল। মনে হতে লাগল, ব্রহ্মমন্দিরের মতন এও যেন একটা

মন্দির। সেখানে তারা ঘরের মধ্যে বসে, এরা বসেছে প্রশান্ত আকাশের নীচে—জলের ওপরে। তারা মন্দির সাজায়—এরা জলে বাজি ছোঁড়ে। সেখানে বেদীর ওপর ব'সে শাস্ত্রী মশায় চেঁচামেচি করেন, এখানে ওই মেয়েটি দাঁড়িয়ে গান গায়। শাস্ত্রী মশায়ের ধমক শুনে সেখানে লোকে কাঁদে, মেয়েটির গান শুনে এখানেও লোকে কাঁদে। মনে মনে শঙ্কিত হতে লাগলুম, কোন্ দিন না আবার এরা রাত্তির চারটের সময় উঠিয়ে স্নান করায়!

নৌকো চলেছে, গান চলেছে, তবলা সারেঙ্গী চলেছে, আরও বোধ হয় কিছু কিছু চলছিল, এমন সময় আসরের সবাই একযোগে হৈ-হৈ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠল। কি হ'ল ? কি হ'ল ? নৌকোর তলা ফেঁসে গেছে।

কোথায় রইল অবলা বাইজী আর কোথায় রইল তার তবলা! যে যার নদীর জলে টপাটপ লাফিয়ে পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে।

দেখতে দেখতে আসরের চাদর পর্যন্ত ভিজে উঠল। সবার সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। বাঁ হাতে কোঁচার ফুল একটু শক্ত ক'রে ধ'রে ব্যাপারটা যে কি হ'ল তাই হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় জমিদার-বাড়িরই একটা চাকর আমায় বললে, স্থবিরবাবু, দাঁড়িয়ে দেখছ কি ?

ব'লেই লোকটা গোঁৎ খেয়ে জলের মধ্যে ঢুকে গেল। দেবীসিং আমার ডান হাতখানা আরও চেপে ধরলে।

ছেড়ে দে দেবীসিং, লাফিয়ে পড়ি।

বলামাত্র দেবীসিং আমার হাতখানা ছেড়ে দিলে। মারলুম লাফ জলের মধ্যে। মনে হ'ল, দেবীসিংও যেন আমার সঙ্গে লাফিয়ে পড়ল।

জলের মধ্যে প'ড়েই আঁকুপাঁকু শুরু হ'ল। একবার তলিয়ে যাই, আবার ভেসে উঠতে না উঠতে আবার তলিয়ে যাই। এরই মধ্যে

মাঝে মাঝে কে যেন আমাকে ধরবার চেষ্টা করে, কিন্তু ধ'রে রাখতে পারে না।

কিছুক্ষণ বড় কষ্টে কাটল। তারপর একটা আরামের আবেশে সমস্ত দেহ মন ভ'রে উঠতে লাগল। ছাত থেকে পড়বার সময় আলসের ধারে পড়ামাত্র প্রায় জ্ঞান লোপ পেয়েছিল—এ যেন সে রকম নয়। টনটনে জ্ঞান আছে, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করবার ইন্দ্রিয়টি যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুভয় হয় নি, কারণ মৃত্যুর বিবরণ তেমন জানা ছিল না। মনে হতে লাগল, অতি ধীরে ঘুরতে ঘুরতে যেন আমি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছি। দাদা, অস্থির কিংবা ইস্কুলের বন্ধু-বান্ধবী কারুর কথা মনে এল না। আরামে গা ঢেলে দিয়ে আমি ধরণীর ভিত্তিভূমির দিকে নেমে যেতে লাগলুম। নামতে নামতে এক জায়গায় এসে গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। আমার চারিদিকে অপূর্ব এক রকমের আলো উদ্ভাসিত হতে লাগল। এ রকমের আলো আগে আর কখনও দেখি নি। পার্থিব কোন আলোর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সঙ্গীতময়ী সে দীপ্তি। তা থেকে বিচিত্র সুরের ঝরনা নেমে এসে আমার কানে বাজতে লাগল ঝিরঝির ক'রে। সেই আলোর মধ্যে একবার কি দুবার মার মুখখানা নিমেষের জন্যে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল, তারপরে আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হ'ল, মনে হ'ল, কঠিন ভূমিতলে আমি শুয়ে রয়েছি। আমার পাশ দিয়েই, বোধ হয় হাতখানেক দূরেই, নদী ব'য়ে যাচ্ছে। তারই ছলাক ছলাক আওয়াজ কানে আসতে লাগল।

চোখ চেয়ে দেখলুম, মাথার ওপরে শশীতারাহীন ফ্যাকাশে আকাশ, আর তার ওপর দিয়ে কালো কালো মেঘের পিণ্ড গড়াতে গড়াতে দৌড়ুচ্ছে।

আমি যে একটা মারাত্মক রকমের বিপদে পড়েছিলুম, তা থেকে উদ্ধার পেয়েছি ; কোথায় এসে পড়েছি ; এখান থেকে বাড়ি কত দূরে, কেমন ক'রে সেখানে যাব—এসব কোনও চিন্তাই তখন মনের মধ্যে উদয় হ'ল না। শুধু মনে হতে লাগল, আমি একা, কেউ কোথাও নেই। বাবা, মা, ভাই, বন্ধু, বান্ধবী, জন্তু, জানোয়ার, পাখি, গাছ, ফুল, গাড়ি, ঘোড়ার যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, সে সবই যেন স্বপ্নে দৃষ্ট। এ ধরায় আমি যেন এই প্রথম এলুম, ইস্কুল-টিস্কুল সেসব দুর্ঘটনা যেন পূর্বজন্মে ঘ'টে গিয়েছে, সে ভোগ আর ভুগতে হবে না। কাল সকালে রাজকন্যা এই নদীর ধারে নাইতে এসে আমাকে দেখতে পেয়ে আদর ক'রে তুলে নিয়ে যাবে তার প্রাসাদে।

মনের মধ্যে বেশ একটা উৎসাহের তাড়া পেয়ে উঠে বসলুম। হায়, হায়! দেহের দিকে চেয়ে একেবারে দ'মে গেলুম। আমার অত সাধের ডসনের বুট আর খুনী রঙের মোজা, অমন বাহারের শান্তিপুরের জরিপেড়ে কোঁচানো ধুতি কোথায় উধাও হয়েছে! গায়ে সেই লাল বনাতের কোটটি ছাড়া কোমরের নীচ থেকে পা অবধি কোথাও এক-গাছি সুতোর চিহ্নমাত্র নেই। সাংসারিক বুদ্ধি না থাকলেও এটা বেশ বুঝতে পারলুম, এ অবস্থায় রাজকুমারীর চোখে পড়লে অভ্যর্থনাটা মোটেই মনোরম হবে না।

চুপ ক'রে ব'সে ভাবতে লাগলুম। একে একে বাড়ির সবার কথা মনে প'ড়ে কান্না পেতে লাগল, আর করতে লাগল শীত। ও! কি দারুণ শীত সে!

কতক্ষণ এই ভাবে ব'সে ছিলুম, ঠিক বলতে পারি না ; বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েক হবে। তারপরে হঠাৎ আকাশের এক দিকে অনূরু অরুণের আগমন-বার্তা আলোর অক্ষরে ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভরসায় বুক ভ'রে গেল।

তখনও আকাশচত্বরে সূর্য দেখা দেয় নি, কিন্তু দূরে কাছে সব জিনিস বেশ দেখা যাচ্ছে। আমি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দূরে দেখবার চেষ্টা করছি, এমন সময় দেখতে পেলুম, কে যেন ঝপাঝপ আওয়াজ ক'রে সাঁতার কাটতে কাটতে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটা বুকজলে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপরে জল ঠেলে ঠেলে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। দূর থেকে তাকে মোটেই চিনতে পারি নি, একেবারে কাছে এলে দেখলুম, সে দেবীসিং।

আমি চীৎকার ক'রে ডাকলুম, দেবীসিং, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

দেবীসিং আমার কাছে এসে হাঁপাতে লাগল। কোথায় গেছে তার বিশাল পাগড়ি, হাঁটু অবধি ঝোলা মোটা ছিটের পিরান তাও অঙ্গে নেই। ধুতিটা বাঁধা আছে বটে, তারও অনেক জায়গা ছিঁড়ে গেছে। সেই অবকাশ দিয়ে তার রোমশ ব্যায়ামপুষ্ট দেহ দেখা যাচ্ছে। সমস্ত মুখ গা হাত পা তার সাদা হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমাকে দেখে সে উবু হয়ে ব'সে বললে, পিঠে চড়্।

এক লাফে পিঠে চ'ড়ে বেশ ক'রে তার গলাটা জড়িয়ে ধরলুম। আর কোনও কথা না ব'লে সে জলের মধ্যে নেমে ঝপাঝপ ক'রে সাঁতরে চলল যেদিক থেকে এসেছে সেই দিকে।

প্রায় আধ ঘণ্টা সাঁতার কেটে এপারে এসে দেবীসিং পিঠ থেকে নামিয়ে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকল। তখন রোদ বেশ চড়চড়ে হয়েছে, গ্রামের লোকজনেরাও বেরিয়েছে। আমাদের আসতে দেখে আগেই তারা ছুটে বাড়িতে গিয়ে খবর দিলে। আমি দেখলুম, মা দৌড়ে আসছেন, তাঁর পেছনে আরও কয়েকটি পুরমহিলা ছুটেছেন, তাঁদের পেছনে লোক-লস্কর ও এক পাল ছেলেমেয়ে। মার ক্রোড়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়েই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

কয় ঘণ্টা বা কয় দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলুম জানি না, কিন্তু আমার জন্যে ডাক্তারকে বেশি ভুগতে হয় নি। গ্রামের ডাক্তার আর কবিরাজ মাকে নিয়ে মুশকিলে পড়ল। আমাদের নৌকো বানচাল হওয়ার সংবাদ পাবার পর থেকে আমাকে ফিরে পাওয়া পর্যন্ত মা এমন মাথা কুটেছিলেন যে, তার ঘা সারাতে ডাক্তার-বদ্যি ঘায়েল হয়ে পড়ল।

মাস দেড়েক বাদে আমরা কলকাতায় ফিরে এলুম।

অস্থির বললে, স্থব্‌রে, তুই ম'রে গিয়েছিলি ভাই, আমি তোর জন্যে কত কাঁদলুম।

মা অস্থিরকে ধমক দিয়ে বললেন, অমন কথা আর কখনও মুখে এনো না।

দাদা বললে, খুব ছেলে তৈরি হয়েছিস স্থব্‌রে! যেখানে যাবে, সেখানেই হাঙ্গামা বাধাবে!

মা বললেন, আর ব'লো না। আমার হাড় ভাজা-ভাজা করলে।

বাবা বললেন, এই ছেলেকে নিয়ে তোমায় অনেক ভুগতে হবে।

মা বললেন, আমার বরাত।

বাবা বললেন, ওর আরও অনেক ফাঁড়া আছে। এখন থেকে সাবধান না হ'লে নিজেই ভুগবে।

বাবার কথা মিলে গেছে। সেই থেকে ফাঁড়া এখনও আমার সঙ্গ ছাড়ে নি, তবে তার আক্রমণের ধারাটা বদলিয়েছে মাত্র।

আমাদের ছেলেবেলায় মোটরগাড়ি অথবা রিক্‌শাগাড়ির চলন ছিল না। ট্রামগাড়ি ঘোড়ায় টানত। বড় রাস্তায় মাঝে মাঝে ট্রামের ঘোড়াদের আস্তাবল ছিল। ইলেকট্রিক ট্রামের চলন হওয়ায় কোম্পানি সেসব আস্তাবলের জায়গা বিক্রি ক'রে দিয়েছে। বোধ হয়, ব'লে রাখা ভাল যে, বাংলা বইয়ের বিখ্যাত প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সের বর্তমান দোকান এই রকম একটা ট্রামের আস্তাবলের জায়গায় তৈরি।

ট্রাম এই আস্তাবলের কাছে পৌঁছলে ঘোড়া বদল হ'ত। ট্রামগাড়ির দু দিকেই পা দান থাকত। লোক যে দিক দিয়ে ইচ্ছে উঠত নামত। কালীঘাট কি খিদিরপুরের ট্রাম ইঞ্জিনে টানত।

ঘোড়ায় টানা ট্রামের চালকের মুখে থাকত একটা বাঁশী, সামনে লোক দেখলেই সে কিরকির্ ক'রে বাঁশী বাজাত। কলকাতার প্রায় প্রত্যেক ছোট ছেলেরই এই রকম একটা বাঁশী থাকত। রাতে তো পথে তখন এত আলো ছিল না, সেইজন্যে সন্ধ্যে হতে না হতেই ট্রামের ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হ'ত। পথঘাট অপেক্ষাকৃত নির্জন হয়ে গেলে অনেক দূর থেকে ট্রাম আসার শব্দটা আমাদের বেশ লাগত।

এখনকার মত ট্রামে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল না। একখানা ট্রাম, আর তাতে সর্বশ্রেণীর লোকই যাতায়াত করত। ট্রামের ভাড়া শ্যামবাজার থেকে গড়ের মাঠ অবধি ছিল পাঁচ পয়সা। টিকিটের ওপর বাংলা ভাষায় যেসব নির্দেশ লেখা থাকত, তার নিদর্শন আমাদের সাহিত্য-পরিষদের মিউজিয়ামে থাকা উচিত।

ঘোড়ার গাড়ি চলত অনেক রকমের। ডাক্তারেরা অনেকেই গোল গাড়ি চ'ড়ে ঘুরতেন এবং ছোট বড় প্রায় সব ডাক্তারই দিশী পোশাকে রুগী দেখতে বেরুতেন। ডাক্তারদের গাড়ি দেখলেই চিনতে পারা

যেত। এ ছাড়া পাল্কিগাড়ি, ফিটনগাড়ি, ভিক্টোরিয়া ফিটন, মি-লর্ড ফিটন, ল্যাণ্ডো প্রভৃতি আরও অনেক রকমের গাড়ি চলতি ছিল। জুড়ি-ঘোড়ার গাড়ি তো হরদমই চলত। মাঝে মাঝে, বিশেষ ক'রে বিয়ের শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে তিন চার ছয় আট ষোলো, এমন কি চব্বিশ ঘোড়ার গাড়িও রাস্তায় বেরুত। শৌখিন বাবুরা বিকেলবেলায় নিজেরা টমটম হাঁকিয়ে বেড়াতে বেরুতেন। আরামপ্রিয় ধনীরা বেরুতেন জুড়ি-গাড়িতে, দেখতুম, কেউ কেউ গাড়িতে ব'সেই গড়গড়ায় তামাক টানছেন। সহিস-কোচুয়ানদের পোশাক খুবই জগমগে ছিল। ল্যাণ্ডো বা ফিটন ইত্যাদি বড় গাড়িগুলোর পেছনে সাজগোজ ক'রে দুজন সহিস দাঁড়াত। কোনও জায়গায় মোড় ফেরবার দরকার হ'লে সহিস দুজন একসঙ্গে চলতি গাড়ি থেকে তড়াক ক'রে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে দৌড়ে গাড়ি পেরিয়ে গিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চীৎকার করত, হেই-ও-ও-ও! অর্থাৎ পদব্রজে যারা যাতায়াত করছ, তারা সতর্ক হও, আমার মনিবের গাড়ি আসছে। গাড়ি ততক্ষণে এসে মোড় ঘুরলেই আবার তারা তড়াক ক'রে গাড়ির পেছনে লাফিয়ে উঠে পড়ত। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে বেশ সমারোহ ছিল।

ঘোড়া জানোয়ারটা আমাদের শিশুচিত্তে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঘোড়া সম্বন্ধে কত তথ্যই যে শিখেছিলুম, তা মনে পড়লে হাসি পায়। প্রায় রোজই দেখতুম, কোনও না কোনও গাড়ির ঘোড়া ক্ষেপে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়চ্ছে। কত লোক চাপা পড়ছে, কেউ বা একটুর জন্য বেঁচে যাচ্ছে, রাস্তার দুধারে লোক হৈ-হৈ ক'রে চেঁচাচ্ছে। কোচুয়ান কিছুতেই সামলাতে পারছে না, অসহায়ভাবে রাশ টানাটানি করছে, তারপরে দড়াম ক'রে কোনও গ্যাস-পোস্টে কিংবা কোনও বাড়ির দেওয়ালে গিয়ে লাগল গাড়ি। কোচুয়ান গিয়ে

পড়ল বিশ গজ ছিটকে, আরোহীদের কারুর মাথা চুর হয়ে গেল, কেউ বা বেঁচে গেল।

এ দৃশ্য হামেশা আমাদের চোখের সামনে ঘটত। আমাদের মধ্যেও ঘোড়া-ঘোড়া খেলার খুবই চলন ছিল। একদিন ঠিক আমাদের ইস্কুলের সামনেই ট্রামের ঘোড়া দুটো ক্ষেপে গেল। অন্য গাড়ির ঘোড়া ক্ষেপলে তারা মারত রাম-দৌড়, কিন্তু ট্রামের ঘোড়া ক্ষেপলে তারা দাঁড়িয়ে যেত, কিছুতেই নড়তে চাইত না। মারধোর, টানাটানি, ঠেলাঠেলি, অন্য ঘোড়া এনে তাদের দু পাশে জুতে দিয়ে টানাবার চেষ্টা করিয়েও যখন কিছুতেই তারা স্বীকৃত হ'ত না, তখন তাদের খুলে নিয়ে অন্য একজোড়া ঘোড়া এনে জুতে দেওয়া হ'ত।

সেদিনও এই রকম হ'ল। ঘোড়া দুটো অনেক রকমের নির্যাতন সহ্য ক'রেও জেদ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। বোধ হয় ট্রাম-কোম্পানির ঘোড়াদের কাছ থেকেই মানুষের মনে নিরুপদ্রব অসহযোগের অনুপ্রেরণা এসেছে।

যা হোক, ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে সেদিনকার সেই অশ্বিনীতনয়-যুগলের বীরত্ব একটা সাড়া জাগিয়ে তুললে। ছোট ছেলেদের মধ্যে আমি ও আর একটি ছেলে খুব ভাল ঘোড়া ব'লে বিখ্যাত ছিলুম। তক্ষুনি কোথা থেকে লাকলাইন দড়ি এসে গেল। আমাদের জুড়িতে জোতা হ'ল। আমাদের চেয়ে বড় দুজন ছেলে কোচুয়ান হ'ল, দুটো লম্বা কঞ্চির ছিপটিও দেখতে দেখতে তৈরি হয়ে গেল।

ঘোড়া ছুটতে লাগল, ছুটতে লাগল বলা ভুল হবে, উড়তে লাগল—পক্ষীরাজ ঘোড়া কিনা! ইস্কুলের উঠোন, ঠাকুরদালান, সিঁড়ি কাঁপিয়ে হ্রেষাধ্বনি উঠতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে শপাং শপাং চাবুক চলেছে। যেখানে সে চাবুক পড়ছে, একেবারে লাল দাগ হয়ে যাচ্ছে। ইস্কুলের অন্য ছেলেরাও এসে খেলায় যোগ দিতে লাগল, কেউ সহিস, কেউ বা

আগে আগে চীৎকার করতে করতে ছুটেছে—হৈ-হৈ ব্যাপার, মেয়েরা একেবারে তটস্থ।

এতক্ষণ চলছিল মন্দ নয়, কিন্তু চাবুকের কিছু বাহুল্য ঘটায় হঠাৎ ঘোড়ারা ক্ষেপে উঠল। তারা এবার দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিলে। হ্রেষার সঙ্গে সঙ্গে চাঁটও চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে চাবুকও চলেছে শপাশপ। এই রকম যখন চলেছে, তখন সামনেই একটা মানুষ প'ড়ে গেল, দেখতে না দেখতে ক্ষ্যাপা ঘোড়ারা গিয়ে তাকে চাপা দিলে অর্থাৎ মারলে এমন ধাক্কা যে, সে পপাত ধরণীতলে—

মেয়েটি আমাদের সঙ্গে পড়ত। সে ছিল একের নম্বরের আহ্লাদী আর ছিঁচকাঁদুনে। তাদের পয়সাকড়ি ছিল এবং সে থাকত বোর্ডিঙে। প'ড়ে গিয়েই সে কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে ও একটু পরেই বোর্ডিঙের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে নালিশ করতে ওপরে চ'লে গেল।

বোর্ডিঙের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিক্রমের কথা আমরা সবাই জানতুম। তাঁর কড়া মেজাজের নানা কাহিনী রোজই ইস্কুলে বোর্ডিঙের মেয়েদের কাছে শোনা যেত, কিন্তু তিনি বোর্ডিঙের লোক ব'লে ইস্কুলে তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত না।

আমাদের কিন্তু তখন সেসব কথা মনেই এল না। আমরা তখন একে ঘোড়া ব'নে গিয়েছি, তার ওপরে হয়েছি ক্ষিপ্ত। আমরা দুজনে সেইখানে দাঁড়িয়ে চিঁহি-চিঁহি ক'রে চেঁচাতে লাগলুম আর সহিস-কোচুয়ানদের চাঁট ছুঁড়তে আরম্ভ ক'রে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে চাবুকও চলতে লাগল শপাশপ।

ঠিক এমনই সময়ে ওপর থেকে তিন-চারজন বড় মেয়ের সঙ্গে আমাদের আহ্লাদী নেমে এল।

তারা আমাদের বললে, ওপরে চল।

বাস্! আগুনে যেন জল পড়ল। কোচুয়ান দুজন তখুনি রাশ ছেড়ে দিলে, সহিসদের মুখ কাঁচুমাচু। আমাদের দুজনের অর্থাৎ ঘোড়াদের বুকও দুড়দুড় করতে আরম্ভ ক'রে দিলে; কিন্তু তা প্রকাশ হয়ে পড়লে ঘোড়ার ইজ্জৎ থাকে না, তাই আমরা চি হি-চিঁ হি করতে করতে মাটিতে শুয়ে পড়লুম। মেয়েরা আমাদের চ্যাংদোলা ক'রে তুলে ওপরে নিয়ে গেল।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সহিস-কোচুয়ানে মিলিয়ে প্রায় পনরো-ষোলটি ছেলে-আসামী ওপরে উঠে এল। মকদ্দমার ফলাফল দেখতে .ইস্কুল-শুদ্ধ মেয়েও এল তাদের পেছনে পেছনে। আমাদের তো সেই অবস্থায় এনে ঘরের মেঝেয় শুইয়ে দেওয়া হ'ল, আমরা শুয়ে শুয়েই হাত-পা ছুঁড়তে লাগলুম।

হঠাৎ ঘরের একদিককার পর্দা সরিয়ে তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে একটি মহিলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ওরে বাপ রে! সেই মূর্তি চোখে পডামাত্র আমাদের শিশুতা নিমেষের মধ্যে অপসারিত হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে যিনি এলেন, পূর্বে তাঁকে কখনও দেখি নি। মাথার ওপরেই অর্থাৎ ইস্কুলের দোতলায় এমন ভয়ানক একটি জিনিস কি ক'রে আত্মগোপন ক'রে ছিল, তাই ভাবতে লাগলুম। টকটকে গৌর তাঁর বর্ণ, তার ওপর ঈষৎ লালচে আভা। নাক চোখ ও মুখাবয়ব প্রায় পুরুষ গ্রীকমূর্তির মতন, কিন্তু দেহ, বিশেষ ক'রে উদরের ব্যাস, বিপুল। মুখভাব এমন কঠিন যে, শিশু তো দূরের কথা, শিশুর বাপও তা দেখলে বিচলিত হয়ে পড়বে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে একবার চারিদিকে চেয়ে তিনি ভূশয্যাশায়ী ঘোটকদ্বয়কে ধমক দিয়ে বললেন, উঠে দাঁড়াও।

আজ্ঞা পাওয়ামাত্র কাঁপতে কাঁপতে আমরা উঠে দাঁড়ালুম। তারপর যারা আমাদের পেছনে পেছনে তামাশা দেখতে এসেছিল, সেই সব মেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা যাও।

মেয়েরা চ'লে গেল। তারপরে এক এক ক'রে সমস্ত সহিস-কোচুয়ানদের জবানবন্দী নিয়ে শুধু দুটি কোচুয়ান ও ঘোড়া দুজনকে রেখে তিনি সবাইকে বেকসুর মুক্তি দিলেন। সকলে চ'লে যাওয়ার পর আমাদের বললেন, ওইখানে গিয়ে 'নীল ডাউন' (Kneel down) হও।

কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় কাটবার পর আমার ডাক পড়ল, এদিকে এস।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার একখানা হাতে জোরে নাড়া দিয়ে বললেন, সেদিন তেতলার ছাত থেকে প'ড়ে আক্কেল হয় নি তোমার? এখনও এই রকম দুরন্তপনা চলেছে? লজ্জা নেই? দাঁড়াও, তোমার মাকে সব ব'লে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর আবার একবার জোরে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলি?

আমরা ঘোড়া-ঘোড়া খেলছিলুম।

ঘোড়া-ঘোড়া খেলছিলি তো ওকে ধাক্কা মারলি কেন?

ঘোড়া ক্ষেপে গিয়েছিল যে।

আমার উত্তর শুনে তাঁর সেই কঠোর মুখখানার ওপর দিয়ে বোধ হয় এক মুহূর্তের জন্য ছোট্ট একটু হাসির ঝলক খেলে গেল; কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে বললেন, মানুষ-ঘোড়া ক্ষেপে যদি জানোয়ার-ঘোড়ার মতন ব্যবহার করে, তা হ'লে মানুষে আর জানোয়ারে তফাত রইল কোন্‌খানে রে বোকা? তুই কি জানোয়ার-ঘোড়ার মতন ঘাস খাস?

এ কথার কোনও জবাব নেই।

চুপ ক'রে থাকতে দেখে তিনি বললেন, যাও, এমন কাজ আর কখনও ক'রো না।

বেঁচে গেলুম।

কোচুয়ানদ্বয়কে ডেকে বললেন, খবরদার! আর যদি কখনও দেখি

এমন ক'রে কারুকে চাবুক মেরেছ, তা হ'লে ওই রকম চাবুক তোমাদের পিঠেও পড়বে। বুঝলে ?

এ সব কথা কি আর বুঝতে দেরি হয় !

সবাই মুক্তি পেয়ে গেলুম, কিন্তু ঘোড়ার নেশাটা জন্মের মত ছুটে গেল।

এই মহীয়সী মহিলার নাম ছিল লাবণ্যপ্রভা বসু, ইনি সাহিত্য-সেবাও করতেন, ইনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহোদরা।

কিছু বড় হবার পর আমরা এঁর কাছে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলুম। নিজের দেশ, দেশাচার এবং ধর্মের প্রতি যে অসাধারণ অনুরাগ এঁর দেখেছি, তা আজও বিরল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বেদ ও উপনিষদের এক-একটি কাহিনী বর্ণনা করতে করতে তাঁর মুখ লাল টক-টকে হয়ে উঠত, অমন কঠিন চক্ষু জলে ভ'রে আসত। ধনী, দরিদ্র, বয়সে বড় অথবা ছোট, ছেলে কিংবা মেয়ে, কোনও রকম পক্ষপাতিত্বের ধার তিনি ধারতেন না। কোনও রকম স্থাকামি অথবা নীচতা তিনি সহ্য করতেন না। তাঁর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এক ঘণ্টার জন্যে এলেও জীবনে তাঁকে ভুলতে পারা অসম্ভব হ'ত। তখনকার দিনের তুলনায় তিনি উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন, কিন্তু কোন রকমের গর্ব বা বিলাসিতা তাঁর দেখি নি। বাইরে থেকে দেখতে কঠিন হ'লেও অন্তর তাঁর মমতায় পূর্ণ ছিল। তাঁর কাছ থেকে অনেক কঠিন শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু তার মধ্যে নীচতার লেশমাত্রও থাকত না। আমাদের মনে দেশাত্মবোধের প্রেরণা ইনিই প্রথমে জাগিয়ে তুলেছিলেন। বাল্যজীবনে যত লোকের সংস্রবে এসেছি, তার মধ্যে এঁর মূর্তিই সবার চেয়ে উজ্জলরূপে আমার মনের মধ্যে ঝকঝক করছে।

বহুদিন আগে এঁর মৃত্যু হয়েছে।

একদিন বিকেলে আপিস থেকে ফেরার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরও বাবা এলেন না দেখে মা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। আমাদের খেলা-টেলা বন্ধ হয়ে গেল। মুখ কাঁচুমাচু ক'রে মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগলুম। মা বলতে লাগলেন, দেখ, আবার কি কাণ্ড ক'রে আসেন! আমার বাপু ভাল লাগছে না।

একটা কিছু হাঙ্গামার সম্ভাবনায় মনের মধ্যে আনন্দও যে হচ্ছিল না, তা নয়। কারণ সন্ধ্যেবেলায় কিছু ঘটলে আর পড়তে বসতে হবে না। এমনই সময়ে ঠিক ভর-সন্ধ্যেবেলা কয়েকজন লোক ধরাধরি ক'রে বাবাকে দোতলায় নিয়ে এল। বাবা তখন অর্ধমূর্ছিত, সামান্য জ্ঞান আছে। দোতলার চওড়া বারান্দায় বিছানা ক'রে তখুনি তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হ'ল। বাবা বুকের দিকে হাত দেখিয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

আমরা এতখানি কল্পনা করি নি। মার চেঁচামেচি শুনে আমরাও কাঁদতে লাগলুম। দাদা গিয়ে পিসীমাকে ডেকে নিয়ে এল। তাঁর ছেলেরা এসে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এল। বাবার কয়েকজন বন্ধুর কাছে খবর পাঠানো হ'ল। দেখতে দেখতে আট-দশজন স্ত্রী-পুরুষ বাড়িতে এসে হাজির হলেন। কিছুক্ষণ পরিচর্যার ফলে বাবার জ্ঞান ফিরে এল।

বাবাকে যাঁরা ধ'রে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর দুজন আপিসের বন্ধু। তাঁদের মুখে জানতে পারা গেল যে, রাস্তায় এক জুড়িঘোড়া ক্ষেপে দৌড় মেরেছিল, সামনে একটি ছোট ছেলে প'ড়ে যায় যায়, এমন সময় উনি ফুটপাথ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে বুকে ঘোড়ার বোম লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। কোচুয়ানটা খুব সামলে নিয়েছিল, নইলে আর ওঁর কিছু থাকত না।

ওরই মধ্যে বাবা মিনমিন ক'রে বলতে লাগলেন, ছেলেটাও খুব বেঁচে গেছে, তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে কি ?

এই কাহিনী শুনেই মা একেবারে জ্ব'লে উঠলেন। তিনি একাধারে বাবাকে গালাগাল, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার, বাবার পরিচর্যা ও সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাগতদের আপ্যায়ন—আশ্চর্যভাবে এতগুলি কর্তব্য সামলাতে লাগলেন। একটু নমুনা দিই।—বাবা শুয়ে আছেন চিত হয়ে, ডাক্তার বুকে পট্টি বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন। মা মাথায় বরফ দিচ্ছেন আর অনর্গল ব'কে যাচ্ছেন,—আমার যেমন কপাল! এই সেদিন এমন হাঙ্গামা বাধালেন যে, আমাদের প্রাণটুকু শুধু আছে, আর সবই গিয়েছে। এখনও পাঁচ বছর যায় নি—আপনি তো জানেন দিদি! স্টীমার থেকে একজন জলে প'ড়ে গেল, উনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন; তারপরে প্রোপেলারের ধাক্কা লেগে—ছ মাস ধ'রে যমে-মানুষে টানাটানি। হে ভগবান! আমাকে নিয়ে যাও, শুধু ছেলেগুলোকে তুমি দেখো—

হঠাৎ তিনি মাটিতে ঠকাঠক মাথা কুটতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

তিন-চারজন মহিলা 'হাঁ হাঁ, করেন কি' বলতে বলতে ছুটে এসে তাঁকে নিরস্ত করলেন।

ইত্যবসরে বাবা আবার মিনমিন ক'রে কি বললেন। মা মুখ নীচু ক'রে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলছ? অ্যাঁ? জল দোব? একটু বরফ দিয়ে দিই, গলাটা তো কাঠ হয়ে উঠেছে।

মা উঠে কুঁজোর দিকে যেতে যেতে একজনকে দেখে বললেন, ধারুর মা, দাঁড়িয়ে কেন ভাই?

আমি সামনে দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমাকে বললেন, যাও না, একটা মাদুর নিয়ে এসে মাসীমাকে বসতে দাও না, পোড়ারমুখো, হাঁ ক'রে দেখছ কি—

তারপর সবার দিকে ফিরে বললেন—

আবাগীর তিনটি পুত
দুটি কন্দকাটা একটি ভূত।

সভাস্থ সকলের মৃদু হাস্য। উচ্চহাস্য আমাদের সমাজের মহিলাদের মধ্যে তখন প্রচলিত ছিল না। তাঁদের সামনে অনেক পুরুষও উচ্চহাস্য করতেন না।

মার মুখের বিরাম নেই। জল গড়াতে গড়াতে সমানে ব'কে চললেন। বাবার জল খাওয়ার পর গেলাসটা রেখে মা একটু চুপ করতেই একজন প্রস্তাব করলেন, অস্থিরের মা, আসুন, আমরা ঈশ্বরের নাম করি। আপনিই প্রার্থনা করুন।

প্রস্তাব হতে না হতে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে বসলেন। একটি মহিলা গান গাইলেন। সঙ্গীতান্তে মা প্রার্থনা করলেন।

মার প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরের স্তুতিস্তব প্রায় থাকতই না। তিনি অত ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়ে সোজা ব্যবহারিক প্রার্থনা করতেন। অর্থাৎ—হে ভগবান্! তুমি আমাদের দারিদ্র্য মোচন কর। আমার ছেলেদের স্বাস্থ্যবান কর, তাদের বিদ্যা দাও—তারা যেন সুখে থাকে। আর এসব যদি কিছুই না দাও, তবে দোহাই তোমার, আমার স্বামীকে সুমতি দাও।

এই সময়, বোধ হয় ১৮৯৭ খ্রীষ্টান শতাব্দীতে টালার দাঙ্গা বেধেছিল। দাঙ্গার কারণ তখন যা শোনা গিয়েছিল, তার বিবরণ হচ্ছে—টালায় মহারাজা সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এক জমিতে মসজিদ ছিল। সেই মসজিদ তুলে দেওয়া নিয়ে জমিদার আর মুসলমানদের মধ্যে হাঙ্গামা বাধে। মুসলমানদের ধারণা যে, পুলিস জমিদারকে সাহায্য করেছিল।

আজকাল যেমন টালা টালীগঞ্জ সবই কলকাতার হুদ্দোর মধ্যে এসে গিয়েছে, তখন তা ছিল না। টালা ছিল শহরের বাইরে। তাই নিজ-কলকাতাবাসীরা প্রথমটা জানতেই পারে নি যে, সেখানে একটা হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। আসল মারপিট হয়ে যাবার পর শহরবাসীরা জানতে পারলে যে, টালায় একটা বড় রকমের কিছু হয়ে গিয়েছে।

মসজিদ ভেঙে দেওয়ার সহায়তা করার জন্য মুসলমানেরা সরকারের ওপর চ'টে গেল। গবর্মেণ্ট বলতে তারা বুঝলে পুলিস। আর পুলিস মানে রাস্তার কন্‌স্টেব্‌ল।

একদিন সকালবেলা দেখলুম, দলে দলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান লাঠি হাতে নিয়ে শহরের উত্তর দিকে ছুটেছে। কন্‌স্টেব্‌লগুলো তাদের দেখলেই ভয়ে লুকিয়ে পড়ছে। গুজব-সম্রাটের রাজত্ব চিরদিনই অপ্রতিহত। তখনও যেমন ছিল, আজও তেমনই। আমরা অদ্ভুত ও অসম্ভব সব গুজব বাড়িতে ব'সেই শুনতে লাগলুম। দাদা ইস্কুল থেকে নানা রকমের গুজব সংগ্রহ ক'রে আনতে লাগল। নতুন একটা উত্তেজনা আসায় বেশ স্ফূর্তিতেই দিন কাটতে লাগল।

সে সময় দাঙ্গা বাধলে মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালী হিন্দুদের কোনও সংঘর্ষই হ'ত না। দাঙ্গা সম্বন্ধে বাঙালীরা থাকত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। হিন্দু বলতে মুসলমানেরা ভিন্নপ্রদেশীয় হিন্দুদের বুঝত। অন্তত সেদিন পর্যন্তও অর্থাৎ ১৯২৬।২৭ অব্দে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে যে বড় দাঙ্গা বেধেছিল, তার আগের দাঙ্গা পর্যন্ত কলকাতাতে এই ধারাই প্রচলিত ছিল।

একদিন সকালবেলা আমাদের রাস্তায় চাঞ্চল্য ও চেঁচামেচি যেন বেশি হতে লাগল। বেলা তখন প্রায় নটা হবে—খুব একটা হৈ-হৈ শব্দ শুনে আমরা বারান্দায় গিয়ে দেখি, একদল ফিরিঙ্গী যুবক একটা ভাড়াটে ফিটনে চ'ড়ে ছুটছে—ঘোড়া ছুটো উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে, আর

ফিটনের পেছনে বোধ হয় জন পঞ্চাশেক লোক হৈ-হৈ করতে করতে ছুটে আসছে। গাড়ি চালাচ্ছিলও একজন ফিরিঙ্গী। আমাদের বাড়িটা ছাড়িয়ে একটু দূরে গিয়েই তারা গাড়িখানাকে থামিয়ে ফেললে। পেছনে যারা ছুটে আসছিল, তারা একটু দূরে প'ড়ে গিয়েছিল। গাড়ি-খানা হঠাৎ থেমে যেতেই তারা কাছে এসে গেল। গাড়ির ফিরিঙ্গীরা প্রায় সকলেই দাঁড়িয়ে ছিল। দেখলুম, তাদের মধ্যে একজন বন্দুক তুলে দুমদুম দুটো আওয়াজ করলে। তখুনি সবাই চেঁচিয়ে উঠল। বেশ বুঝতে পারা গেল, একজন প'ড়ে গিয়েছে ও তাকে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফিরিঙ্গীরা সেই অবসরে জোরে গাড়ি চালিয়ে সোজা চ'লে গেল।

যে প'ড়ে গিয়েছিল, সবাই মিলে তাকে তুলে, আমাদের বাড়ির সামনেই রাস্তায় জল দেবার একটা দমকল ছিল, সেখানে এনে শুইয়ে দিলে। আমরা ওপর থেকে দেখতে লাগলুম, জায়গাটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু দেহের কোন্‌খান দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, তা বুঝতে পারলুম না।

যাকে এনে শুইয়ে দেওয়া হ'ল, তার বয়স বোধ হয় ষোল-সতরো হবে। রোগা—অত্যন্ত রোগা, ডান হাতে একটা শুকনো গাছের ডাল-গোছের কি তখনও ধরা রয়েছে।

সে একবার হাঁ করতেই তার মুখের মধ্যে দমকল থেকে সেই ময়লা জল আঁজলা ক'রে ক'রে দেওয়া হতে লাগল। একটুক্ষণ পরেই সবাই বলতে লাগল, মর্ গিয়া—মর্ গিয়া—

লোকেরা তাকে তুলে নিয়ে চ'লে গেল। তোলবার সময় দেখলুম, সেই ভাঙা ডালখানা তার হাত থেকে খ'সে রাস্তায় প'ড়ে গেল।

এই মৃত্যুকে দেখলুম, একেবারে চোখোচোখি—মুখোমুখি! এই মৃত্যু দুবার আমার অতি নিকটে এসেছিল, তখন তাকে চিনতে পারি নি।

এই দৃশ্য আমার সত্তাকে নাড়া দিয়ে এমন ভাবে বিচলিত ক'রে দিলে যে, আমি সেই জায়গা থেকে এক পাও নড়তে পারলুম না। মৃত

ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে চ'লে গেছে, কিন্তু তার হস্তচ্যুত সেই দণ্ড, যা দিয়ে তার গর্বোদ্ধত ধর্মবুদ্ধি অপরকে আঘাত করতে এসেছিল—সেটা যেন একখণ্ড চুম্বক। তারই আকর্ষণে অনড় হয়ে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার পাশে অস্থিরও দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, তার মুখখানা তুবড়ে-তাবড়ে অদ্ভুত এক রকমের দেখতে হয়েছে। অন্য সময় সে রকম মূর্তি দেখলে হয়তো হেসে ফেলতুম। কিন্তু তখন আর হাসি ফুটল না। আবার রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হ'ল।

মা এসে একবার ব'লে গেলেন, আজ কি আর নাইতে খেতে ইস্কুলে যেতে হবে না ?

অস্থিরও সে বছর ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল। দুই ভাই নীরবে স্নান ক'রে খেয়ে ইস্কুলে যাত্রা করলুম। বাড়ির পাশেই ইস্কুল, তবুও একবার কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সেই মৃত ব্যক্তির হস্তচ্যুত লাঠিটার কাছে গেলুম। দেখলুম, অজস্র গাড়ির চাপে চাপে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে সেটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। দুজনে পাশাপাশি ইস্কুলে ঢুকে যে যার ক্লাসে চ'লে গেলুম। একটা বাক্য-বিনিময়ও হ'ল না।

ইস্কুলে পড়াশুনো কতদূর কি হ'ল জানি না ; কিন্তু সমস্ত দিনটা ধ'রে সেই মৃত লোকটির মুখ চোখের সামনে ভাসতে লাগল। সমস্তক্ষণ মৃত্যুর চিন্তাই আমার মনকে আঁকড়ে ধ'রে রইল। মনে হতে লাগল, ম'রে গেলে আর সে ফিরে আসে না। আরও মনে হ'ল, মরণ যে কখন কি ভাবে আসে, তা আগে কেউ বুঝতে পারে না। 'এই যে লোকটা, সে কি জানতে পেরেছিল যে, এক্ষুনি ম'রে যাবে! তার মুখখানা চোখের সামনে মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে লাগল, আর ভাবতে লাগলুম, আজ কাল পরশু এমনই ক'রে যত দিন যাবে, তার বাবা মা আপনার জন যারা, তারা ওকে ভুলে যাবে।—এই সব নানা চিন্তা মনের মধ্যে তাল পাকাচ্ছে

আরম্ভ করলে। ইস্কুল, শিক্ষয়িত্রী, পড়া, খেলা কিছুই ভাল লাগছিল না, লোকের সঙ্গ অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল, মনে হতে লাগল, কতক্ষণে নিজেকে একটু একলা পাব—প্রাণ ভ'রে মৃত্যুর কথা ভাবতে পারব!

ছুটির পর বাড়িতে এসে খেয়ে-দেয়ে ছাতে গিয়ে বসলুম। অস্থিরও এসে আমার পাশে বসল। সন্ধ্যেবেলা পড়ার আসরে বাবার শাসনগুলো বৃথাই গেল। রাত্রে তাড়াতাড়ি বিছানায় প'ড়ে মনের বল্গা ছেড়ে দিলুম।

বালকের চিন্তাসাগর মথিত হয়ে সেদিন কি সত্য উঠেছিল, তার সব আজ মনে নেই, তবে তিনটি কথা আজও ভুলি নি।

প্রথম সত্য হচ্ছে, একদিন আমাকেও মরতে হবে।

দ্বিতীয় সত্য, ছাত থেকে প'ড়ে আর জলে ডুবে আমি মরতে মরতে বেঁচে গেছি।

তৃতীয় সত্য হচ্ছে, মন্দির ও বাড়িতে উপাসনার সময় চোখ বুজে যাকে এত স্তুতি করা হয়, তার সঙ্গে মৃত্যুর কোথাও একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। পৃথিবীতে মৃত্যু যদি না থাকত, তা হ'লে সেই দুর্বোধ্য অদৃশ্য শক্তিকে লোকে এত স্তবস্তুতি করত না।

রাত্রি প্রায় দুটো-তিনটের সময় রোজই আমাদের বাইরে যাবার দরকার হ'ত। যার আগে ঘুম ভাঙত, সে অন্য জনকে জাগিয়ে তুলে নিয়ে যেত। সে রাত্রে আমারই আগে ঘুম ভেঙেছিল। অস্থিরকে তুলে বাইরে নিয়ে গেলুম। নর্দমার সামনে ব'সেই অস্থির ফিসফিস ক'রে আমাকে ডাকলে, স্থবির!

ফিসফিস ক'রে উত্তর দিলুম, কি রে?

আবার সে ফিসফিস ক'রে প্রশ্ন করলে, তুই ম'রে গিয়ে কি ক'রে ফিরে এলি রে?

আমিও সেই রকম ক'রে জবাব দিলুম, আমি তো মরি নি; জলে ডুবে বেঁচে গিয়েছি।

এই সময় কলকাতায় বড় ভূমিকম্প হয়। কলকাতায় অনেক লোক, অনেক বাড়ি, এইজন্যে হৈ-চৈ এখানে খুব বেশি হয়েছিল বটে, কিন্তু ধরিত্রীদোলার বিষম ধাক্কাটা লেগেছিল আমাদের বুকে। ভূমিকম্পের ফলে সেখানে নাকি অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্তনও হয়ে গিয়েছিল। শোনা গিয়েছিল যে, ব্রহ্মপুত্রের স্রোত এক জায়গায় ঘুরে অন্য দিকে প্রবাহিত হয়েছিল।

কলকাতায় ভূমিকম্প হয় এই বিকেল নাগাদ। আমরা ক ভাই সে সময় একটা টেবিলের চারিদিকে ব'সে ছিলুম, বোধ হয় বাবা আমাদের অঙ্ক কষাচ্ছিলেন। হঠাৎ দুদ্দাড ক'রে বাড়িঘর কেঁপে উঠতেই মা চীৎকার ক'রে উঠলেন, ভূমিকম্প হচ্ছে।

তাডাতাড়ি ছুটে সব রাস্তায় বেরিয়ে পডা গেল। পৃথিবী যেন টলতে আরম্ভ ক'রে দিলে, তারই মাঝে মাঝে এক-একটা জোর ধাক্কা আসতে লাগল। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! রাস্তার লোকগুলো উন্মত্তের মতন ব্যবহার করতে লাগল। কেউ প্রাণপণে দৌড়চ্ছে, কেউ বা একবার এক দিকে খানিকটা দৌড়ে আবার হঠাৎ ফিরে বিপরীত দিকে দৌড দিচ্ছে। অদ্ভুত তাদের ভয়ার্ত মুখ দেখে আমরা তিন ভাই হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

আমাদের বাড়ির ঠিক নীচেই একটা টিন-মিস্ত্রীর দোকান ছিল। সে টিনের পাত কেটে বাক্স বানাত। মধ্যে মধ্যে লোকটা মাতাল হয়ে সারা রাস্তা তোলপাড় করতে থাকত। অতি শৈশবে আমরা কখনও উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে সে তার প্রকাণ্ড টিন-কাটা কাঁচি বের ক'রে আমাদের অঙ্গচ্ছেদের ভয় দেখাত। এইজন্যে সে বয়েস পেরিয়ে গেলেও লোকটার প্রতি আমাদের মনোভাব বিশেষ অনুকূল ছিল না।

পাড়ার সবাই যখন ভয়ে আঁতকে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' চীৎকার ক'রে আকাশ ফাটাতে লাগল, এই লোকটা তখন চীৎকার ক'রে বলতে লাগল, এলি মা, এত দিনে এলি? ডুবিয়ে দে, ডুবিয়ে দে, সব শালা ভণ্ড, লণ্ডভণ্ড ক'রে দে মা, লণ্ডভণ্ড ক'রে দে।

পাড়ার এক হিন্দুস্থানী ময়রার দোকানের লোকেরা 'রাম' 'রাম' ব'লে পরিত্রাহি চীৎকার করছিল। তাদের অবস্থা দেখে টিন-মিস্ত্রী বললে, চোপ শালা, যখন ঘিয়ের বদলে চর্বি দাও, তখন মনে থাকে না?

শাঁখ, ঘণ্টা, মানুষের চীৎকার ও টিন-মিস্ত্রীর উল্লাসধ্বনি মিলিয়ে এক বিষম হট্টগোল আরম্ভ হয়ে গেল। হঠাৎ ইস্কুলের বড় বাড়িটার একটা কোণ—তেতলার ছাদ থেকে একতলা অবধি—ভয়ানক শব্দ ক'রে ভেঙে পড়ল। এইবার দস্তুরমতন ভড়কে গেলুম, একটা সাংঘাতিক কিছু যে হচ্ছে, আর সেটাকে নিবারণ করা যে মানুষের সাধ্যাতীত—এই কথা বুঝতে পেরে ভয় করতে লাগল।

ভূমিকম্প থেমে যাওয়ার পর আমরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি যে, আমাদের বাড়িখানা ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে গেছে। বাবা তখুনি আমাদের নিয়ে বেরুলেন শহরের অবস্থা দেখতে। যে রাস্তাতেই যাই, দেখি, একটা না একটা বাড়ি কতি হয়েছে। সেবারকার ভূমিকম্পে কলকাতা, শহরতলীর ও আশপাশের জায়গার কত লোকের যে সর্বনাশ হয়েছিল, তার আর ইয়ত্তা নেই।

টালার দাঙ্গা ও ভূমিকম্প হবার কিছু আগে থেকেই আমরা শুনতে পাচ্ছিলুম, বোম্বাই অঞ্চলে প্লেগ নামে এক সাংঘাতিক ব্যামোর আবির্ভাব হয়েছে। সেখান থেকে রোগটা বনবন ক'রে কলকাতার দিকে দৌড়ে আসছে। কলকাতায় মহা আতঙ্কের সঞ্চার হল।

ইতিমধ্যে একদিন শোনা গেল যে, হাওড়ায় একটি স্ত্রীলোক বোম্বাই মেলে এসে হাওড়া স্টেশনে একখানা ঠিকে-গাড়ি ভাড়া ক'রে কলকাতার দিকে আসছিল। হ্যারিসন রোডে এসে গাড়োয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবে?

স্ত্রীলোকটা উত্তর দিলে, আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি প্লেগদেবী। এই ব'লেই সে গায়েব হয়ে গেল।

বাস্! আর যাবে কোথায়! শহরময় রব উঠল—পেলে গো—পালা গো। গুজববিলাসী বাঙালী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। বাপ রে বাপ! সে কি ত্রাসের ঘটা!

আজ এই যুদ্ধের ডামাডোলের বাজারে কানের পাশে বোমা ফাটছে, দিবারাত্রি মাথার ওপরে পিংপিং ক'রে বিমান উড়ছে দেখেও বাঙালীরা তা গ্রাহ্যই করছে না, সেদিন কিন্তু প্লেগের নাম শুনে শহরসুদ্ধ লোক উঠি কি পড়ি ভাবে পালাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে একদিন শোনা গেল, শহরে প্লেগ হতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। কর্পোরেশন থেকে ঢেঁড়া পিটতে আরম্ভ ক'রে দিলে—বোম্বাইসে আদমী আনেসে থানামে খবর দেনে হোগা।

আর যায় কোথা! দুদিনে কলকাতা শহর খালি হয়ে গেল। নেহাৎ আমাদের মতন, অর্থাৎ যাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই, তারাই প'ড়ে রইল। ইষ্টিশানে পৌছবার জন্যে ঠিকে-গাড়ির গাড়োয়ানেরা অসম্ভব দর হাঁকতে লাগল। তখনকার দিনে অশ্বের শক্তিক্ষয় নিয়ন্ত্রণের আইনকানুন ছিল না, তাই যার মাত্র একখানা ভাড়াটে গাড়িও ছিল, সে বেশ দু-পয়সা কামাতে লাগল।

কর্পোরেশন শহরবাসীদের প্লেগের টিকে নেবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু টিকে সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে এমন সব

সাংঘাতিক গুজব রটতে লাগল যে, এ যুগের লোক তা শুনলে হেসেই ফেলবে।

কেউ বললে, টিকে নেবার দশ ঘণ্টার মধ্যেই মানুষ কাবার হয়ে যায়।

কেউ বললে, পেট থেকে এক পয়সা মাপের মাংসের বড়া তুলে নিয়ে তার ভেতর প্লেগের বীজ পুরে দেওয়া হয়।

এদিকে আবার স্বাস্থ্যরক্ষকেরা জানিয়ে দিলেন যে, টিকে নেয় নি, এমন কোনও ব্যক্তি প্লেগে আক্রান্ত হ'লে তাকে জোর ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। প্লেগের হাসপাতাল তৈরি হ'ল আবার মেছোবাজারের মার্কাস স্কোয়ারে। সোনায় সোহাগা হ'ল—শহরের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল, আর একটা দাঙ্গা বাধে আর কি!

ইতিমধ্যে একদিন বিকেলবেলা আমি, অস্থির ও দাদা ফুক ক'রে একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দূর থেকে মেছোবাজারের হাসপাতাল দেখে এলুম।

তখন শহরের স্বাস্থ্যরক্ষকদেব মাথা ছিলেন একজন ইংরেজ আধা-ডাক্তার। তাঁর নাম ছিল কুক। শোনা যেতে লাগল যে, কুক সায়েবকে রাস্তায় পেলে লোকে মারবে।

শহরের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উত্তেজনা আর অন্য শ্রেণীর মধ্যে ত্রাস—এই রকম তালবেতালের নাগরদোলা ঘুরছে, এমন সময় কর্পোরেশনের কর্তারা একটি প্যাঁচ লাগালেন। তাঁরা দেখলেন যে, ভদ্রলোকেরা যদি টিকে না নেয়, তা হ'লে প্লেগের টিকের চলন হওয়া মুশকিল হবে। তাঁরা ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে সাহস ক'রে টিকে নিতে পারে, এমন লোকের

সন্ধান করতে লাগলেন। ব্রাহ্মরা ছিল তখন সব কাজে অগ্রণী—ভারত মহাসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্ম সপরিবারে টিকে নিতে রাজী হলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমার পিতার পরিবারটিও এই দলে ভেড়ায়, একদিন বিকেলবেলায় কুক সাহেব আমাদের হাত ফুঁড়ে প্লেগের বীজ দেহের মধ্যে পুরে দিলেন। বাবা আমাদের দু-বছরের একটি ভগ্নীকেও নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তারদের মতে সে নেহাৎ বাচ্চা সাব্যস্ত হওয়ায় সে বেচারী রেহাই পেয়ে গেল।

টিকে নেওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এল জ্বর। তারপরে চব্বিশ ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, তা জানতেও পারি নি।

মাস দুয়েক বাদে কর্পোরেশন থেকে আমাদের নামে একখানা ক'রে কার্ড এল। সেগুলো হ'ল সার্টিফিকেট, অর্থাৎ প্লেগ হ'লে সেগুলো দেখালে আর 'কোয়ারেণ্টাইনে' ধ'রে নিয়ে যাবে না।

কিন্তু আমাদের এই অসমসাহসিকতার দৃষ্টান্ত শহরের ভদ্রশ্রেণীর মনে কোন রেখাপাতই করলে না। প্লেগের টিকে এ দেশে তেমন চলল না। অবিশ্যি এজন্যে তাদের বিশেষ দোষ দিতে পারি না, কারণ বাংলার জমিতে প্লেগই তেমন চলল না তো তার টিকে চলবে কেমন ক'রে?

সেদিন ছিল বিদ্যাসাগর মশায়ের মৃত্যুদিন। প্রবাদ আছে, এক যুগে দুজন মহাপুরুষ থাকেন না। বোধ হয় সেইজন্যেই আমি ধরাধামকে ধন্য করার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর মশায় ইহলোক থেকে চ'লে গিয়েছিলেন।

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যে মহামানবের কীর্তিকথা আমাদের কল্পনাপ্রবণ শিশুচিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল, তাঁর নাম হচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাড়িতে মা-বাবার মুখে দিনরাতই বিদ্যাসাগর মশায়ের নাম শুনতুম। ইস্কুলে মাস্টারদের কাছে শুনতুম—বিদ্যাসাগর মশায় এই করতেন। বাড়িতে বাবা ও তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কথার মাত্রা ছিল—বিদ্যাসাগর মশায় বলতেন, ইত্যাদি।

এই বিদ্যাসাগর মশায়কে বোধ হয় কলকাতার লোক চেনে না। ইনি মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যে কলকাতায় এসে অশেষ কষ্টে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন। রাজনীতির আলোচনা ও আন্দোলন না ক'রেও তাঁর জীবন ছিল স্বাধীনতার প্রতীক। মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাত্র, কিন্তু কলকাতা ছিল তাঁর কর্মভূমি এবং এইখানেই তাঁর সারাজীবন অতিবাহিত হয়েছে। এরই ধূলায় তাঁর দেহাবশেষ মিশিয়ে আছে। বাংলা দেশের শিক্ষা সাহিত্য ও সমাজ তাঁর কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। তাঁর জীবিতাবস্থায় বাংলা দেশের, বিশেষ ক'রে কলকাতা শহরের, কত লোক কত পরিবার যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাঁর কাছে উপকৃত, তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। মেদিনীপুরের লোকেরা তাঁর স্মৃতিগৃহ তৈরি করেছেন; কিন্তু কলকাতায় তাঁর বাসগৃহ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। তাঁর বাড়ির সামনেই যে সরকারী বাগান, তার নাম হয়েছে 'হৃষিকেশ পার্ক'।

ঈশ্বরের চাইতে হৃষিকেশের প্রতিই এখানকার লোকের আকর্ষণ যে বেশি, এই তার জ্বলন্ত নিদর্শন। তবুও বাংলার সাহিত্যিক, মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ-সমিতি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে ধন্যবাদ, তাঁরা যথাসাধ্য বিদ্যাসাগর মশায়ের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা করেছেন।

যা হোক, সেদিন ছিল এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুদিন। কলকাতার ছোট-বড় সমস্ত বাঙালী-ইস্কুলের ছুটি সেদিন। যেদিন আমাদের ইস্কুলে ছুটি থাকত, সেদিন বাড়িতে আহারের কিছু ইতর-বিশেষ হ'ত। বাবা সেদিন স্পেশাল বাজার করতে বেরুতেন। বাড়ির কাছে সিমলের বাজারে না গিয়ে এই সব দিনে আমাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি যেতেন মাধববাবুর বাজারে। উদ্দেশ্য থাকত, বাজার কি রকম ক'রে করতে হয়, তাই শিক্ষা দেওয়া। গোলদীঘির সামনে আজ যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-ভবন হয়েছে, সেই জমিতে ছিল মাধববাবুর বাজার।

সেদিন বাবার কি খেয়াল হ'ল, আমাদের কারুকে না নিয়ে একাই চ'লে গেলেন মাধববাবুর বাজারে। আমরা বাড়িতে ব'সেই জিভে শান দিতে লাগলুম।

বেলা বাড়তে লাগল,—নটা দশটা। বাড়ির সামনেই বিদ্যাসাগর মশায়ের ইস্কুল-কলেজে লোক-জমা ও চেঁচামেচি বাড়তে লাগল—সেখানে হবে কাঙালী-ভোজন। ওদিকে এগারোটা বেজে গেল, বাবার দেখা নেই। খিদেয় নাড়ী সত্যিকারের বাপান্ত আরম্ভ ক'রে দিলে। অবশেষে মা আমাদের যা-তা দিয়ে খাইয়ে দিলেন।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দু-এক বাড়িতে খবর গেল। দু-চারজন বাড়িতে এসে জমতেও লাগলেন। বেলা দুটো নাগাদ দেখে তিন-চারজন লোক ছুটল তিন-চার থানায়। কেউ কেউ হাসপাতালেও ছুটল।

এদিকে বেলা তখন প্রায় চারটে হবে। বাড়িতে ছোটখাট বেশ একটু জনতা হয়েছে। মা বক্তৃতা দিচ্ছেন। বিষয়বস্তু অবশ্য বাবা। সবাই শুনছেন, এমন সময় বাবার আবির্ভাব।

বাবার সে সময়কার চেহারা একেবারে ভয়াবহ। মাথার চুলগুলো উর্ধ্বমুখী, রোদে পুড়ে পুড়ে রঙ তামাটে। ডান হাতে শিলংমাছের একটা বড় টুকরো। মাটি মাখালে যেমন হাত নোংরা হয়, সেই রকম দুই হাতের প্রায় কনুই অবধি শুকনো কাদা। জামার জায়গায় জায়গায় মাছের রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে।

তাঁর সেই চেহারা দেখে তো সবাই আঁতকে উঠল। এমন কি মা পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেলেন।

প্রকাশ পেল যে, তিনি বাজার ক'রে ফিরছিলেন, এক হাতে বাজারের ঝুলি আর অন্য হাতে সের দেড়ের শিলংমাছের টুকরো, এমন সময়ে হেয়ার সাহেবের ইস্কুলের সামনে একটা চিল কোথা থেকে এসে ছোঁ মেরে তাঁর হাত থেকে মাছ নিয়ে উধাও হ'ল। চিলের আচমকা এই অভদ্র ব্যবহারে প্রথমটা তিনি একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তখুনি কর্তব্য স্থির ক'রে নিয়ে চিলের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। দেড় সের ওজন নিয়ে চিল বেশি দূর উড়তে পারে না। একটু উড়েই কোন ছাতে গিয়ে বসে, আর তিনি ইট ছুঁড়ে তাকে উড়িয়ে দেন। কলকাতা শহর, রাস্তায় বেকার লোকের অভাব নেই। অনেকে মজা পেয়ে লেগে গেল তাঁর সঙ্গে চিলকে ইট মারার কাজে। শ্রাবণ মাসে লোকে বড় জোর শিলাবৃষ্টি আশঙ্কা ক'রে থাকে। বিনা কারণে ছাতে লোষ্ট্রবৃষ্টি হতে থাকায় অনেক বাড়িওয়ালা আপত্তি করায় দু-একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধতে বাধতে থেমে গিয়েছে। কারণ চিলকে দৃষ্টির বাইরে না যেতে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। এই রকম অভ্যাস খেতে

খেতে চিলের-পো শেষকালে তিলজলার মাঠে মাছ ফেলে দিয়ে পালিয়ে বাঁচে।

একটা জোর নিশ্বাস ফেলে জামা ছাড়তে ছাড়তে বাবা বললেন, ব্যাটা আমার হাত থেকে মাছ ছোঁ মেরে নিতে এসেছিল! বাঙালকে চেনে না!

চিলের ঔদ্ধত্য দেখে তার প্রতি সম্মানে আমাদের বুক ভ'রে উঠতে লাগল।

এতক্ষণে মা কথা বললেন, বাজারের থলিটা কোন্ মাঠে ফেলে আসা হ'ল, শুনি?

এই-ই-ই-ই!—ব'লে বাবা আবার তাড়াতাড়ি জামা পরতে আরম্ভ করলেন। আগন্তুক যাঁরা বাড়িতে তখনও ছিলেন, তাঁরা বাবাকে ব'লে-ক'য়ে তখনকার মতন নিরস্ত করলেন।

জানতে পারা গেল, তালতলায় একজনদের রকে পরিপূর্ণ বাজারের থলিটি প'ড়ে আছে।

এতক্ষণ বাদে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

মা বললেন, না, তোমার জন্যে সব ব'সে আছে।

তা হ'লে মাছটার যা হোক একটা ব্যবস্থা কর।

ও-মাছের আবার কি ব্যবস্থা হবে শুনি? ওই চিলে-খাওয়া মাছ! দেখুন তো দিদি!

পিসীমা কাছেই ব'সে ছিলেন।

বাবা একবার করুণ চোখে চারিদিকে চেয়ে মাছ নিয়ে একতলায় নেমে গেলেন। তারপরে উনুনে আগুন দিয়ে মাছ ধুতে বসলেন। উনুনে আগুন ধরার পর ভাত চড়িয়ে মাছ কুটতে লাগলেন। প্যাজ

কুটলেন একরাশ। মসলাও কিছু কিছু বাটা হ'ল। ভাঁত নামিয়ে মাছের দু-তিন রকমের তরকারি হ'ল। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্ষুধার আধিক্যও কিঞ্চিৎ হয়েছিল। স্নান সেরে এক হাঁড়ি ভাত ও সেই দেড় সেরটাক চিলে-মারা মাছ উদরস্থ ক'রে ওপরে এসে আপিসে ছুটির দরখাস্ত ক'রে একখানা পোস্টকার্ড লিখলেন।

বাবা বারান্দায় একটা পাটি পেতে তাতে আধ-শোওয়া হয়ে রয়েছেন। মা একটা ঘরের চৌকাঠে ব'সে আছেন—সারাদিন তাঁর পেটে অন্ন নেই। স্বামী যে একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে বাড়ি ফেরেন নি, এজন্যে মনে মনে তুষ্ট, কিন্তু মুখখানা ঘিরে মহা অসন্তোষ বিরাজ করছে। পিসীমা মার কাছ থেকে একটু দূরে বাবার প্রায় কাছেই ব'সে আছেন। আমরা ফুড়ুক-ফাড়াক ক'রে সন্তর্পণে এঘর ওঘর করছি। একবার সামনে পড়তেই তিনি বললেন, স্থবির, একটা ঝিনুক নিয়ে এসে আমার পিঠের ঘামাচি মার।

ঝিনুক নিয়ে বাবার পিঠের ঘামাচি মারতে লাগলুম। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। শেষকালে বাবাই কথা আরম্ভ করলেন। পিসীমার উদ্দেশে বললেন, দিদি, কিছু বলছেন না যে?

মা (পিসীমা) যেন এই কথাটা শোনবার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীরপ্রকৃতির লোক। বাবার কথা শুনে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, কি বলব বল ভাই? তোমার আক্কেল দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। চিলে ছোঁ মেরে হাত থেকে মাছ ছিনিয়ে নিয়ে গেল আর তুমি সারাদিন সেই চিলের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ালে? এ যে গল্প-কথা হয়ে গেল! আমি আর কি বলব বল?

বাবা চুপ ক'রে চোখ বুজে ঘামাচি মারার আরাম উপভোগ করতে লাগলেন। পিসীমার কথার কোন জবাবই দিলেন না।

ব্যাপারটার মধ্যে কোন রকম অস্বাভাবিকত্ব বা আতিশয্য আছে ব'লে তিনি ধারণাই করতে পারছিলেন না। সত্যি কথা বলতে কি, এই ব্যাপারটার সঙ্গে বাবার চরিত্রের এমন সামঞ্জস্য ছিল যে, আমাদের মনেও এটা খুব বেখাপ্পা ব্যাপার ব'লে মনে হচ্ছিল না।

কিছুক্ষণ আবার সব চুপচাপ। পিসীমা আরম্ভ করলেন, লোকের উপকারের জন্যে জীবন বিপন্ন কর—যদিও সেটা তোমার করা উচিত নয়, কারণ তোমার মাথার ওপরে এই সংসারের দায়িত্ব রয়েছে—তার একটা মানে বুঝি। কিন্তু এ কি উঞ্ছবৃত্তি!

বাবা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, এতেও লোকের উপকার হবে, আপনি দেখে নেবেন দিদি।

পিসীমা বললেন, এতে লোকের কি উপকার হবে, তা আমি বুঝতে পারি না, অবিশ্যি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি—

বাবা তেড়ে-ফুঁড়ে উঠে ব'সে বললেন, এই চিল কোনও জন্মে মানুষের হাত থেকে আর কিছু ছোঁ মারবে না, এতে লোকের কম উপকার হবে না দিদি।

মা এতক্ষণ চৌকাঠে ব'সে ব'সে গজরাচ্ছিলেন। এবার তিনি এগিয়ে এসে পিসীমার কাছে ব'সে বলতে আরম্ভ করলেন, জানেন দিদি, ইল্লৎ যায় না ম'লে, স্বভাব যায় না ধুলে! এ ওঁর স্বভাব। জানেন দিদি, একবার পদ্মা দিয়ে নৌকো ক'রে যাচ্ছি, ছেলেপুলে তখনও কেউ হয় নি। নৌকো গুণ টেনে চলেছে, নৌকোর ওপর শুধু মাঝি ব'সে আছে হাল ধ'রে। আমি ছইয়ের মধ্যে ব'সে তরকারি কুটছি আর উনি তোলা-উনুনে বাইরে ইলিশমাছ ভাজছেন। একবার পেছন ফিরে দেখি, লোক নেই; দু-একবার ডাকাডাকি ক'রে সাড়া না পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম, চিনি কিনা!

মাঝিকে জিজ্ঞাসা করি, ও মাঝি, বাবু কোথায় ?

মাঝি তো একেবারে থ ! এই জলজ্যান্ত লোকটা কোথায় উধাও হয়ে গেল !

এদিক ওদিক দেখতে দেখতে নজর পড়ল, সেই দূরে জলের মধ্যে উনি একবার ক'রে উঠছেন আর ডুবছেন।

থামা থামা, নৌকো থামা। কিন্তু দাঁড়ীরা তখন গুণ টেনে চলেছে, তারা কি শুনতে পায় ! অনেক কষ্টে মাঝি তাদের থামালে, উনি সাঁতরে এসে নৌকোয় উঠলেন।

ব্যাপার কি ?

শুনলুম, খুন্তিটা কি ক'রে জলে প'ড়ে যাওয়ায় উনি লাফিয়ে পড়েছিলেন।

আচ্ছা, বলুন তো দিদি, সেই খুন্তিটা উদ্ধার ক'রে উনি কোন্ লোকের উপকারটা করলেন ? ও স্বভাব, যার যা স্বভাব !

বাবা চোখ বুজেই বললেন, সেটা ছিল আসামের খুন্তি, দাম তিন পয়সা।

মা রেগে সেখান থেকে উঠে গরগর করতে করতে নীচে নেমে গেলেন।

সেদিনকার হাঙ্গামাটা যদি আর একটু সন্ধ্যে ঘেঁষে হ'ত, তা হ'লে জমত ভাল ; কিন্তু আমাদের বরাতে তা হ'ল না। সন্ধ্যে অবধি একটি ঘুম দিয়ে নবীন উৎসাহে বাবা আমাদের পড়াতে বসলেন। সেদিনকার চাটি-পাঁট্টাগুলোর মধ্যে মাধুর্যরসের পরিমাণ কিছু বেশি ব'লে বোধ হতে লাগল।

আমার বাবা গাইয়ে ছিলেন। শুধু গাইয়ে ছিলেন বললে তাঁর সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। অদ্ভুত ছিল তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা। আমি জীবনে অনেক সঙ্গীতজ্ঞ গায়ক-গায়িকা দেখেছি। তাদের সঙ্গে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর একসঙ্গে বসবাসও করেছি; কিন্তু এক বিষয়ে বাবার মতন গুণী আমার চোখে পড়ে নি। অস্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল তাঁর কণ্ঠের। সন্ধ্যের সময় পড়ার আসরে তাঁর হাঁকডাকের চোটে প্রায় প্রতিদিনই রেড়ির তেলের প্রদীপ অকালে নির্বাপিত হ'ত, এমন কি হ্যারিকেনের আলোও দপদপ করতে থাকত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত যে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' তখন পাওয়া যেত, তখনকার দিনেও তাতে নানা রাগ-রাগিণীর প্রায় পাঁচশো গান থাকত। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তিনি বইখানি নিয়ে ব্রহ্মোপাসনায় বসতেন। উপাসনার আগে একটি এবং পরে একটি গান হয়ে পালা শেষ হ'ত। ব্রহ্মসঙ্গীতের গোড়ার পাতা থেকে ধ'রে প্রতিদিন তিনি নতুন গান গাইতেন। গান নতুন হ'লেও সুর সম্বন্ধে তাঁর অমানুষিক একনিষ্ঠতা ছিল এবং যে কোন গানকে যে কোন সুর ছন্দ ও লয়ের মধ্যে ফেলে ভক্তিভাবে অক্লেশে তাঁকে গেয়ে যেতে দেখেছি। বাবার এই সঙ্গীতপ্রতিভা বংশানুক্রমে তাঁতে বর্তেছিল কি না জানি না, তবে তাঁর বংশধরদের মধ্যে যাতে তাঁর এই শক্তি অপ্রতিহতরূপে সঞ্চারিত হতে পারে, সে সম্বন্ধে তিনি মোটেই অমনোযোগী ছিলেন না। কাজেই আমাদের তিন ভাইকেও বাবার সঙ্গে সেই গানে যোগ দিতে হ'ত। আজ সেই অপূর্ব কণ্ঠ-কন্‌সার্টের কথা মনে হ'লে ভগবানের দয়া ও প্রতিবাসীদের সহ্যশক্তির তারিফ না ক'রে পারি না।

আমাদের ছেলেবেলায় বাড়িতে পরিবারের মধ্যে নিশিদিন উপদেশ শুনতে হ'ত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ,

বিদ্যাসাগর মশায়—এঁদের সমস্ত গুণাবলী যাতে প্রত্যেকেই আমরা আয়ত্ত করতে পারি, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিধিমত কড়া নজর রাখতেন। পাঠ্যপুস্তকগুলি ছিল উপদেশে পরিপূর্ণ। পার্‌ফিল্ড, গ্যারিবল্ডি, থিয়োডোর পার্কার, মার্টিন লুথার, জর্জ ওয়াশিংটন বা নেল্‌সনের মুখ দিয়ে কখন কি বেদবাক্য বেরিয়েছিল, প্রশ্ন করা মাত্র তা উদ্গার করতে না পারলে পরীক্ষা-পাসের সম্ভাবনা ছিল অতি অল্প। এ ছাড়া মাতৃভাষায় যে সব লিরিক্‌স পড়ানো হ'ত, তারও একটু নমুনা দিই—

এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান
সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান।
জীবন ধারণ কিংবা আরাম কারণ
যে যে বস্তু আমাদের হয় প্রয়োজন—ইত্যাদি

এ ছাড়া প্রতি শনিবারে ইস্কুলে এক ঘণ্টা ক'রে 'মর‍্যাল ট্রেনিং' দেওয়া হ'ত।

এই সব ডাহা মিথ্যে কথা ও তার চাইতে সাংঘাতিক অর্ধসত্যের ওপর পালিশ চড়াবার জন্যে প্রতি রবিবারে আর একটি প্রতিষ্ঠানে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়। ব্রাহ্মদের সামাজিক ব্যাপারগুলো, উপাসনা থেকে বিয়ে পর্যন্ত, ছিল ক্রীশ্চান-ঘেঁষা। বোধ হয় ক্রীশ্চানদের' সান্‌ডে ইস্কুলে'র অনুকরণেই এই রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আমাদের সান্‌ডে ইস্কুলটি ছিল একটি 'চালে'র জায়গা। ইস্কুলে যাবার কাপড়চোপড় সম্বন্ধে বাড়িতে তেমন কড়াক্কড় নিয়ম আমাদের কিছু ছিল না বটে, কিন্তু সান্‌ডে ইস্কুলে যাবার কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করতেন মা নিজে। সজ্জার সমারোহ না থাক্, আভিজাত্যটা যাতে পারিপাট্যের দিক দিয়ে কিছু ফুটে ওঠে, তার ত্রুটি হ'ত না। ˜ ৲ামার

কোঁকড়া চুল শুকনো থাকলে টেরি হ'ত না ব'লে রবিবারে ভোরে উঠেই আমাকে স্নান করতে হ'ত চুল নরম করবার জন্যে।

সমাজের অনেক ধনী লোকের ছেলেমেয়ে আসত এখানে নীতি শিক্ষা করতে। তারা এখানে শিখত নীতি, আর তাদের কাছ থেকে আমরা শিখতুম দুর্নীতি। অদ্ভুত ছিল তাদের হালচাল। ছেলেরা সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র আর মেয়েরা লোরেটো বা অন্য কোন ফিরিঙ্গী ইস্কুলে পড়ত। তাদের মধ্যে অনেকেই বাংলা কথা কি রকম এড়িয়ে এড়িয়ে বলত, বাংলা রঙ্গমঞ্চে সাজা-ইংরেজ যেমন বাংলা বলে। ইংরেজী যে তারা কি রকম বলত তা বোঝবার মত বিদ্যে আমাদের ছিল না। তবে একটা কথা আজও বেশ মনে আছে যে, এদের অধিকাংশই 'ড়'-এর পরিষ্কার উচ্চারণ করতে পারত না। আমাদের তারা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করত। আমরাও তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করতুম, কিন্তু সে মুখে, মনে মনে তাদের সম্ভ্রমই করতুম। নিজেদের মধ্যে যখন তারা—Shan't, Can't, Aren't, Oh my!—ব'লে কথা বলত, তখন আমরা অবাক হয়ে যেতুম।

এই শ্রেণীর লোকের অস্তিত্ব বাংলা দেশ থেকে প্রায় লোপ পেয়েছে।

একদিন, আমি ও অস্থির তখনও সানডে ইস্কুলে ভর্তি হই নি, শুধু দাদাই নীতির নিদিধ্যাসন করছে,—দাদা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চ'লে এল। তখন বোধ হয় বেলা নটা হবে। সানডে ইস্কুল শেষ হ'ত দশটায়। দাদা তাড়াতাড়ি চ'লে আসায় বাবার কি রকম সন্দেহ হ'ল। তিনি তাকে ডেকে তাড়াতাড়ি আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দাদা প্রথমটা লুকোবার চেষ্টা করলে, কিন্তু জেরায় প্রকাশ হয়ে পড়ল, গানের ক্লাসে যোগ না দিয়েই সে পালিয়ে এসেছে।

সঙ্গীতের বরপুত্রের ঘরে এতখানি কালাপাহাড়ি বাবা সহ্য করলেন

না। তিনি দাদাকে সেদিন এমন দক্ষিণা দিলেন যে, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হ'লে কোন মানুষই জীবনে তা ভুলতে পারে না।

আমি আর অস্থির দুজনে পরামর্শ ক'রে স্থির ক'রে ফেললুম, গানের ক্লাসে কখনও ফাঁকি দেওয়া হবে না।

এই সব ব্যাপারের দু-তিন সপ্তাহ পরেই আমাকে ও অস্থিরকে নীতি-বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রথম দিন, কি জানি কেন গানের ক্লাস হ'ল না। পরের রবিবারে ইস্কুলের অন্যান্য কাজ হয়ে যাবার পর গানের ক্লাস শুরু হ'ল। দুই ভাই আগে-ভাগে গিয়ে সেখানে জুটলুম। ইস্কুলের ছোট বড় সমস্ত ছেলেমেয়েকে একত্র ক'রে পাইকারি হিসাবে গান শেখানোর ব্যবস্থা।

গান শুরু হ'ল। সকলে সমস্বরে গেয়ে উঠল—"অদ্ভুত প্রকাণ্ড কাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কি চমৎকার!"

আহা, হৃদয় একেবারে উপ্‌চে উঠল! কি কবিত্ব, কি অনুপ্রাস! শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করবার জন্যে এর চেয়ে মধুময় সঙ্গীত জগতে আর কোথাও বোধ হয় রচিত হয় নি। অক্ষয়কুমার দত্ত মশায় তখন পরলোকে, নইলে তাঁর চারুপাঠের মধ্যে এমন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের বীজ লুকিয়ে আছে দেখলে তিনি পুলকিত হতেন নিশ্চয়।

ঘরে ও বাইরে গান শেখবার এত সুযোগ পেয়েও আমি একটা 'কালে খাঁ' হয়ে উঠতে কেন যে পারি নি, রসিকেরা এর মধ্যে তার সন্ধান নিশ্চয় পাবেন।

সান্‌ডে ইস্কুলের প্রত্যেক ছেলেমেয়েরই একখানা ক'রে 'চরিত্র-পুস্তক' রাখতে হত। এই পুস্তকের পৃষ্ঠায় রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সাত দিনের 'ব্যবহার' এবং 'পাঠ' কে কি রকম করেছে, তা বাড়ি থেকে অথবা যেসব মেয়ে বোর্ডিংএ থাকত তাদের সাময়িক অভিভাবকদের কাছ

থেকে লিখিয়ে এনে দেখাতে হ'ত। প্রায় সব ছেলে ও মেয়ের অভিভাবকেরাই লিখতেন 'পাঠ' ভাল, 'ব্যবহার' ভাল। অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ না করলে ব্যবহার সম্বন্ধে 'মন্দ' মন্তব্য কেউ করতেন না।

আমাদের বেলায় কিন্তু এ নিয়ম খাটত না। গুরুতর রকমের ভাল ব্যবহারের পরিচয় না পেলে আমাদের চরিত্র-পুস্তকে বাবা চোখ বুজে 'পাঠ' মন্দ এবং 'ব্যবহার'ও মন্দ লিখে দিতেন। পাঠ ও ব্যবহারের মধ্যে তিনি কোন প্রভেদ রাখতেন না। পাঠ খারাপ হ'লে ব্যবহার সুদ্ধ তাঁর কাছে মন্দ হয়ে যেত এবং ব্যবহার মন্দ হ'লে পাঠও মন্দ হ'ত। আমরাও 'পাঠ' ও 'ব্যবহার' এই দুই তাল-বেতালকে একসঙ্গে কিছুতেই সামলাতে পারতুম না। ফলে, নীতি-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাদের ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না।

আমাদের নীতি-শিক্ষাদাত্রীরা,—এখানে একজন কি দুজন পুরুষ ছাড়া আর সকলেই ছিলেন মহিলা এবং সকলেই ছিলেন অবৈতনিক—তাঁরা আমাদের তিন ভাইকে নিয়ে হিমসিম খেতে লাগলেন। তাঁদের অধ্যবসায়কে ধন্য। প্রতি সপ্তাহের সাত দিনই 'পাঠ' ও 'ব্যবহার' মন্দ দেখেও আমাদের সম্বন্ধে তাঁরা হতাশ হতেন না। অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে আমরা ভাল ব্যবহার করি, সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন। পাঁচ-সাত সপ্তাহের মধ্যেই ইস্কুল-সুদ্ধ ছেলেমেয়ে টের পেয়ে গেল যে, আমরা এক-একটা ডাকসাইটে দুষ্টু ছেলে।

চরিত্র-পুস্তকে মন্তব্য লেখা সম্বন্ধেও বাবার মৌলিকতা উল্লেখযোগ্য। ছাতের ওপরে লাট্টু ঘোরাচ্ছি, একবার এক 'ওড়ন গচ্চায়' লাট্টু ছাত থেকে উড়ে একেবারে নীচের উঠোনে গিয়ে পড়ল। উঠোনের এক কোণে আমাদের বুড়ী ঝি শরতের মা বাসন মাজছে, লাট্টুটা ঠক ক'রে তার পাঁয়ে লেগে মার পায়ে গিয়ে লাগল, ঘটনাটি এই।

চরিত্র-পুস্তকে সেদিনকার ব্যবহারের সামনে বাবা মন্তব্য লিখলেন, 'এই ব্যক্তি অত্যন্ত আত্মসুখপরায়ণ। দুর্বৃত্ত ক্ষণিক আত্মসুখের জন্ত নারীহত্যা, এমন কি মাতৃহত্যায়ও পরাঙ্মুখ নহে।'

এই রকম সব মন্তব্য প'ড়ে ইস্কুলময় হৈ-হৈ হুল্লোড লেগে যেত। তবুও সান্‌ডে ইস্কুল আমাদের এভ্‌রি-ডে ইস্কুলের চাইতে অনেক ভাল ছিল। সেখানে লেখাপড়ার বালাই ছিল না। শিক্ষয়িত্রীদের সত্তায় দশমহাবিত্তার অংশ ছিল অপেক্ষাকৃত অল্প। মাঝে মাঝে ইস্কুল-সুদ্ধু শিবপুরের বাগানে কিংবা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যাওয়া হ'ত চড়ুই-ভাতি করতে। এসব ছাড়া প্রায়ই কোন না কোন নামজাদা লোক এসে ছেলেমেয়েদের গল্পচ্ছলে নানা উপদেশের কথা শোনাতেন। রবিবারের সকালটা দিব্যি কাটত। সপ্তাহেব ছটা দিন যদি সান্‌ডে ইস্কুল আর একদিন যদি আসল ইস্কুল বসত, তা হ'লে আমি অন্তত কিছু লেখাপড়া শিখতে পারতুম।

এই সান্‌ডে ইস্কুলের সঙ্গে আমার জীবনের দুটি বিশেষ স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমি এখানে ভর্তি হবার বোধ হয় বছরখানেক পরে একটি নতুন মেয়ে আমাদের ক্লাসে এল। সে থাকত বেথুন বোর্ডিঙে। বেথুন বোর্ডিঙের প্রায় সব মেয়েই সান্‌ডে ইস্কুলে আসত। এই নতুন মেয়েটি শিশু বললেই হয়। আমার তখন বছর সাতেক বয়েস হবে, সে ছিল আমার চাইতেও ছোট। ছোট্টখাট্ট ফুটফুটে মেয়েটি, চোখ-মুখ দিয়ে বুদ্ধি ফুটে বেরুচ্ছে, কথা বলছে—যেন খই ফুটছে। ফ্রক-পরা মেয়েটি ক্লাসে এসেই ছোট বড সবার সঙ্গেই ভাব জমিয়ে ফেললে। প্রথম দিনই কিছুক্ষণের মধ্যেই নতুন মেয়ে ব'লে আর তাকে মনে হ'ল না। মেয়েটির নাম ছিল নন্দা।

পরের রবিবারে নন্দা আমার পাশেই বসেছিল। দুই ভাই আমসত্ত্ব

চুরি ক'রে খাওয়ার অপরাধে বাবা চরিত্র-পুস্তকে মন্তব্য করেছেন, 'এ ব্যক্তি অতি চতুর তস্কর। শুধু তাহাই নহে, অন্যকেও তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রলুব্ধ করে'।

শিক্ষয়িত্রীরা বোধ হয় বাবার এই মন্তব্যগুলোকে বিশেষ গ্রাহ্য করতেন না। নইলে নিশ্চয় তাঁরা আমাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতেন, না হয় পুলিসের হাতে সমর্পণ করতেন। তাঁরা আমাকে সামান্য একটু ধমক-ধামক দিয়ে ভবিষ্যতে সাবধান হবার উপদেশ দিতেন মাত্র।

সেদিন বাবার মন্তব্য শুনে ক্লাসসুদ্ধু ছেলেমেয়ে হেসে উঠল; আমি একটা চোর সাব্যস্ত হয়ে ক্ষুণ্ণ মনে ব'সে আছি, নন্দা আমার পাশেই ব'সে, সে খুব আস্তে আস্তে, যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়, আমায় বললে, তুমি খুব দুষ্টু, না?

মেয়েদের কাছে দুষ্টু ছেলে ব'লে বাহাদুরি নেবার মতন মনস্তত্ত্ব তখনও আমার তৈরি হয়ে ওঠে নি। নন্দার কথার কি জবাব দোব ভাবছি, এমন সময় সে বললে, দুষ্টু ছেলেদের আমি বড্ড ভালবাসি। আমার দাদারা যা দুষ্টু, তুমি আর কি দুষ্টু!

নন্দার সঙ্গে ভারি ভাব হয়ে গেল। সে বললে, তোমার নামটি কিন্তু ভাই বেশ মজার!

নামটি যে আমার অসাধারণ, সে বিষয়ে আমি বিশেষ সচেতন ছিলুম। এ নিয়ে কোথাও কোন আলোচনা হ'লেই আমি যেতুম দ'মে। অথচ সর্বত্রই আমার নাম নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল'না।

নন্দার কথা শুনে চুপ ক'রে রইলুম। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, আমার কথায় রাগ করলে ভাই?

এমন মিষ্টি কথা এর আগে আর শুনি নি। সেই এক দিনেই নন্দার সঙ্গে আমার খুব ভাব জ'মে গেল।

একদিন নন্দাকে জিজ্ঞাসা করলুম, এই বয়সে সে বোর্ডিঙে এল কেন? নন্দা বললে, তার মা মারা গেছেন, সেইজন্যে বাবা তাকে বোর্ডিঙে রেখে দিয়েছেন। বাবা সরকারী বড় চাকুরে। তিনি বিলেত থেকে পাস ক'রে এসেছেন। তাঁকে মফস্বলে থাকতে হয়। তার আর একটি বোন আছে, তার বয়স মাত্র দেড় বছর, সে মাসীর কাছে মানুষ হচ্ছে। বাবা তার দাদাদের নিয়ে থাকেন। পূজোর ছুটির সময় বাবা কলকাতার বাড়িতে আসবেন, সেই সময় নন্দাও বাড়ি যাবে। বাবার গরমের ছুটি নেই, সেজন্য গ্রীষ্মের ছুটির সময় সে বাবার কাছে গিয়ে থাকবে।

কারুর মা নেই শুনলে, কি জানি, আমার মনে ভারি কষ্ট হ'ত। এই সহমর্মিতার আকর্ষণে নন্দা আমার একান্ত আপনার জন হয়ে উঠল। ছুটির সময় আমাদের পত্র-বিনিময় চলত। তাতে যে কত মনের কথা সে আমায় লিখত ও আমি তাকে লিখতুম, তার আর ঠিকানা নেই।

তখন পোস্টকার্ডের দাম ছিল এক পয়সা আর খামের দাম ছিল দু পয়সা।

বছর পাঁচেক বেশ কাটল। এক রবিবারে নন্দা আমাকে বললে, এবার ভাই, আমাকে বাবার কাছে গিয়ে থাকতে হবে। বোর্ডিং ছেড়ে দিতে হবে।

মনের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করলুম। নন্দা চ'লে যাবে!

জিজ্ঞাসা করলুম, কেন ভাই?

নন্দা ফিসফিস ক'রে বললে, মামারা বলছে, আমি বড় হয়ে গিয়েছি, এবার আমার বিয়ের সম্বন্ধ হবে, আর বোর্ডিঙে রাখা চলবে না।

নন্দার বয়স তখন বোধ হয় এগারো হবে। তার বাবা বিলেত-ফেরত এবং সু-উচ্চশিক্ষিত, কাল ১৯০২।

বিদায়ের সময় নন্দা বললে, স্থবির, কাঁদিস নি ভাই। আবার দেখা হবে, নিশ্চয় দেখা হবে।

এই ঘটনার বোধ হয় সাত-আট বছর পরে, আমি তখন ভবঘুরে। বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে মধ্যপ্রদেশের এক শহরে এসে পড়েছি। শহরের ধার দিয়ে নর্মদা ব'য়ে চলেছে। নদীর ধারে বড় বড় উঁচু বাঁধানো ঘাট। ওপারে সাতপুরা গিরিশ্রেণী একেবারে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াই, সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলে নদীর ধারে নির্জন ঘাটে এসে বসি। লোকজনের চেঁচামেচিতে দিনের বেলায় নদীর আওয়াজ কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রাত্রে সে কি কলরোল! কত বিচিত্র সঙ্গীত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি। যাই যাই ক'রেও জায়গাটা ছাড়তে পারছিলুম না। সঙ্গীতময়ী চপলা নর্মদা কি মায়ার বাঁধনেই আমায় বেঁধেছিল!

সে এক কোজাগর-পূর্ণিমা-রাত্রি। জনশূন্য ঘাটে একলা ব'সে আছি। আমার কি জানি মনে হতে লাগল, দূরে রহস্যময় নিদ্রিত সাতপুরা শৈলমালা ধীরে ধীরে যেন জেগে উঠছে। যেন তার প্রত্যেকটি বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, পতঙ্গ বিচিত্র সুরে কলরব করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম, যেন সেই মহাকায় অতি ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে নদীর কিনারায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর অদ্ভুত এক ভাষায় আমাকে কি যেন বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে—কত যুগ-যুগান্তের কাহিনী, কত দুর্লভ সংবাদ, তার মধ্যে নর্মদার কলধ্বনি কোথায় ডুবে গেল!

হঠাৎ আমার তন্ময়তায় আঘাত দিয়ে যেন পাহাড় ভেদ ক'রে আমারই মাতৃভাষায় বাগীশ্বরীর মূর্তি ফুটে উঠল সঙ্গীতের প্রস্রবণে। চমকে ফিরে দেখলুম, দূরে অন্ধকারে ব'সে কে গান গাইছে—

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে সুখ গেছে শান্তি গেছে আশা ফুরাইয়া।

মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে, রাত্রি দ্বিপ্রহরে মাতৃভাষার সে সঙ্গীতে আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বাগেশ্রীর উদাস অন্তরা পরতে পরতে চড়তে লাগল উদাত্ত স্বরে—

সম্মুখে অনন্ত রাত্রি
আমরা দুজন যাত্রী—

উঠে লোকটির কাছে গিয়ে বসলুম। গান শেষ হয়ে গেল। গানের সুরে ও ভাষায় আমাব মনের মধ্যে যে সুর জেগে উঠেছিল, তারই সঙ্গে মিলিয়ে নর্মদা তুললে তার কলতান।

গায়ককে বললুম, বাঃ, কি চমৎকার!

দেখলুম, গায়ক প্রায় আমারই বয়সী, হয়তো দু-এক বছরের বড় হতে পারে। আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, আপনি বাঙালী! নতুন এসেছেন বুঝি?

বললুম, এখানে আমি আগন্তুক, দুদিনের জন্য এসেছি। আবার চ'লে যাব।

প্রশ্ন হ'ল, কাদের বাড়িতে আছেন?

কোনও বাঙালীর বাড়িতে উঠি নি শুনে সে অবাক হয়ে গেল। বললে, তা হবে না। আমরা বাঙালীরা থাকতে আপনি এখানে-সেখানে থাকবেন, তা হবে না।

পরিচয় বাড়তে লাগল। শুনলুম, তারা দু-পুরুষ ধ'রে এ দেশে বাস করছে। তারা ব্রাহ্মণ। তার বাবা এখানকার মস্ত উকিল। সে নাগপুরে বি. এ. পড়ে। তার দাদার সাংঘাতিক ব্যামো, আজ যায় কাল যায়—এমন অবস্থা। সেইজন্যে তাকে এই সময় এখানে আসতে

হয়েছে। দাদা ব্যারিস্টার, তার হয়েছে রাজযক্ষ্মা। দাদার কথা বলতে বলতে বলতে সে চোখ মুছতে লাগল।

আমি বললুম, ভাই, আমি তোমার কোন উপকার করতে পারি কি? আমি উদাসীন লোক, যক্ষ্মারুগীর সেবার ভার আমায় দিতে পার।

সে বললে, যখন 'ভাই' বলেছ, তখন আর ছাড়ছি না। ভাইয়ের বাড়ি থাকতে অন্য জায়গায় থাকবে, সে হবে না।

তার কথাবার্তার মধ্যে এমন আন্তরিকতা ছিল যে, বেশিক্ষণ তাকে দূরে রাখা সম্ভব হ'ল না। সে বলতে লাগল, কিছুতেই তোমাকে এখানে-সেখানে থাকতে দোব না। আমাদের বাড়ি চল, যতদিন খুশি সেখানে থাকবে। ইচ্ছে করলে সারা জীবন সেখানে থাকবে। আমি বলছি, কখনও যদি কোনও অসুবিধে হয় তো চ'লে যেও।

এই ব'লে সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি দু হাত দিয়ে তার হাতখানা চেপে ধরলুম।

সেই রাতেই সে আমায় তাদের ওখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, অনেক চেষ্টা ক'রে তখনকার মত অব্যাহতি পেয়ে গেলুম।

পরদিন সকালে তাদের ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। আমার নতুন বন্ধু তার ছোট ভাইদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা তিন-চার ঘণ্টা ক'রে সেখানে কাটতে লাগল। অতি ভদ্র ও শিক্ষিত পরিবার তারা। প্রাসাদের মত বাড়ি। লোকজন, চাকর-বাকর, গাড়ি-ঘোড়া, জমজম করছে সংসার। কিন্তু সবাই ম্রিয়মাণ। ছোট ছেলেরা পর্যন্ত আস্তে কথা কয়, কারুর গলার আওয়াজ পাওয়া যায় না—কি যেন বিপদের শঙ্কায় সকলেই অবসন্ন।

তারপরে একদিন সেই দিন এল। সকাল থেকেই বাড়িতে ঘন ঘন

ডাক্তার-বদ্যি যাওয়া-আসা করতে লাগল। সন্ধ্যেবেলায় আমার বন্ধু বললে, আজ রাতে আর তোমার যাওয়া হবে না, এখানেই থেকে যাও। সকাল থেকেই দাদার অবস্থা খুব খারাপ।

রাত্রে সেখানেই থেকে গেলুম। ধপধপে সাদা নরম বিছানা দেখে অতি দুঃখেও হাসি পেল। প্রায় দু মাস ভূমিতলে হাতে মাথা রেখে রাত কেটেছে। বিছানায় শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লুম।

তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। অন্দর-মহলে নারীকণ্ঠে কান্নার রোল উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে এলুম, বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতেই সে বললে, দাদা চ'লে গেল এই মিনিট পনরো হবে। যেও না কিন্তু, শ্মশানে যেতে হবে। চা খেয়েছ?

বেলা বাড়ার সঙ্গে বাড়িতে দলে দলে লোক আসতে লাগল— বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী। বজ্রাহত বনস্পতির মতন গৃহকর্তা একটা ঘরে চেয়ারে ব'সে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে যত মুরুব্বী মক্কেল—কেউ বা ব'সে, কেউ বা দাঁড়িয়ে। কারুর মুখেই সান্ত্বনার ভাষা নেই। অন্তঃপুরে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল।

শব বাইরে একটা উঠোনের মতন জায়গায় এনে রাখা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি নারী ও ছোট ছেলেমেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। তার মধ্যে মাকে দেখেই চিনতে পারলুম। সকলেই কাঁদছে, ঝি-চাকর সবাই। বাহকেরা শব তুলব তুলব করছে, এমন সময় ভেতর থেকে ভিড় ঠেলে একটি নারী এসে পড়ল শবের বুকের ওপর, যেন উন্মূলিত তড়িল্লতা।

এই দৃশ্য দেখে ভিড়ের সবাই আবার চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। মানুষের এই নিষ্ফল অভিযোগ কত বন্ধুর গৃহপ্রাঙ্গণে ধ্বনিত হতে দেখেছি, তবুও অশ্রুসংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে আমার বন্ধু মেয়েটির কাছে গিয়ে বললে, বউদি, ওঠ, এবার আমরা নিয়ে যাই।

এই ব'লে সে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলে। এবার তার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলুম। রুদ্যমানা সে নারী—নন্দা! আমার বাল্যসখী!

বাহকেরা শব তুলে নিয়ে চ'লে গেল। আমার আর তাদের সঙ্গে যাওয়া হ'ল না। নন্দা আমার দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে, কে, স্থবির!

হ্যাঁ।

দেখলি, আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল!

আমার জীবনপাত্র কোন্ অপূর্ব রসে পরিপূর্ণ ক'রে দেবার জন্যে নর্মদা তার কুহকজাল বিস্তার করেছিল, এবার তা বুঝতে পারলুম।

বন্ধু, তার মা, বাবা আর নন্দা—কেউ আমাকে ছাড়লে না। শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে যাবার পরদিনই নন্দার দাদা এল তাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে।

আমিও তাদের সঙ্গে ট্রেনে চড়লুম। ট্রেনে চার ঘণ্টার মধ্যে তার সাত-আট বছরের জীবন-কাহিনী আমাকে শোনালে। আমার এই সময়টা কেমন ক'রে কেটেছে আর কাটছে, তন্নতন্ন ক'রে তার সন্ধান নিয়ে যথোপযুক্ত উপদেশ দিলে।

একটা বড় স্টেশনে আমরা নামলুম। এইখানে ট্রেন বদলে তারা অন্য গাড়ি ধরবে।

মিনিট পনরোর মধ্যেই তাদের ট্রেন এসে গেল। বিদায়ের সময় নন্দা বললে, স্থবির, গেল-জন্মে নিশ্চয় তুই আমার ভাই ছিলি, তা না হ'লে কোথা থেকে কি দিনেই আবার দুজনে দেখা হ'ল!

প্রথম ঘণ্টা পড়ল।

নন্দা জিজ্ঞাসা করলে, আবার কবে দেখা হবে ভাই ?

তারপরে নিজেই ম্লান হেসে নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললে, বেঁচে থাকলে নিশ্চয় দেখা হবে, কি বলিস ?

গার্ড হুইস্‌ল দিলে, ট্রেন চ'লে গেল।

সেই থেকে নন্দার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। আমি তো বেঁচেই আছি, নন্দা বোধ হয় চ'লে গিয়েছে।

সান্‌ডে ইস্কুলের দ্বিতীয় স্মৃতি হচ্ছে আমার বন্ধু শচীন। শচীনও ছিল মাতৃহীন। নন্দার কিছুদিন আগে সে সেখানে ভর্তি হয়। প্রথম দিন থেকেই তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জ'মে গেল। শচীনের দিদি আগে থাকতেই সান্‌ডে ইস্কুলে আসত এবং আমি যে একটা সাংঘাতিক চরিত্রের লোক সে কথা জানত। তাই আমার সঙ্গে তার অতখানি বন্ধুত্ব সে বিশেষ সুনজরে দেখত না। দিদি আমার কীর্তিকাহিনী বাড়িতে ব'লে দেওয়ায় শচীনের বাবা তাকে আমার সঙ্গে মিশতে বারণ ক'রে দিলেন। এতেও আমাদের বন্ধুত্ব ছুটল না দেখে বাড়িতে তার ওপরে অত্যাচার শুরু হ'ল। আমরা শেষকালে ইস্কুলে দুজনের মধ্যে কথা বন্ধ ক'রে দিলুম। ইস্কুল ছুটি হওয়ার পর সেখান থেকে বেরিয়ে একজনদের রকে ব'সে দুজনে অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প ক'রে যে যার বাড়ি চ'লে যেতুম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বও বেড়ে উঠল। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রেও আমাদের বন্ধুত্ব টিঁকে ছিল। এই সেদিন মৃত্যু এসে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে।

শচীনের কথা এই জাতকের অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে।

একদিন শুনতে পেলুম, আমাদের ইস্কুলের বাড়িওয়ালা নোটিস দিয়েছে—বাড়ি ছেড়ে উঠে যেতে হবে। ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ খুঁজে খুঁজে সেই শিয়ালদার কাছে একটা বড় বাগানবাড়ি ঠিক করলেন ইস্কুলের জন্মে। আমাদের বাড়ি থেকে সে বাড়িটা মাইল দেড়েক দূর হবে। রোজ এতটা রাস্তা আমরা দু-ভাইয়ে হেঁটে যাওয়া-আসা করতে লাগলুম। আমাদের এক সঙ্গীও জুটল। আমাদের কাছেই তাদের বাড়ি। ইস্কুলে যাবার মুখে তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আমরা তিন মূর্তিতে রাস্তা আবিষ্কার করতে করতে আধ ঘণ্টার জায়গায় ঘণ্টা খানেক ঘুরে ইস্কুলে গিয়ে পৌঁছতুম।

আমাদের এই নতুন বন্ধুটির নাম প্রকাশচন্দ্র। খুবই দরিদ্র ছিল তারা। তার বাবা সামান্য কাজ করতেন। একজনদের একতলায় দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে কায়ক্লেশে তাঁরা দিনাতিপাত করতেন। প্রকাশের আর দুটি বোন ছিল, তারা আমাদের চাইতে অনেক বড়। বোনদের মধ্যে যে ছোট, সে আমার সঙ্গে পড়ত। এই পরিবারের সঙ্গে আমার ও অস্থিরের খুবই অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল। প্রকাশের যে দিদি আমার সঙ্গে পড়ত, তার নাম ছিল অলকা। তাকে সবাই 'লোকা' ব'লে ডাকত।

একদিন ক্লাসে আমার হাতের ধাক্কা লেগে লোকার একটি বাহারি কালির দোয়াত মাটিতে প'ড়ে ভেঙে গেল। লোকাদের অবস্থার কথা আমি ভাল ক'রেই জানতুম। তার অমন সুন্দর দোয়াতটা ভেঙে ফেলে আমার ভারি দুঃখ হতে লাগল। লোকা বেচারী করুণ চোখে একবার দোয়াতের দিকে আর একবার আমার দিকে চাইতে লাগল। ইতিমধ্যে লোকার দুটি মেয়ে-বন্ধু মহা গরম হয়ে আমার ওপর তম্বি জুড়ে দিলে এবং হেডমাস্টারকে ব'লে দেবে ব'লে শাসাতে লাগল।

কিছুক্ষণ তাদের কথা শুনে লোকা হঠাৎ ব'লে উঠল, বেশ করেছে ও ভেঙেছে, তোমাদের দোয়াত তো ভাঙে নি—ও আমার ভাই হয়।

লোকার মুখে এই কথা শুনে তারা একদম চুপ ক'রে গেল। কিছুক্ষণ পরে লোকা আবার বললে, ও তো ইচ্ছে ক'রে ভাঙে নি।

সেইদিন থেকে আমি লোকার এমন অনুগত হয়ে পড়লুম যে, ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ঠাট্টা করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

এই ঘটনার বোধ হয় মাস দুয়েকের মধ্যে লোকার মা কলেরায় মারা গেলেন। মা মারা যেতেই তাদের সংসার অচল হয়ে পড়ল। কে রাঁধে, কেই বা গৃহস্থালী দেখে! লোকা ও তার দিদির ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মাস কয়েক যেতে না যেতে লোকার দিদির বিয়ে হয়ে সে অন্যত্র চ'লে গেল।

লোকা পড়ল একা। দরিদ্র সংসারের সব ভার তার কাঁধের ওপর। আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তুম তাড়াতাড়ি, রাস্তায় ঘোরবার জন্যে। প্রকাশকে নিতে গিয়ে প্রায়ই দেখতুম, তখনও তাদের চাল যোগাড় হয় নি কিংবা সবেমাত্র লোকা ভাত চড়িয়েছে। এই সময়টুকুর মধ্যে সে আমায় ইস্কুলের সব কথা জিজ্ঞাসা করত। বান্ধবীদের চিঠি আমাকে দিত, তাদের কাছ থেকে জবাব নিয়ে আমি আবার লোকাকে দিতুম।

লোকা বলত, আমার অদৃষ্টে এই ছিল! এক বছর আগেও বুঝতে পারি নি, এমন ক'রে ইস্কুল-টিস্কুল ছেড়ে ভাত রাঁধতে রাঁধতে জীবন কাটবে! ইস্কুলের জন্যে এমন মন কেমন করে যে, কি বলব!

লোকার তখন আঠারো-উনিশ বছর বয়স। অটুট স্বাস্থ্য ও লম্বা-চওড়া তার চেহারা, দেখলে মনে হ'ত, বাইশ-তেইশ বছর বয়স হবে। জীবনে হঠাৎ এই পরিবর্তন আসায় সে বেচারী একেবারে মুষড়ে

পড়ল। সে বলত, তোরা ইস্কুলে চ'লে গেলে সারাদিন যে কি ক'রে কাটে, তা আমিই জানি।

এই ব'লে সে কাঁদতে থাকত। আমি, অস্থির ও প্রকাশ তার সঙ্গে কাঁদতে থাকতুম। লোকা আমাদের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলত, যা, তোরা ইস্কুলে যা, আমার দিন এক রকম ক'রে কেটে যাবে। আর কদিনই বা বাঁচব!

সমস্ত দিন অশ্রুমুখী লোকার মুখ মনের মধ্যে জলজল করত।

একদিন প্রকাশদের ওখানে গিয়ে দেখি, লোকা তখন সবেমাত্র উনুনে আগুন দিচ্ছে। মহা মুরুব্বির মত তাকে বললুম, লোকা, তুই মজালি! রোজই কি দেরি করবি?

আমার বয়স তখন নয়, লোকার বয়স আঠারো।

লোকা আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে মুচকে হেসে উনুনে খুব জোরে পাখা করতে লাগল।

প্রকাশের খাওয়া শেষ হতে সেদিন প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। লোকা বললে, আজ আর এত বেলায় ইস্কুলে গিয়ে কি হবে! এখানে চারটে অবধি থেকে বাড়ি চ'লে যাস।

সারা দুপুর খুব হল্লোড়ে কাটল। বেলা প্রায় দুটোর সময় ওদের বাড়িতে দু-তিনজন যুবক এল, তারা প্রকাশের দাদার বন্ধু। দেখলুম, লোকার সঙ্গে তাদের ভারি ভাব।

আমরা ছাড়া আবার অন্য লোকের সঙ্গে লোকার এতখানি ভাব দেখে মনে মনে ঈর্ষা জাগতে লাগল।

যা হোক, কিছুক্ষণ পরেই তারা চ'লে গেল। বেলা চারটে বাজতে আমরাও বাড়ি ফিরে গেলুম।

সেদিন প্রথম ইস্কুল পালালুম।

কিছুদিন চলল। একদিন, সেদিন আমাদেরই দেরি হয়ে গিয়েছিল, প্রকাশের ওখানে গিয়ে দেখি যে, লোকার অসুখ, সে বিছানায় শুয়ে আছে, আর প্রকাশ রান্না করছে। রান্না মানে—ভাত চড়িয়ে দিয়ে লোকা শুয়েছে, প্রকাশ শুধু উহুনের কাছে ব'সে আছে।

অস্থির রান্নাঘরে প্রকাশের সঙ্গে গল্প করতে লাগল, আমি গিয়ে বসলুম লোকার পাশে।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে লোকা ?

লোকা দু-হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে ছিল। হাত দুটো নামাতেই দেখলুম, তার দুই চোখ দিয়ে জল ঝরছে। কিসের যন্ত্রণায় তার মুখখানা থেকে থেকে বিকৃত হয়ে উঠছে! লোকার রঙ ছিল ময়লা, কিন্তু মুখ-চোখ বেশ সুশ্রীই ছিল। আমার চোখে লোকা দেখতে বেশ ভালই ছিল। কিন্তু যন্ত্রণায় তার মুখখানা এমন বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল যে, কি বলব!

লোকা কাঁদতে কাঁদতে বললে, স্থবির ভাই, আমার সর্বনাশ হয়েছে, আমি আর বাঁচব না।

আমার মনে হ'ল, লোকার কলেরা হয়েছে। সেদিন তার মা ওই রোগে মারা গিয়েছেন, আজ আবার তাকেও ওই রোগে ধরল! ভয় হতে লাগল, কিন্তু কিছুদিন আগেই বাবা আমাদের কলেরার টিকেও দিইয়ে আনিয়েছিলেন, মনে মনে একটু ভরসা ছিল যে, কলেরা হবে না।

লোকার যন্ত্রণা ক্রমে বাড়তে লাগল। সে চীৎকার ক'রে কান্না জুড়ে দিলে। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, মাগো, তুমি কোথায় আছ, আমায় নিয়ে যাও, তুমি গেলে, আমায় এমন অসহায় ফেলে গেলে কেন ?

তার কান্না দেখে আমরাও কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। তাদের বাড়িতে তখন কেউ নেই। কি হবে, কাকে ডাকতে হবে—কিছুই

জানি না। এদিকে লোকার যন্ত্রণা ও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার বেড়ে চলেছে, এমন সময় সে আমাদের বললে, স্থবির, তোরা ইস্কুলে চ'লে যা, প্রকাশ আজ আর যাবে না। যদি ম'রে যাই, লোকাকে ভুলিস না।

ক্ষুণ্ণমনে আমরা দুজনে ইস্কুলে চ'লে গেলুম। পথে যেতে যেতে অস্থির বললে, লোকা বড় ভাল, বড় হয়ে আমি ওদের টাকা দোব, বেচারীরা খেতে পায় না।

লোকার অসুখের কথা বাড়িতে কিছুই বললুম না। কলেরা-রুগীর বিছানায় ব'সে তার মাথায় হাত বুলিয়েছি জানলে মা অনর্থ বাধাবেন এই ভয়ে। পরের দিন তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে লোকাদের বাড়িতে গিয়ে দেখলুম, তাদের দরজায় তালা লাগানো, কেউ কোথাও নেই।

রোজই যাই, দেখি, লোকাদের ঘরে তালা বন্ধ। বোধ হয় পাঁচ দিন বাদে তাদের ঘর খোলা দেখে ঢুকে পড়লুম।

ভেতরে গিয়ে দেখি, ঘরের এক কোণে লোকার বাবা ব'সে একতারা বাজিয়ে চোখ বুজে গান করছেন—

গাও রে তাঁহারি নাম
রচিত যাঁর বিশ্বধাম।

আমরা দুজনে দূরে দাঁড়িয়ে রইলুম। গান শেষ হতে তিনি চোখ খুলে আমাকে দেখে বললেন, কে রে? স্থবির? ওরা তো সব মামার বাড়ি চ'লে গেছে। প্রকাশ কাল আসবে।

দারুণ উৎকণ্ঠায় হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলুম, লোকা কেমন আছে?

বৃদ্ধ বললেন, লোকা! লোকা ভাল আছে।

পরের দিন দেখি, প্রকাশ ভৈরিই হয়ে আছে, তার বাবা রান্নাঘরের কাজকর্ম দেখছেন, লোকা নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করলুম, লোকা কেমন আছে রে ?

প্রকাশ বললে, ভাল আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, লোকার কি হয়েছে রে ?

প্রকাশ অকুণ্ঠিতভাবে বললে, লোকার ছেলে হয়েছে।

স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কুমারী মেয়ের ছেলে হওয়া যে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার—সে তথ্য আমরা সেই বয়সেই জেনেছিলুম। বোধ হয় পাঁচ-সাতখানা উপন্যাস তখন আমাদের মুখস্থ। কুমারী মাতার দুর্দশার গুটিকয়েক কাহিনীও পড়া ছিল। লোকার শেষকালে এই হ'ল !

প্রকাশ বলতে লাগল, লোকাকে আর বাড়ি ফিরিয়ে আনা হবে না, তার যেখানে খুশি সেখানে চ'লে যাবে। বাবা বলেছেন, আর তার মুখ দেখবেন না। লোকা দিনরাত কাঁদছে—

কঠিন সংসারের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয় হ'ল। লোকা, যে তাদের ছোট্ট সংসারের সর্বময় কর্ত্রী ছিল, তার এ কি হ'ল! প্রকাশ, তার দাদা ও বাবার জন্যে কোন্ ভোরে উঠে সে সংসারের কাজ শুরু করত, তারপর সেই রাত্রি দশটা-এগারোটা অবধি তাদেরই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তার খাটুনির অন্ত ছিল না, সেই লোকা এমন অপরাধ করলে যে, তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে! কোথায় যাবে সে ?

প্রকাশ বলতে লাগল, বাবা তাকে ছেলে-সমেত তাড়িয়ে দেবেন, ছেলে নিয়ে তাকে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে হবে।

ছেলে কোলে নিয়ে অনেক ভিখারিণীকে রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে দেখেছি। কল্পনায় দেখতে লাগলুম, লোকাও তার ছেলেটিকে

বুকে জড়িয়ে ধ'রে ডান হাতখানা পথচারীদের দিকে এগিয়ে দিয়ে কাতর স্বরে বলছে, একটা পয়সা দাও বাবা!

প্রকাশের মুখের দিকে আর চাইতে পারলুম না। লোকার সেই শেষ মিনতি—যদি ম'রে যাই, লোকাকে ভুলিস নি—কানের কাছে বাজতে লাগল।

আমি আর সহ্য করতে পারলুম না, কেঁদে ফেললুম। আমার কান্না দেখে অস্থির ও প্রকাশ কাঁদতে লাগল। লোকার শেষকালে এই হ'ল! তার সঙ্গে ব'সে ব'সে আমরা কল্পনায় ভবিষ্যৎ জীবনে যে কত প্রাসাদ তৈরি করেছিলুম, এক মুহূর্তে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

পথের ধারে একটা রকে ব'সে আমরা তিনজনে প্রাণ খুলে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কোথায় রইল ইস্কুল, পড়াশুনা! কোথায় গেল বাবার প্রহারের ভয়!

আমাদের চারিদিকে লোক জমা হতে লাগল। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে লাগল, খোকা, তোমাদের কি হয়েছে?

শেষকালে সেখান থেকে উঠে আমরা গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলুম। সারাদিন সেখানে ব'সে ব'সে প্রায় সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরলুম।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, এত দেরি হ'ল কেন রে?

বললুম, ছোটলাট এসেছিল ইস্কুল দেখতে, তাই আজ দেরিতে ছুটি হয়েছে।

সেদিন থেকে উপরি-উপরি বোধ হয় পাঁচ-ছ দিন আমরা ইস্কুলে না গিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। মধ্যে মধ্যে গড়ের মাঠে গিয়ে নির্জনে ব'সে লোকা ও তার ছেলের সম্বন্ধে আলোচনা হতে লাগল। লোকাকে যখন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে, তখন তাকে

কোথায় নিয়ে গিয়ে রাখা হবে, কি ক'রে তার খরচ চলবে, সে সম্বন্ধে গভীর গবেষণা চলতে লাগল।

বেশ মনে পড়ে, সেদিনটা রবিবার। কদিন ইস্কুলে না গিয়ে মনের মধ্যে ভয়ানক একটা নির্বেদ চলেছে। কাল থেকে নিয়মিত ইস্কুলে যেতে হবে—এ রকম একটা সঙ্কল্পও দুই ভাইয়ে ক'রে ফেলেছি। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কোথায় একটা নেমন্তন্ন ছিল, দুজনে মিলে মহা উৎসাহে জুতো বুরুশ করছি, এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—

মেঘ-গর্জনের মত বাবা চীৎকার ক'রে ডাকলেন, স্থবির, অস্থির, শিগ্‌গির এস।

বাবার কাছ অবধি যাবার আর তর্ সইল না। তিনি এক রকম দৌড়ে এসে প্রথমেই আমাকে ধরলেন—বাঘে যেমন হরিণ ধরে।

তারপরে, আহা-হা, মধু মধু মধু! আজও সে কথা স্মৃতিপটে উদিত হ'লে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।

দশ-পনরোজন প্রতিবেশী সদর-দরজা ভেঙে সন্ধ্যেবেলা যখন আমাদের দুই ভাইকে বাবার হাত থেকে উদ্ধার করলে, তখন আমি অর্ধমৃত, অস্থিরের মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত উঠছে।

নিজ অঙ্গের বেদনায় লোকার ব্যথা প্রায় ভুলে গেলুম।

লোকাদের বাড়িতে অনেকগুলি যুবক আসা-যাওয়া করত। এদের মধ্যে একজনের সে নাম করলে। এই ব্যক্তি জেরায় প্রকাশ করতে বাধ্য হ'ল যে, লোকার সঙ্গে তার যৌন সম্বন্ধ হয়েছিল। এ ব্যক্তি ভদ্রলোকের সন্তান ব'লে পরিচিত ছিল এবং ছিল অবিবাহিত, তবুও লোকাকে বিয়ে করতে সে রাজী হ'ল না। এর দুটি-তিনটি ভাই ব্রাহ্মসমাজে বেশ নামজাদা লোক; কিন্তু তারাও তাদের ভাইকে এমন কিছু চাপ দিলে না, যার জন্যে লোকাকে বিয়ে করতে সে বাধ্য হয়, বরং

তারা বিরোধিতাই করলে। অসহায়া মাতৃহীনা দরিদ্রের সন্তান কুমারী মাতা লোকাকে কেউ বিয়ে করতে রাজী হ'ল না।

এসব কথা অবিশ্যি আমরা প্রকাশের কাছে শুনতে পেতুম, কারণ লোকাকে সেই যে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, আর তাকে ফিরিয়ে আনা হয় নি।

এই ঘটনার বছর দশেক পরে একবার প্রকাশের মুখে শুনলুম, একজন লোকাকে বিয়ে করেছে, তার আরও ছেলেপিলে হয়েছে, বেশ সুখেই আছে সে।

লোকার সঙ্গে আর আমাদের দেখা হ'ল না। যে লোকা একদিন আমাদের এত আপনার ছিল, ক্রমে তার স্মৃতি মন থেকে একেবারেই মুছে গেল।

সেই ব্যাপারের প্রায় পনরো-ষোল বছর পরে একটা বড় রকমের অস্ত্রোপচারের জন্যে বাবাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। রোজ বিকেলে বাবাকে দেখতে যাই। একদিন, সেদিন আমার শরীরটা নিতান্ত খারাপ, আস্তে আস্তে হাসপাতালের দীর্ঘ সোপান অতিবাহিত ক'রে ওপরে উঠে দম নেবার জন্যে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় নারীকণ্ঠের আহ্বানে চমকে উঠলুম।

কি রে স্থবির, কেমন আছিস?

মুখ তুলে দেখলুম, লোকা সামনে দাঁড়িয়ে। তার অটুট স্বাস্থ্য জরায় একেবারে জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। চোখ দুটো ফোলা-ফোলা—সে এক অদ্ভুত চেহারা! তবুও প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে চিনতে পারলুম।

আমি চুপ ক'রে আছি দেখে সে বললে, কি রে, লোকাকে ভুলে গেছিস?

লোকাকে ভুলব কি ক'রে! কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোর?

একটা পাগল নিমন্ত্রিতদের ভুক্তাবশিষ্ট থেকে বেছে বেছে কি খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি পাগলটাকে ধ'রে বাড়িতে নিয়ে এসে তার মাথার জটা ও দাড়ি ছেঁটে স্নান করিয়ে তাকে ভদ্র ক'রে আমাদের বললেন, এঁকে তোমরা 'মামাবাবু' ব'লে ডাকবে।

রাস্তার পাগলের সঙ্গে হঠাৎ সম্পর্ক স্থাপন করতে মা ঘোরতর আপত্তি করায় সে ব্যক্তি তখুনি আমাদের 'কাকাবাবু' হয়ে গেল। সেই থেকে সে আমাদের বাড়িতেই থেকে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হ'ল না। তার পর থেকে বাবা প্রায় প্রতিদিনই দুটি-তিনটি ক'রে পাগল রাস্তা থেকে ধ'রে আনতে আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে মাসখানেকের মধ্যে বাড়ি একটি ছোটখাট পাগলা গারদে পরিণত হয়ে গেল। প্রতিদিন সকালবেলা এক থান কাপড়-কাচা সাবান দিয়ে এই পাঁচ-ছটি পাগলাকে স্নান করিয়ে তিনি আপিসে যেতেন। এরা খেয়ে-দেয়ে বাইরে চরতে যেত আর সেই সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরত। এদের অঙ্গে প্রায়ই শতছিন্ন ধুতি জামা থাকত। বাবা কোন্ জন্মে সরকারী বনবিভাগ ও তারপরে চা-বাগানে চাকরি করেছিলেন। সেই সময়কার পেণ্ট্‌লান ও অদ্ভুত অদ্ভুত সব জামা একটা কাঠের সিন্দুকে জমা ছিল। সেই সব জামা ও পেণ্ট্‌লান এতদিন পরে এই পাগলদের অঙ্গে চড়তে লাগল।

দু-তিনজন পাগল সন্ধ্যে হ'লেই গুটিগুটি বাড়ি ফিরে আসত আর জন দুয়েক প্রায়ই ফিরত না। বাবা আপিস থেকে বাড়িতে ফিরেই তাদের খোঁজ করতেন আর তারা তখনও ফেরে নি শুনে তক্ষুনি বেরিয়ে যেতেন তাদের খোঁজে। সারা শহর ঘুরে কোনদিন ছাতাওয়ালা গলি, কোনদিন বা সার্পেনটাইন লেন থেকে তাদের আবিষ্কার ক'রে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে আনতেন। এই ভাবে চলতে চলতে এক এক ক'রে

তিনজন পাগল কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, আর তাদের খোঁজ পাওয়া গেল না।

যে দুজন পাগল আমাদের বাড়িতে থেকে গেল, তারা হাঙ্গামা কিছু করত না, বরং এদের নিয়ে আমাদের বেশ আমোদেই দিন কাটত। এদের মধ্যে একজনের অভিনয় করবার ও গান গাইবার বাতিক ছিল। মধ্যে মধ্যে যেদিন তার ওপর নটরাজ ভর করতেন, সেদিন সে সারারাত চীৎকার করতে থাকত। আর একজনের ছিল লঙ্কা খাওয়ার বাতিক। আমরা তাকে প্রতিদিন লুকিয়ে আট-দশটা কাঁচা লঙ্কা দিতুম, আর সে আমাদের সামনেই সেগুলোকে কচকচ ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত।

সে সময়ে আমাদের বাড়িতে অমূল্য ও বিনোদ নামে দুটি ছেলে থাকত। অমূল্যকে বাবা কোথায় একটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সে বেচারী রাত থাকতে উঠে বেরিয়ে যেত আর ফিরত বেলা বারোটায়। বিনোদ ইস্কুলে পড়ত। কি কারণে জানি না, গাইয়ে ও লঙ্কাবিলাসী দুই পাগলাই অমূল্যকে দেখলেই ক্ষেপে যেত।

সেদিন, কি জানি কেন, লঙ্কাবিলাসী পাগলা খাবার সময় আমাদের রাঁধুনীর ওপর চ'টে গিয়ে ভাতের থালা, জলের ঘটি ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিলে। গাইয়ে পাশে ব'সেই খাচ্ছিল। জুড়িদারের সাড়া পেয়ে সেও খাওয়া ছেড়ে রাঁধুনীকে দমাদ্দম মারতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মা কাছেই ছিলেন, তাঁর ধমক-ধামকে তারা একটু শান্ত হয়েছিল, এমন সময় অমূল্য কাজ থেকে ফিরে এল। তাকে দেখেই লঙ্কাবিলাসী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে মাকে বঁটি নিয়ে তাড়া করলে। অমূল্য কোন রকমে মাকে রক্ষা করলে বটে, কিন্তু তারা ভাতের হাঁড়ি আর যা কিছু খাবার ছিল সব নষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে, মার খাওয়া পর্যন্ত হয় নি।

সমস্ত কাহিনীটি ব'লে মা জিজ্ঞাসা করলেন, তুই লতুদের ওখানে খেলি বুঝি?

একটা পাগল নিমন্ত্রিতদের ভুক্তাবশিষ্ট থেকে বেছে বেছে কি খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি পাগলটাকে ধ'রে বাড়িতে নিয়ে এসে তার মাথার জটা ও দাড়ি ছেঁটে স্নান করিয়ে তাকে ভদ্র ক'রে আমাদের বললেন, এঁকে তোমরা 'মামাবাবু' ব'লে ডাকবে।

রাস্তার পাগলের সঙ্গে হঠাৎ সম্পর্ক স্থাপন করতে মা ঘোরতর আপত্তি করায় সে ব্যক্তি তখুনি আমাদের 'কাকাবাবু' হয়ে গেল। সেই থেকে সে আমাদের বাড়িতেই থেকে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হ'ল না। তার পর থেকে বাবা প্রায় প্রতিদিনই দুটি-তিনটি ক'রে পাগল রাস্তা থেকে ধ'রে আনতে আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে মাসখানেকের মধ্যে বাড়ি একটি ছোটখাট পাগলা-গারদে পরিণত হয়ে গেল। প্রতিদিন সকালবেলা এক থান কাপড়-কাচা সাবান দিয়ে এই পাঁচ-ছটি পাগলাকে স্নান করিয়ে তিনি আপিসে যেতেন। এরা খেয়ে-দেয়ে বাইরে চরতে যেত আর সেই সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরত। এদের অঙ্গে প্রায়ই শতছিন্ন ধুতি জামা থাকত। বাবা কোন্ জন্মে সরকারী বনবিভাগ ও তারপরে চা-বাগানে চাকরি করেছিলেন। সেই সময়কার পেণ্ট্‌লান ও অদ্ভুত অদ্ভুত সব জামা একটা কাঠের সিন্দুকে জমা ছিল। সেই সব জামা ও পেণ্ট্‌লান এতদিন পরে এই পাগলদের অঙ্গে চড়তে লাগল।

দু-তিনজন পাগল সন্ধ্যে হ'লেই গুটিগুটি বাড়ি ফিরে আসত আর জন দুয়েক প্রায়ই ফিরত না। বাবা আপিস থেকে বাড়িতে ফিরেই তাদের খোঁজ করতেন আর তারা তখনও ফেরে নি শুনে তক্ষুনি বেরিয়ে যেতেন তাদের খোঁজে। সারা শহর ঘুরে কোনদিন ছাতাওয়ালা গলি, কোনদিন বা সার্পেনটাইন লেন থেকে তাদের আবিষ্কার ক'রে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে আনতেন। এই ভাবে চলতে চলতে এক এক ক'রে

তিনজন পাগল কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, আর তাদের খোঁজ পাওয়া গেল না।

যে দুজন পাগল আমাদের বাড়িতে থেকে গেল, তারা হাঙ্গামা কিছু করত না, বরং এদের নিয়ে আমাদের বেশ আমোদেই দিন কাটত। এদের মধ্যে একজনের অভিনয় করবার ও গান গাইবার বাতিক ছিল। মধ্যে মধ্যে যেদিন তার ওপর নটরাজ ভর করতেন, সেদিন সে সারারাত চীৎকার করতে থাকত। আর একজনের ছিল লঙ্কা খাওয়ার বাতিক। আমরা তাকে প্রতিদিন লুকিয়ে আট-দশটা কাঁচা লঙ্কা দিতুম, আর সে আমাদের সামনেই সেগুলোকে কচকচ ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত।

সে সময়ে আমাদের বাড়িতে অমূল্য ও বিনোদ নামে দুটি ছেলে থাকত। অমূল্যকে বাবা কোথায় একটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সে বেচারী রাত থাকতে উঠে বেরিয়ে যেত আর ফিরত বেলা বারোটায়। বিনোদ ইস্কুলে পড়ত। কি কারণে জানি না, গাইয়ে ও লঙ্কাবিলাসী দুই পাগলাই অমূল্যকে দেখলেই ক্ষেপে যেত।

সেদিন, কি জানি কেন, লঙ্কাবিলাসী পাগলা খাবার সময় আমাদের রাঁধুনীর ওপর চ'টে গিয়ে ভাতের থালা, জলের ঘটি ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিলে। গাইয়ে পাশে ব'সেই খাচ্ছিল। জুড়িদারের সাড়া পেয়ে সেও খাওয়া ছেড়ে রাঁধুনীকে দমাদ্দম মারতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মা কাছেই ছিলেন, তাঁর ধমক-ধামকে তারা একটু শান্ত হয়েছিল, এমন সময় অমূল্য কাজ থেকে ফিরে এল। তাকে দেখেই লঙ্কাবিলাসী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে মাকে বঁটি নিয়ে তাড়া করলে। অমূল্য কোন রকমে মাকে রক্ষা করলে বটে, কিন্তু তারা ভাতের হাঁড়ি আর যা কিছু খাবার ছিল সব নষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে, মার খাওয়া পর্যন্ত হয় নি।

সমস্ত কাহিনীটি ব'লে মা জিজ্ঞাসা করলেন, তুই লতুদের ওখানে খেলি বুঝি?

ছিলেন না। সেইজন্যে এই সব কাঠের আসবাবগুলো একতলার একটা অন্ধকার ঘরে অনাদৃত অবস্থায় প'ড়ে থাকত। অন্যান্য আরও অপ্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে এই ঘরে কতকগুলো বড় টিনের বাক্সও থাকত। বাক্সগুলোর মধ্যে যে কি রত্ন ভরা আছে, তা জানবার কৌতূহলও আমাদের কোনদিন হয় নি। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দুপুরবেলায় এই বাক্সগুলো খুলে দেখলুম, দুটি বাক্স একেবারে বইয়ে ভরা। ওপরেই একখানা ছোট্ট বই ছিল, সেখানা তুলে দেখলুম—কবিতার বই। নাম—'ফুলের মালা'।

'ফুলের মালা' কার কাব্য, তা আজ মনে নেই। অবিশ্যি মনে রাখবার মতন কবিতাও তাতে ছিল না। তবুও আমাদের যেসব কবিতা ইস্কুলে পড়া হত, 'ফুলের মালা'র কবিতা তার চেয়ে ভাল লাগল। পরের দিন লোভে লোভে নির্জন দুপুরে সেই ঘরে হানা দিয়ে আবার বাক্স খুললুম। এই দিন রত্ন আবিষ্কার করলুম। এই বাক্সের মধ্যে থেকে বার করলুম বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' প্রথম সংস্করণ, রমেশ দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ,' আর একখানা উপন্যাস—নাম তার 'পল্লীগ্রাম', পাতা ছেঁড়া থাকায় লেখকের নাম পাই নি। অবনীন্দ্রনাথের একখানা 'ক্ষীরের পুতুল', মাইকেল ও হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও শশিশেখরের ছেঁড়া কবিতা-সংগ্রহের বই।

কবিতার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় কবিতার বইগুলো আগে পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলুম। যদিও সে বয়সে কবিতার সম্পূর্ণ রস অনুভব করা সম্ভব নয়, তবুও আমার রসানুভূতি হয়েছিল—এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি।

সেই আমার নিঃসঙ্গ একক মানস-জীবন হঠাৎ একটা নতুন চেতনায় সচকিত হয়ে উঠল। অতি দুঃখময় দৈনিক ব্যবহারিক জীবনকে

অতিক্রম ক'রে আমি একটা আনন্দময় রাজ্যে প্রবেশ করলুম। তার তুলনায় ইস্কুলের শাস্তি, বাবার প্রহার ও অন্যান্য কঠোর নিয়ম, যা দিয়ে আমাদের দেহ-মনকে সংযত করবার চেষ্টা করা হ'ত, তা অতি হীন ও অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হতে লাগল। কোথাও কিছু কষ্ট পেলে তখুনি আমার মনে হ'ত এই কবিতার বইগুলোর কথা, কষ্টের কথা আর মনে থাকত না। কতদিন, কত দুঃখে যে আমায় সান্ত্বনা দিয়েছে এই কাব্যগুলি, তার আর শেষ নেই। তারা না থাকলে আমি যে কি করতুম, তা আজও ভেবে পাই না।

সেই বাল্যকাল থেকে আজ অবধি এই কাব্যলক্ষ্মীই আমার উপাস্য। পাছে আমার মানসীর মর্যাদা রক্ষা করতে না পারি, সেজন্য কবিতা লেখবার চেষ্টা কখনও করি নি। আমার অন্তরের অক্ষয় কাব্যকুঞ্জে নিরন্তর যে কবিতা-কুসুম ফোটে, অতি সন্তর্পণে সেগুলি চয়ন ক'রে কাব্যলক্ষ্মীর চরণে নিবেদন করি। সে ফুল দিয়ে মালা গাঁথবার সাহস হয় না, পাছে অনিপুণ সূচীর আঘাতে তারা ম্লান হয়ে যায়।

তারপরে 'চন্দ্রশেখর' ও 'মাধবীকঙ্কণ' আমার সে রাজত্বের মধ্যে সমারোহ এনে দিলে। কখনও গঙ্গার অগাধ জলে শৈবলিনীর সঙ্গে সাঁতার কাটি আর বলি, শৈবলিনী সই।

শৈবলিনীর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ শুনতে পাই—প্রতাপ, আজি এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?

—চাঁদের না সই, সূর্য উঠিয়াছে—

আবার কখনও চ'লে যাই রাজপুতানার মরুস্থানে একলিঙ্গের মন্দিরে, সুন্দরী জুলেখা আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে, কখনও বা হেমলতার করুণ অনুনয় কানে এসে বাজতে থাকে—নরেন্দ্র, ওটি উন্মোচন কর।

চণ্ডীদাসের শ্রীমতী থেকে আরম্ভ ক'রে জুলেখা অবধি সকলকেই ভাল-বাসি,—কারুকে ছাড়তে পারি না, সবাই আমার প্রিয়তমা।

কাব্যের রাজত্বে এসে আমি যেন বেঁচে গেলুম। বাঁদরের কিচি-মিচিকে ইংরেজীতে কি বলে তা শিখতে পারলুম না বটে, কিন্তু কত লোকের, কত দেশের, মানব-হৃদয়ের কত বিচিত্র অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল, যার তুলনায় ইস্কুলের পড়া অতি তুচ্ছ মনে হতে লাগল।

এই বইগুলি ছিল আমার মার। কেমন ভাবে কি ক'রে তিনি এগুলিকে সংগ্রহ করেছিলেন, তা জানি না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের ওপরেই এগুলিকে নষ্ট হয়ে যেতে দেখেছি।

উত্তরকালে নিজে বহু অর্থব্যয়ে অনেক বই কিনেছি। ধ্বংসের দূতেরা নানা মূর্তিতে এসে তাদের নষ্ট ক'রে দিয়েছে, তার জন্যে মনে আমার কোনও ক্ষোভ নেই। কিন্তু শৈশবে সেই আলো-আবছায়াপূর্ণ ঘরের একটি কোণে একদিন যাদের সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হয়েছিল, যাদের সঙ্গীত আমার হৃদয়তন্ত্রীতে প্রথম ঝঙ্কার জাগিয়ে তুলেছিল, আজ বিদায়বেলায় তাদের স্মৃতি আমাকে আকুল ক'রে তোলে।

* * *

একবার, তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। ইস্কুল পুরনো হয়ে গিয়েছে। সেখানকার শাস্তি-টাস্তিগুলোও ধাতস্থ হয়ে এসেছে। সত্য-মিথ্যাতে ভেদাভেদ প্রায় ঘুচে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কয়েকখানা উপন্যাস শেষ ক'রে ফেলেছি। কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাওয়ানো বঙ্কিমচন্দ্রের উচিত হয়েছে কি না, তাই নিয়ে প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে গোপনে আলোচনাও হয়। আমার এই বন্ধুটির নাম প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রভাত হচ্ছে বিখ্যাত 'অবলাবান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক, ভারতসভার অন্যতম

প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র। আমার বয়স তখন নয়, প্রভাত আমার চেয়ে আট-ন মাসের ছোট। কিন্তু এসব বিষয়ে সে আমারই মতন পরিপক্ক ছিল। সে যে সেই বয়সেই কত লোক ও বইয়ের নাম জানত, তা ভাবলে এখন বিস্মিত হই। প্রভাতের মা ছিলেন সে যুগের বিলেত-ফেরত ডাক্তার। এই সবের জন্যে সে সময়ে তাদের বাড়িতে একটা উঁচু সংস্কৃতির আবহাওয়া ছিল। সে তাদের বাড়ি থেকে সব বই নিয়ে আসত, আর আমরা দুই বন্ধুতে লুকিয়ে এক জায়গায় ব'সে পড়তুম আর মশগুল হয়ে যেতুম।

দিনগুলি বেড়ে কাটছে, এই রকম একটা সময়ে একদিন ইস্কুলে গিয়ে খেলছি, এমন সময়ে একটি মেয়ে আমার কাছে এসে বললে, তুমি অমুকের যে তিন পয়সা নিয়েছ, দিয়ে দাও।

কি সর্বনাশ! চার বছর ইস্কুলে ঢুকছি, এই চার বছরের মধ্যে আমার নামে সত্য-মিথ্যা সম্ভব-অসম্ভব অনেক রকমের অভিযোগই এসেছে, কিন্তু এটা একেবারেই নতুন।

আমি তো তার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

বললুম, আমি তো ওর পয়সা নিই নি।

নাও নি কি রকম! আমি নিজের চোখে দেখেছি, ওর খাতা থেকে তুমি পয়সা বের ক'রে নিলে।

রেগে-মেগে বললুম, নিয়েছি তো নিয়েছি, বেশ করেছি। যাও, কি করবে করগে।

ক্লাস বসামাত্র মেয়ে দুটি গিয়ে শিক্ষয়িত্রীকে আমার নামে পয়সা-চুরির নালিশ করলে।

শিক্ষয়িত্রী আমাকে ডাকলেন। ইনি ছিলেন বিধবা, ঘাড়-ছাঁটা চুল। কথা এক রকম চুষে চুষে উচ্চারণ করতেন, যা আজ পর্যন্ত কারুর

মুখে শুনি নি। তাঁর মুখনিঃসৃত প্রতি বাক্যে দুটি 'ভগবান', ও তিনটি 'ঈশ্বরে'র উল্লেখ থাকত।

আমি পয়সা নিয়েছি কি না, সে কথা একবার জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও তিনি বোধ করলেন না। কাছে যেতেই শুরু করলেন, ঈশ্বর তোমার সুমতি দিন। স্থবির, আমি নিয়ত তোমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে সুমতি দিন। সেদিন তুমি মিথ্যে কথা ব'লে ধরা পড়লে, আজ আবার চুরি ক'রে ধরা পড়েছ। আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, তোমার জন্য ফাঁসিকাঠ তৈরি হচ্ছে। চুরির পরেই নরহত্যা এবং নরহত্যার পরই ফাঁসি। আমাদের দেশে আগে এবং সেদিন পর্যন্তও বিলেতে চুরি করলে ফাঁসি হ'ত। যাও, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, আর ওর পয়সা ফেরত দিয়ে দাও।

আমি বললুম, ওর পয়সা আমি নিই নি, ওর পয়সা কোথায় ছিল, তাও আমি জানি না। আমি ইস্কুলে এসে ক্লাসে বই রেখেই খেলতে চ'লে গিয়েছিলুম।

আমার নামে যে মেয়েটি নালিশ করেছিল, তার নাম ক'রে শিক্ষয়িত্রী বললেন, অমুক কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে না।

আমি বললুম, আমি পয়সা নিই নি।

শিক্ষয়িত্রী ছাড়লেন না। তিনি সমস্ত ঘণ্টা ধ'রে আমাকে দিয়ে সেই তিন পয়সা চুরির কবুল করাবার চেষ্টা করতে লাগলেন ও যার পয়সা তাকে ফেরত দেবার জন্যে জেদ করতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

আমি পয়সা নিই নি তো ফেরত দোব কোথা থেকে! কাছে পয়সা ছিলও না, আমি পকেট দেখালুম।

কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। ঘণ্টা কাবার হয়ে যাওয়ায় অন্য একজন শিক্ষক এলেন পড়াতে। তিনি তাঁকে চেয়ার ছেড়ে দিয়ে

আমাকে নিয়ে চললেন বাইরে। ইস্কুলের এক নির্জন কোণে আমাকে নিয়ে গিয়ে কবুল করাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ওই মহিলাটি ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ-ঘরের বিধবা। স্বামীটি বোধ হয় এঁরই জেরার ঠেলায় কিংবা অশেষ পুণ্যবলের অধিকারী হওয়ায় এঁর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। অভাগার সে পুণ্যবল ছিল না ব'লেই এই কাহিনী লিখতে হচ্ছে।

চার ঘণ্টা ধ'রে সমানে সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি আমায় কবুল করাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। লণ্ডনের বিখ্যাত 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে' যেসব দুধর্ষ বদমাইস কিছুতেই অপরাধ স্বীকার করে না, তাদের আটচল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে এই ভাবে কবুল করাবার চেষ্টা করা হয়। সাংঘাতিক চরিত্রের ঘাগী লোকেরা এই প্রণালীর চাপে কাবু হয়ে পড়ে। আমার ওপর চার ঘণ্টা এই 'থার্ড 'ডিগ্রী' প্রয়োগ করার পর স্রেফ তাঁর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে ব'লে ফেললুম, হ্যাঁ, নিয়েছি।

এ পয়সা কিন্তু আমি নিই নি। তার অস্তিত্ব ও লয় সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান তখনও ছিল না, আজও নেই।

রুশোর মতন আমিও বলতে পারি, মহাবিচারের পরমক্ষণে এই জাতক আমি ঈশ্বরের সামনে ফেলে দিয়ে বলব, হে সৃষ্টিকর্তা, এর মধ্যে কার্যে কিংবা মনে কোনও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি কি না, তা তুমি জান। কিন্তু রুশোর ধর্মশাস্ত্রে মহাবিচারের দিন আছে, আমার ধর্মে তা নেই। সে আমার প্রাপ্য কর্মফল। আমাকে যারা লাঞ্ছিত করেছিল, তাদের জন্যে সেই ফল তোলা রইল।

আমার কবুলতি শুনে তাঁর মুখে সে কি খুশির হাসি! সে হাসি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। তিনি বললেন, আজ বাড়ি যাও। কাল তিনটে পয়সা এনে ওকে দিয়ে দিও।

সমস্ত দিন মনের ওপর এই অত্যাচারে আমি একেবারে ঝিমিয়ে পড়লুম। বাড়িতে এসে কোন রকমে নাকে-মুখে চাট্টি গুঁজে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম কাব্যলক্ষ্মীর পায়ে।

কবিতার পর কবিতা পড়ি আর কাঁদতে থাকি। এমন সময় অস্থির এসে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে রে ?

অস্থিরকে সব বললুম। সে বেচারী কি করবে! আমার গা ঘেঁষে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

পরের দিন ইস্কুলে যেতেই শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, পয়সা এনেছ ?

পয়সা আনি নি শুনে তিনি আমাকে সব ঘণ্টা অর্থাৎ এগারোটা থেকে সাড়ে তিনটে অবধি দাঁড়িয়ে থাকবার হুকুম দিলেন। সে দিনটা ইস্কুলে সমস্তক্ষণ দাঁড়িয়েই কাটল।

পরের দিনও পয়সা নিয়ে যেতে পারলুম না। ইস্কুলময় চোর বদনাম হয়ে গিয়েছে, সে জন্যে আগে না গিয়ে ইস্কুল বসবার পর ক্লাসে গিয়ে উপস্থিত হলুম। ক্লাসে উপস্থিত হতে না হতে শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, পয়সা এনেছ ?

পয়সা আনি নি শুনে তিনি আমায় সারাদিন বেঞ্চির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকবার হুকুম দিলেন।

অস্থিরের সঙ্গে রোজই পরামর্শ করি, কি ক'রে তিনটে পয়সা যোগাড় করা যায়! মার কাছে চাইলে তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করবেন। ইদানীং দাদা একদিন 'বার্ডসাই' খেয়ে ধরা পড়ায় বাবা কড়া হুকুম দিয়েছিলেন, আমাদের হাতে পয়সা যেন না দেওয়া হয়। বাবার কাছে পয়সা চাওয়া মানে স্বেচ্ছায় আকাশের বজ্রকে মাথার ওপরে নিয়ে আসা। দাদা তখন মুরুব্বি হয়ে গিয়েছে, তাকেও কিছু বলতে পারি

না। ইস্কুলময় ছোট-বড় সকলের কাছেই চোর বদনাম হয়ে গিয়েছে। সেখানে গেলেই নিত্য নূতন অত্যাচার। একদিন শিক্ষয়িত্রী আমাকে বললেন, কাল পয়সা না নিয়ে এলে তোমায় ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

ইস্কুলে অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে বাড়তে আমার মনের অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে, সেদিন বাড়িতে এসে ঠিক ক'রে ফেললুম, কাল ইস্কুল থেকে বাড়িতে না ফিরে হেদোয় গিয়ে লাফিয়ে পড়ব। মনের এই সংকল্প অস্থিরকে পর্যন্ত জানালুম না, কি জানি, সে যদি কান্নাকাটি করে!

কিন্তু তেতলার ছাদ থেকে পড়বার সময় যে নিজের দেহ দিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিল, অগাধ জলে ঢেউ হয়ে আমার দেহকে দোলা দিতে দিতে যে আমায় অকূল থেকে কূলে এনে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গিয়েছিল, এবারেও সে অভাবনীয়রূপে আমাকে নিশ্চিত মরণ থেকে বাঁচিয়ে দিলে।

পরের দিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই শুনতে পেলুম, আমাদের চাকরটার এক চুরি ধরা পড়ায় মা খুব বকাবকি শুরু করেছেন। আমি সেখানে যেতেই মা চাকরকে বললেন, আজ থেকে আর তোমাকে বাজারে যেতে হবে না।

চা খেতে খেতে মা বললেন, স্থবিরে, আজ তুই বাজারে যেতে পারবি?

আচ্ছা মা।

আমার গলা থেকে অত্যন্ত ক্ষীণ আওয়াজ বেরুল। কাল সারা রাত ভাল ক'রে ঘুমুতে পারি নি। ইস্কুল থেকে তাড়িত হওয়া ও তার পরে হেদোয় লাফ খাওয়া, এই সব চিন্তায় মন একেই দ'মে ছিল, তার ওপরে শোবার আগে মাইকেলের 'আত্মবিলাপ' অন্তত পঁচিশ বার পড়া

হয়েছে। মাথার মধ্যে পাগলের করুণ কান্না চলেছে—'জীবন প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায় ফিরাব কেমনে'। নিরাশায় দেহ-মন অবসন্ন, কথাবার্তা বলতে আর ভাল লাগছিল না।

মা আমার মুখের দিকে চেয়েই বললেন, কি রে, তোর অসুখ করেছে নাকি? দেখি, এদিকে আয় তো।

কাছে যেতেই মা মুখে বুকে হাত দিয়ে দেখে বললেন, কই না, গা তো হিম।

তারপর আমার মুখের দিকে স্নেহসিক্ত নয়নে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আমায় জড়িয়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন, মাঝে মাঝে তোর কি হয় বল্ তো? কি ভাবিস?

মার কাছ থেকে এমন আদর অনেকদিন পাই নি। ঠিক সেই তালে তিন পয়সা কেন, হয়তো তাঁর কাছ থেকে তিন আনা আদায় ক'রে নিতে পারতুম। কিন্তু সেই মুহূর্তটা আমার মনে এমন একটা অনির্বচনীয় আনন্দের আভাস নিয়ে এল যে, পয়সা চাওয়ার কথা মনেই এল না। উদ্গত অশ্রুকে প্রাণপণে রুদ্ধ ক'রে গায়ের জোরে মাকে জড়িয়ে ধ'রে আস্তে আস্তে বললুম, আমার সঙ্গে অস্থিরও যাবে মা বাজারে?

মা বললেন, বেশ তো, দু ভায়ে যা।

পড়াশুনো তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলা গেল।

বাজারে কি কি জিনিস কিনতে হবে, তারই একটা ফিরিস্তি লিখে হিসেব ক'রে মা পয়সা দিলেন।

বাজারের দিকে চলতে চলতে অস্থির বললে, স্থবিরে!

কি রে?

কিছু ভাবিস নি। তিন পয়সা যোগাড় ক'রে ফেলেছি।

কোথেকে রে?

দেখ্ না তুই।

বাজারে ঢোকবার আগেই অস্থির দু পয়সার ফলুসা কিনে ফেললে। তার অর্ধেক আমাকে দিয়ে বাকি অর্ধেক নিজে খেতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

অস্থিরের অসমসাহসিকতা দেখে বিস্ময় ও আনন্দে মন ভ'রে উঠতে লাগল। তারপরে সমস্ত বাজার শেষ ক'রে হিসাব নিয়ে দেখা গেল, পাঁচটি পয়সা লাভ হয়েছে। দু পয়সা আগেই ফলুসা খাওয়া হয়েছে, তিনটি পয়সা আমায় দিয়ে সে বললে, দিয়ে দিস ইস্কুলে।

সে যাত্রা বেঁচে গেলুম। শুধু তাই নয়, সেই দিন থেকে অনেকদিন পর্যন্ত আমরা দু ভায়ে চাকরবাকর দিয়ে বাজার করানোর ঘোর বিরোধিতা করেছি। আমাদের চাইতে চাকরেরা ঢের সস্তায় ঢের ভাল জিনিস আনতে পারে, তা হাতে হাতে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত বাজার করবার গুরু কর্তব্যভার দুই ভাই নির্বিকার চিত্তে বহন করেছি।

এই সূত্রে আর একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। তখন ইউরোপে সবেমাত্র মহাসমর শুরু হয়েছে। একদিন শুনলুম, আমাদের একটি চেনা ছেলে 'অ্যাম্বুলেন্স কোরে' নাম লিখিয়েছে। খবরটা সত্য কি না জানবার জন্যে এক রবিবারে সকালবেলা তাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছি, এমন সময় নারীকণ্ঠের আহ্বান শুনতে পেলুম, স্থবিরবাবু, স্থবির, ওরে স্থব্‌রে, শুনছিস? ওরে, শুনতে পেলি?

যে বাড়ি থেকে ডাক আসছিল, সে আমার চেনা বাড়ি হ'লেও এমন ক'রে ডাকবার সেখানে কেউ থাকত না। আমি খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিলুম, ফিরে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে খুঁজছি, এমন সময় একতলার জানলার গরাদে মুখ দিয়ে একটি নারী বললে, কি রে, এই যে আমি, ভেতরে আয়।

আমি রকের ওপরে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম, সে সুবর্ণ। এরই পয়সা-চুরির মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে একদিন আমাকে নাজেহাল হতে হয়েছিল।

আমি কাছে যেতেই সে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল, কি রে, আমায় চিনতে পারছিস না? আমি সুবর্ণ। তুই স্থবির তো, কেমন আছিস?

বললুম, ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?

এই ভাই, আমাকে এরা দরজা বন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছে, খেতে দেয় না। রোজ মারে আমাকে, তুই ভেতরে আয় না, অনেক কথা আছে।

সুবর্ণর কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও কথাবার্তার হালচাল দেখে বেশ বুঝতে পারলুম, তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। যে বাড়ির ঘরে সে ছিল, তারা আমার পরিচিত লোক, তাদের সঙ্গে সুবর্ণদের যে আত্মীয়তা আছে তাও আমি জানতুম। আমি রকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম, কি করা যায়!

ভেতর থেকে সুবর্ণ চীৎকার করতে লাগল, কি দাঁড়িয়ে আছিস উল্লুকের মত! ভেতরে আয়।

বাল্যসখীর এমন আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলুম না। বললুম, দাঁড়া, যাচ্ছি।

দরজা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়তেই বাড়ির কর্তা এসে দরজা খুলে দিলেন। সুবর্ণ ওদিকে সমানে চেঁচিয়ে যেতে লাগল, ওদের সঙ্গে কথা বলিস নি, ওরা সব শত্রু, তুই সোজা ভেতরে চ'লে আয়।

আমি বললুম, সুবর্ণর সঙ্গে একবার দেখা করব।

তিনি আমাকে ইশারায় জানালেন যে, সুবর্ণর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তা হোক। আমার ভয় নেই, আমরা ছেলেবেলায় একসঙ্গে পড়েছি, আমায় কিচ্ছু বলবে না।

কর্তা ভালমানুষ। চাবি নিয়ে এসে সুবর্ণর দরজার তালা খুলে চাবিটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, যাবার সময় দরজায় তালা দিয়ে চাবিটি বাড়ির ভেতরে দিয়ে যেও!

আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতেই সুবর্ণ দরজায় খিল লাগিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, ওখানে ব'স্।

বসতে বসতে বললুম, বল্ কি বলবি? ডাকছিলি কেন?

আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সে শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার চাউনি দেখে আমার ভয় হতে লাগল। মনে হ'ল, পাগলের ঘরে বাহাদুরি ক'রে ঢুকে একটা হাঙ্গামায় পড়লুম নাকি?

সুবর্ণ বললে, এরা আমার কি দুর্দশা করেছে, দেখেছিস?

তার কথার মধ্যে উন্মত্ততার লেশমাত্র ছিল না। ছেলেবেলায় দেখতে সে সুন্দরই ছিল। রঙ ছিল বেশ ফরসা, মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। বাপের অবস্থা বেশ ভাল। একটু খামখেয়ালি ছিল বটে, তবে আমরা সেটা বড়লোকি চাল ব'লে মনে করতুম। তার সেই রঙ মলিন হয়ে গেছে, মাথার চুল রুক্ষ, স্নানাভাবে প্রায় জটা বেঁধে গেছে। তাকে দেখে আমার দুঃখ হতে লাগল। পনরো-ষোলো বছর আগেকার ইস্কুলের জীবন মনের মধ্যে ঝকমক ক'রে উঠল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমার জীবনে কত অভিজ্ঞতা, কত দুঃখ বিপদ এসেছে, আমি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত আছি। আমার বাল্যসঙ্গী ও সঙ্গিনীদের কথা তো কখনও মনে হয় নি! তারা কি সকলে সুখে আছে?

সুবর্ণ ব'লে যেতে লাগল, রাশি রাশি অভিযোগ। তাকে খেতে

দেওয়া হয় না, পরতে দেওয়া হয় না, এমন কি তাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে দেয় না।

একটু রসিকতা করবার প্রলোভন সামলাতে পারলুম না। বললুম, বিয়ে করিস নি সুবর্ণ। দেখছিস না, আমিও বিয়ে করি নি।

সুবর্ণ বললে, তোকে আর কে বিয়ে করবে বল্‌?

একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি যে, মস্তিষ্কবিকৃতি না ঘটলে লৌকিকতার কোনও মর্যাদা না রেখে বেপরোয়াভাবে সত্য-প্রকাশের ক্ষমতা হয় না।

সুবর্ণ বললে, তুই আমায় উদ্ধার ক'রে নিয়ে চল্‌।

বললুম, আমার বাড়িতে গিয়ে থাকবি?

না, কারুর বাড়িতে থাকব না।

তবে?

আলাদা একটা বাড়ি ভাড়া কর্‌। একটা ঠাকুর ও একটা ঝি থাকবে। আর কেউ না।

সে যা হিসাব দিলে, তাতে মাসে তখনকার দিনে দুশো টাকার কম হবে না। বললুম, কিন্তু আমি অত টাকা পাব কোথায়? আমি সামান্য রোজগার করি। তোর অত খরচ চালাব কি ক'রে?

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলে, তুই কত টাকা রোজগার করিস?

তখন আমি চৌরঙ্গীর একটা দোকানে ফুটবল পাম্প করি, খদ্দেরদের পায়ে ফুটবলের জুতো পরানো ও ফিতে বাঁধবার চাকরি। সকাল সাড়ে নটা থেকে রাত আটটা অবধি এই কাজ করি। মাইনে ত্রিশ টাকা। সাহেব খদ্দের ব'লে কোট-প্যাণ্ট পরতে হয়, তার খরচ মাসে পনেরো টাকা, ট্রামের খরচা পাঁচ টাকা আর দশ টাকা সিগ্রারেট-খরচ।

খাওয়া-শোওয়া চলে বাপের হোটেলে। তবুও লৌকিকতা রক্ষার খাতিরে সুবর্ণকে বললুম, একশো টাকা মাইনে পাই।

সুবর্ণ বললে, মোটে একশো! তা হ'লে তো তোর বড় কষ্ট! আচ্ছা, তা হ'লে আমিই খরচ দোব, তুই আমায় নিয়ে চল্। কত খরচ হবে?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তোর কাছে কত টাকা আছে?

আমার কাছে অনেক টাকা আছে।

কথাটা ব'লেই সে দৌড়ে আমার কাছে চ'লে এল। আমি যে চেয়ারে ব'সে ছিলুম, ঠিক তার পাশেই ছোট চার-কোণা টেবিলের ওপরে একটা ছোট্ট হাতবাক্স ছিল। টপ ক'রে সেটা তুলে নিয়ে সে খাটের ওপরে গিয়ে ব'সে বললে, আর একটু হ'লেই গিয়েছিল আর কি! তুই তো আবার চোর কিনা! মনে আছে, আমার পয়সা চুরি করেছিলি?

বিস্মৃতির প্রলেপে যে ক্ষত শুকিয়ে গিয়েছিল, এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে আবার তা থেকে রক্তধারা ছুটল। মুহূর্তের মধ্যে মন আমার ফিরে গেল বাল্যের সেই অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতামণ্ডিত দিনগুলির মধ্যে। সেদিনকার সেই অসহায় স্থবির শর্মার ওপর বর্তমান স্থবির শর্মার সহানুভূতি হতে লাগল।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলে, কি রে, রাগ করলি? তুই কাঁদছিস বুঝি?

না, কাঁদছি না, কিন্তু সেই যে তোর তিন পয়সা—আমি নিই নি।

তবে কে নিলে?

তা আমি জানি না। তবুও তোরা মিছিমিছি চোর বদনাম দিয়ে আমাকে কি নাকাল করেছিলি, মনে আছে?

সুবর্ণ হো-হো ক'রে হেসে উঠল। একেবারে পাগলের হাসি।

মনে পড়ল, সুবর্ণ তো পাগল হয়ে গিয়েছে, তবে আর তার সঙ্গে এসব আলোচনায় লাভ কি ?

সুবর্ণ বললে, তুই নিজেই তো স্বীকার করেছিলি যে, পয়সা তুই নিয়েছিস।

সে তোদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। আর আমি তো তোকে তিনটে পয়সা দিয়ে দিয়েছিলুম, কেন, সে কথাটি মনে নেই বুঝি ?

মনে আছে।—ব'লেই সুবর্ণ বাক্সটা খুলে তিনটে পয়সা বের ক'রে আমার কাছে এসে বললে, নে তোর পয়সা।

রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ'লে যাচ্ছিল। সুবর্ণর হাতখানা দৃঢ়ভাবে সরিয়ে দিয়ে বললুম, যা যা, যে পয়সা দিয়ে দিয়েছি, তা ফিরিয়ে নিয়ে কালীঘাটের কুকুর হতে চাই না।

সুবর্ণ স্থির হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর অতি করুণ সুরে বললে, তবে ?

আমার রাগ তখনও যায় নি। মুখ তুলে বললুম, তবে কি ?

তবে তুই এখান থেকে আমাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবি নি ?

দেখলুম, তার দুই চোখ জলে ভ'রে উঠেছে।

আহা! পাগলের চোখে জল যে দেখেছে, সেই জানে। বললুম, না রে, না, আমি এতক্ষণ চালাকি করছিলুম। দেখ্ না, ঠিক তোকে এখান থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাব। বাড়িটা আগে ঠিক করি।

সুবর্ণ ফিসফিস ক'রে বললে, তা হ'লে রাত্রিবেলা এসে চুপিচুপি ওই জানলায় আমায় ডাকবি, আমি পালিয়ে যাব। চাবিটা তোর কাছে আছে তো ?

পরদিন থেকে এক নতুন খেলা শুরু হ'ল। রোজ রাত্রি আটটা-নটার সময় একবার সুবর্ণর জানলায় গিয়ে তাকে ব'লে আসতে লাগলুম,

বাড়ি ঠিক হয়ে গিয়েছে, কাল আসবাবের অর্ডার দোব, ভাল রাঁধবার লোক পাচ্ছি না, ইত্যাদি।

আমাদের উদ্ধার-উদ্ধার খেলা যখন বেশ জ'মে উঠেছে, এমন সময় উদ্ধারের পরমকর্তা একদিন এসে তাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে চ'লে গেল।

কথা দিয়ে সুবর্ণকে উদ্ধার করতে পারি নি, এবারের যাত্রায় তার কাছে অপরাধীই হয়ে রইলুম।

প্রতি বছরের শেষে ইস্কুল থেকে দু-চারটি ক'রে ছেলে বয়স হয়ে যাওয়ার জন্যে ছেলেদের ইস্কুলে চ'লে যেত। এদের অভাবে দুঃখ হ'ত বটে, তবুও নিজের জীবনের এই দিনটিকে অত্যন্ত আকুলভাবে ধ্যান করতুম। দাদা বলত, ছেলেদের ইস্কুলে না এলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। ভাবতুম, কবে সেদিন আসবে, কবে হাতের জল শুদ্ধ হবে?

ছ-বছর পরে একদিন সেই শুভমুহূর্ত এল। 'ট্রান্‌স্ফার' নিয়ে আসবার জন্যে বাবা হেডমাস্টারকে চিঠি দিলেন। মাস্টার মশায়ের হাতে চিঠি দিয়ে ইস্কুলের প্রত্যেক ঘরে, প্রতি আনাচে-কানাচে, প্রত্যেক বড় বড় গাছের কাছে গিয়ে বিদায় জানালুম। শেষকালে এক জায়গায় এক কোণে গিয়ে ব'সে রইলুম। এইখানে ব'সে আমি ও প্রভাত প্রায়ই কাব্যচর্চা করতুম। সে মাস ছয়েক আগেই অন্য ইস্কুলে চ'লে গিয়েছিল।

সেখানে ব'সে ব'সে ছ-বছর ইস্কুল-জীবনের কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছবি মনের মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল। এখানে দুঃখ পেয়েছি বটে, কিন্তু সুখও পেয়েছি কম নয়। আস্তে আস্তে উঠে দেওয়ালের গায়ে পেন্‌সিল দিয়ে লিখলুম—

হে ইস্কুল, তোমায় জন্মের মত ছাড়িলাম। বন্ধুকে মনে রেখো ভাই। ইতি স্থবির।

নামটা লেখা তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় একজনের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলুম, এই, ওখানে কি লিখছিস ?

মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, সুলতা।

সুলতা সুন্দর দেখতে ছিল। আমার চেয়ে বছর দুয়ের বড় হবে। ছ-বছর আমরা একসঙ্গে পড়েছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার সঙ্গে খুব বেশি ঝগড়া বা খুব বেশি ভাব কখনও হয় নি। তার কাছে আমি ছিলুম ক্লাসের একটা ছেলে, সেও আমার কাছে প্রায় তাই ছিল বটে, তবে কাব্যচর্চার সময় কল্পনায় কদাচিৎ তার সুন্দর মুখ যে আমার মনে ছায়া ফেলত না, এমন কথা হলপ ক'রে বলতে পারি না। কারণ ইস্কুলের ছোট বড় সব সুন্দর মুখই আমার কল্পলোকে সাজানো থাকত স্তরে স্তরে, যখন যাকে খুশি তাকে নিয়ে কল্পনার পাখায় চ'ড়ে চ'লে যেতুম রামধনুর দেশে।

সুলতা বোধ হয় মনে করেছিল, ইস্কুলের দেওয়ালে আমি কোনও খারাপ কথা কিংবা কোন শত্রুর উদ্দেশে গালাগালি লিখছি। কঠিন মুখ ক'রে এগিয়ে এসে সে লেখাটা পড়তে লাগল।

লেখা প'ড়েই তার মুখ একেবারে নরম হয়ে গেল। সে বললে, তুই বুঝি ইস্কুল ছেড়ে দিচ্ছিস ?

হ্যাঁ।

সত্যি ভাই, এতদিন এক জায়গায় বেশ ছিলুম। কোথায় চ'লে যাবি, আর বোধ হয় আমাদের কথা মনেও থাকবে না।

সুলতা আমাকে যা বললে এবং যে ভাবে বললে, কোনও বড় মেয়ের মুখে এর আগে আর শুনি নি। বড় মেয়ে মানে তার বয়স তখন বছর তেরো কি চোদ্দ হবে। কথাগুলো আমার কানে যেন মধুবর্ষণ করলে।

সুলতার কথার কি জবাব দোব, তা বেশিক্ষণ ভাবতে হ'ল না। তখন আমরা মাইকেল হেম নবীন বঙ্কিমচন্দ্র রমেশ দত্ত, হরিদাসের গুপ্তকথা, মেরী প্রাইস ও বৈষ্ণব কবিদের 'অথরিটি'। মনের মধ্যে কাব্যসমুদ্র থইথই করছে।

সুলতাকে বললুম, তোমাদের কখনও ভুলব না। সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যে আনন্দে আমার এতদিন কাটল, তা কি ভোলবার? আমি ভুলব না, কিন্তু তোমরা বোধ হয় ভুলে যাবে আমাকে।

সুলতার চোখে ততক্ষণে জল এসে গেছে। আবেগে সে আমার একখানা হাত ধ'রে বললে, আমি তোকে কক্ষনো ভুলব না, তুইই আমাকে ভুলে যাবি।

আমি বললুম, কক্ষনো না, তোকে আমি কক্ষনো ভুলব না।

সুলতা বললে, ইস্কুল ছেড়ে দিচ্ছিস তো কি হয়েছে? কাল থেকে রোজ আমাদের বাড়ি আসবি। বল্, আসবি?

বললুম, আসব।

প্রতিজ্ঞা কর্।

প্রতিজ্ঞা।

প্রথম জ্ঞানের আলো যেখানে পেয়েছি, কত দুঃখ-আনন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমার জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্ক যেখানে অভিনীত হয়েছে, সেই ইস্কুল, বিদায়, চির-বিদায়!

মেয়েদের ইস্কুল ছেড়ে আমি আর অস্থির ভর্তি হলুম ডফ সায়েবের ইস্কুলে। নিমতলাঘাট স্ট্রীটে যে থামওয়ালা বাড়িতে এখন জোড়াবাগান পুলিস-ঘাঁটি হয়েছে, সেই বাড়িতে ছিল ডফ কলেজ। হেদোর ধারের জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন ও ডফ কলেজ মিলে হয়েছে এখনকার স্কটিশ চার্চ কলেজ।

আমাদের সমাজের এক ভদ্রলোক এখানকার শিক্ষক ছিলেন। এঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারেব বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায় বাবা আমাদের ডফ ইস্কুলে ভর্তি ক রে দিলেন।

মেয়েদের ইস্কুল থেকে এখানে এসে একবারে হকচকিয়ে গেলুম। সেখানে যতই অত্যাচার হোক, তার মধ্যে কেমন একটা ঘরোয়া আবহাওয়া ছিল। এখানে তার ঠিক উল্টো। এখানে প্রকাণ্ড বাড়ি, বড় বড় ঘর, এক এক ক্লাসে একশো দেড়শো ছেলে। আর সেসব কি ছেলে! খারাপ কথা আমরা দুটো চারটে শিখেছিলুম, কিন্তু ন মাসে ছ মাসে অতি সন্তর্পণে বন্ধুমহল ছাড়া তা উচ্চাবণ করতে সাহস হ'ত না। এখানে দেখলুম, ছেলেরা দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে চীৎকাব ক'রে একতলার বন্ধুদের সঙ্গে সেই ভাষায় আলাপচারী করছে। তার ওপরে নানা মেজাজের মাস্টার, এক-একটি যেন যমদূত। ঠেঙিয়ে মেরে ফেললেও 'আহা' বলবার কেউ নেই।

দেখে-শুনে এমন ভড়কে গেলুম যে, মাস দুয়েক মুখ দিয়ে আর বাক্যি বেরুল না। ইস্কুলে গিয়ে একটি কোণে চুপ ক'রে ব'সে থাকতুম আর ছুটি হ'লে গুটিগুটি বাড়ি চ'লে আসতুম।

আমাদের সময়ে ইস্কুল একটা বিষম স্থান ছিল। মফস্বলের অনেক ইস্কুলের সুনাম তখন ছিল বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

আমার নেই'। কলকাতার পাঁচ-ছটি ইস্কুলে বিদ্যাভ্যাস করবার সুযোগ আমার হয়েছে, এ সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

আজকাল যেমন ইস্কুলে 'স্ট্যাণ্ডার্ড' হয়েছে, তেমনই আমাদের সময়ে এক-একটি শ্রেণীকে 'ক্লাস' বলা হ'ত। সর্বোচ্চ শ্রেণী ছিল 'ফার্স্ট' ক্লাস' ও সর্বনিম্ন শ্রেণী ছিল 'নাইন্থ ক্লাস'। এই নবমশ্রেণী আবার A B C এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। অর্থাৎ যদি কোন্ ছেলে নবম শ্রেণীর C বিভাগে ভর্তি হ'ত, তা হ'লে তার প্রথম শ্রেণীতে আসতে এগারোটি বছর লাগত। এর মধ্যে আমরা শিখতুম কতকগুলো ইংরেজী কথার মানে, তৃতীয় শ্রেণীর জনকয়েক ইংরেজের বানানো জীবন-কথা, ইংলণ্ডের ইতিহাসের খানিকটা, অর্ধেক মিথ্যে ও অর্ধেক ভুলে ভরা একখানা ভারতবর্ষের ইতিহাস, কিছু ভূগোল, ইউক্লিডের জ্যামিতির চার ভাগ, অ্যাল্‌জেব্রার কিছু, এরিথমেটিকের কিছু, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটা গল্প। আমাদের সময়ে ছেলেদের ইস্কুলে বাংলা পড়ানো হ'ত না বললেও অত্যুক্তি হয় না।

জীবনের এই এগারোটি বছর ছাত্রদের কি মাঠেই মারা যায়, তা বোঝবার মত অবস্থাও এ শিক্ষায় হয় না। না হ'লে কবে এই নীতির প্রচলন বন্ধ হয়ে যেত। এই দশ-এগারো বছর সময়ের মধ্যে যে কোন ছেলে যে কোন একটা বিশেষ বিদ্যা অনুশীলন করলে সে বিষয়ে সে পণ্ডিত হয়ে যেতে পারে। অন্য যে সব জ্ঞান না থাকলে সংসারে চলা অসম্ভব, সে শিক্ষা তারা কানে শুনে আয়ত্ত করতে পারে। মহা-মহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক বা দার্শনিক যিনি—তিনি নিশ্চয় জানেন পৃথিবী গোল, এবং হিসাবেও যে তাঁরা নিতান্ত কাঁচা নন, তার প্রমাণ দিলে বড় বড় অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ লজ্জায় মাথা হেঁট করবেন।

কোথায় কোন্ দেশে জর্জ-ওয়াশিংটন তার বাপকে কি সত্য কথা

বলেছিল, নেল্‌সন নামক এক ইংরেজ বীর বাল্যকালে তার ঠাকুরমার মুখের ওপর কি জ্যাঠামো করেছিল, তার সঠিক বিবরণে ভুল করলে এ দেশের বালকদের পৃষ্ঠ বেত্রাঘাতে জর্জরিত হতে থাকল কোন্ ন্যায় বা যুক্তি অনুসারে? অথচ শঙ্কর, কুমারিল, কলূহন বা বাচস্পতি মিশ্র কে ছিল জিজ্ঞাসা করলে দেশে হাহাকার উঠবে, এই বা কোন্ ন্যায় বা যুক্তি অনুসারে?

পরাধীনতা-কীট যে আমাদের জাতীয় জীবনের মূল জর্জরিত করছে, কাকে দোষ দিই! জাতক শুরু করা যাক।—

মেয়েদের ইস্কুল যখন ছাড়ি, তখন দুঃখ হয়েছিল বটে; কিন্তু তার পেছনে একটু আনন্দও ছিল—এতদিন বাদে হাতের জল শুদ্ধ হবে, আর কেউ বলতে পারবে না যে, ছেলেটা মেয়েদের ইস্কুলে পড়ে। নিঃসঙ্কোচে বলতে পারব, ডফ কলেজে পড়ি। কিন্তু এখানে এসেই বুঝতে পারলুম, সে ইস্কুল ঢের ভাল ছিল। যদিও এখানে পড়াশোনার বালাই মোটেই ছিল না, সে দিক দিয়ে একেবারে নিরঙ্কুশ ছিলুম বললেই হয়।

আমাদের ক্লাসে ছিল একশোর চেয়ে বেশি ছেলে। সকলের পড়া-নেওয়া রোজ সম্ভব হ'ত না, পঁচিশ-ত্রিশজনের পড়া হতে না হতেই ঘণ্টা কাবার হয়ে যেত। পাঁচ ঘণ্টায় পাঁচজন মাস্টার আসতেন, তাঁদের এক-একজনের মেজাজ এক-এক রকমের। এঁদের দু-একজন মধ্যে মধ্যে এমন সব কথা বলতেন, যা শিক্ষক তো দূরের কথা, সে রকম অসভ্য কথা এ পর্যন্ত আমার শ্রুতিগোচর হয় নি। কথায় কথায় বেত্রাঘাত, এবং মাঝে মাঝে ক্লাসশুদ্ধ ছেলেকে পাইকারী হিসাবে ঠেঙানো হ'ত—সে ঘণ্টায় শুধু হল্লোড়, পড়াশুনা কিছুই হ'ত না। এর ওপরে আবার সপ্তাহে দু-তিন দিন ক'রে আসতেন

টমরী সাহেব। এই টমরীর পুরো নাম ছিল আলেকজাণ্ডার টমরী। লোকটা জাত্যংশে বোধ হয় ইহুদী ছিলেন, কিন্তু বিলিতী। বেঁটেসেটে দেখতে, দু গালে গালপাট্টা। এ ব্যক্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' ছিলেন। ডফ কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা ছিল তাঁর ব্যবসা। টমরী ক্লাসে ঢুকেই বাংলা ভাষায় জিজ্ঞাসা করতেন, মাস্টার মহাশয়, কোনও বদমাইস ছেলে আছে, যাকে বেত্রাঘাত করা প্রয়োজন?

সেই মাস্টারের যে যে ছেলের ওপর রাগ থাকত, তাকে তাকে সায়েবের সঙ্গে যেতে হ'ত। টমরী এই রকম ক্লাসে ক্লাসে ঘুরে ছেলে যোগাড় ক'রে নিয়ে হলঘরে গিয়ে তাদের বেত্রাঘাত করতেন। তাদের চীৎকার ক্লাসে ব'সে শুনতুম আর আমাদের অঙ্গে কালঘাম ছুটত।

ইস্কুলের ছাত্ররা প্রায় সকলেই টমরীকে যমের মতন ভয় করত। এখানকার অন্যান্য প্রত্যেক শিক্ষকই, এমন কি যিনি বাইবেল পড়াতেন তিনি পর্যন্ত, টমরী সায়েবের এক-একটি ছোট সংস্করণ ছিলেন। আর টমরীর অবতার যিনি ছিলেন, তিনিই হচ্ছেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু—যিনি আমাদের সেখানে ভর্তি করিয়েছিলেন। এখানেও কাঞ্চন-কৌলিন্য প্রথা খুবই প্রবল ছিল। আমাদের সঙ্গে কলকাতার নামজাদা বড়লোক-ঘরের দশ-বারোটি ছেলে পড়ত। এরা মাস্টারদের মুখের ওপরেই বলত, টমরী সায়েব আমাকে মেরে দেখুক না, কত বড় বাপের ব্যাটা একেবারে বুঝিয়ে দোব।

বেশ বোঝা যেত, শিক্ষকরা তাদের কথা শুনেও শুনতেন না।

আমাদের এই পারিবারিক বন্ধুটির নাম ছিল শ্যামবাবু। ইনি সারাদিন ক্লাসে ক্লাসে অর্থাৎ নিজের ক্লাস ছেড়ে অন্য মাস্টারদের ক্লাসে ছেলে ঠেঙিয়ে বেড়াতেন। এই রকম ঠেঙাতে ঠেঙাতে মধ্যে মধ্যে

তাঁর খুন চেপে যেত। এঁর হাতে মার খাওয়ার ফলে অনেক ছেলেকে দু-চারজন বন্ধুর ওপরে ভর দিয়ে বাড়ি ফিরতে দেখেছি।

আমাদের ক্লাসে জ্ঞান ঘোষ আর সুরেশ্বর মুখুজ্জের মধ্যে একদিন টিফিনের ছুটির সময় মহা ঝগড়া বেধে গেল। তারা দুজনেই ছিল আহিরীটোলার ছেলে। আহিরীটোলার ছেলে বলতে কি বোঝায়, এখানকার লোকদের কাছে সেটা পরিষ্কার ক'রে বলা প্রয়োজন।

আমাদের ছেলেবেলায় নিজ কলকাতা শহব ও তার আশেপাশেব ছন্দোর মধ্যে বোধ হয় ছয় লক্ষের বেশি লোক বাস করত না। নিজ শহর কতকগুলো পাড়ায় বিভক্ত ছিল। খানিকটা ক'রে জায়গা নিয়ে হ'ত এক-একটা পাড়া, যেমন—আহিরীটোলা, জোড়াসাঁকো, বাগবাজার, বেনেটোলা, নেবুতলা, চোরবাগান, ঝামাপুকুর, দর্জিপাড়া, কাঁসারীপাড়া, জানবাজার, শুঁড়িপাড়া, ঢুলিপাড়া, মুচিপাড়া, গড়পাড ইত্যাদি। পাড়ার প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা 'বাধ্যতামূলক' সম্প্রীতি থাকত। এক পাড়ার লোক অন্য পাড়ায় গিয়ে প্রহৃত বা অপমানিত হ'লে সমস্ত পাড়ার লোক অপমানিত বোধ করত। এই নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুন-জখম পর্যন্ত প্রায়ই হতে থাকত। পাড়ার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা যে না করত, পাড়ার মধ্যে সে ব্যক্তি প্রায় অপাংক্তেয় হ'ত। প্রত্যেক পাড়াতেই একটা ক'রে কুস্তি ও জিমন্যাস্টিকের আখড়া, থিয়েটারের একটি ক্লাব, আর যেখানে শৌখিন বড়লোক থাকত সেখানে একটি শখের যাত্রার দল থাকত। একটি ক'রে হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভাও অনেক পাড়ায় ছিল। সে সময় আহিরীটোলার খুবই নামডাক ছিল। শুনতুম, আহিরিটোলায় নাকি এমন পাঁচ-সাত জন আছে, যারা বেমালুম ছুরি মারতে পারে। বেমালুম ছুরি মারা মানে—ছুরি যখন মারা হবে, তখন কিছুই জানতে পারা যাবে না।

মারামারির পর বাড়ি ফিরে গিয়ে টের পাওয়া যাবে। অনেকটা স্নান করতে গিয়ে হাঙরে পা কেটে নেওয়ার মতন।

জ্ঞান আর সুরেশ্বরে যখন ঝগড়া লাগল, তখন আহিরীটোলার অন্য যেসব ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ত, তারা থামাবার চেষ্টা করলে। পাড়ার বদনাম হবে ভয় দেখানোতে সুরেশ্বর চুপ ক'রে গেল; কিন্তু জ্ঞান তাকে শাসাতে লাগল, তোমায় এক্ষুনি মজা দেখিয়ে দিচ্ছি।

জ্ঞান ঘোষকে কেউ থামাতে পারলে না, সে সুরেশ্বরকে শাসাতে শাসাতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

টিফিনের ছুটি শেষ হয়ে যাবার পর পণ্ডিত মহাশয় আমাদের সংস্কৃত পড়াচ্ছেন, এমন সময় শ্যামবাবু ক্লাসে ঢুকলেন, হাতে তাঁর আড়াই হাত লম্বা একখানা বেত, পেছনে জ্ঞান ঘোষ।

শ্যাম মাস্টার ঘরে ঢুকেই দাঁতে দাঁত চেপে এক বিকট চীৎকার ক'রে হাঁকলেন, কোথায় সুরেশ্বর, এদিকে এস।

সুরেশ্বর উঠে দু-এক পা অগ্রসর হতে না হতে শ্যামবাবু এক রকম ছুটে এসে গায়ের জোরে তাকে এক ঘা বেত মারলেন। শ্যামবাবু লোকটা ছিলেন আকাট ষণ্ডা।

হঠাৎ ওই ভাবে আক্রান্ত হয়ে সুরেশ্বর প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপরে সে তারস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। শ্যামবাবু বেত চালাতে লাগলেন সাঁই সাঁই সাঁই—সাপের নিশ্বাসের মতন; আর সুরেশ্বর মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে চীৎকার করতে লাগল—মাস্টার মশায়, আর না,—মাস্টার মশায়, আর না,—আপনার পায়ে পড়ি, আর না।

ক্লাসসুদ্ধ ছেলের মুখ বেদনায় বিকৃত হয়ে উঠল।

শ্যামচন্দ্রের বিরাম নেই। তিনি সমানে বেত চালাতে লাগলেন

আর বলতে লাগলেন, থিয়েটার করা হয়, কেমন? এই যে থিয়েটার হচ্ছে, কেমন পার্ট হচ্ছে? কেমন গান গাইছ?

এ রকম নিষ্ঠুর পরিহাস জীবনে অল্পই দেখেছি। মার খেতে খেতে সুরেশ্বর যখন বেদম হয়ে পড়ল, তখন শ্যামবাবু জ্ঞান ঘোষকে বললেন, আবার যদি কখনও থিয়েটার করে তো আমায় ব'লে দেবে।

জ্ঞান ঘাড় নাড়লে।

শ্যামচন্দ্র গটগট ক'রে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। দু-তিনটি ছেলে সুরেশ্বরকে মাটি থেকে তুলে তার জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে। সুরেশ্বর পাশ ফিরে দেওয়ালে হেলান দিয়ে কাঁদতে লাগল।

অন্য মাস্টারের ক্লাসে ঢুকে শ্যামবাবু এই কীর্তি ক'রে গেলেন, কিন্তু তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করবাও প্রয়োজন বোধ করলেন না। পণ্ডিত মশায়ের আত্মসম্মানে এজন্য বোধ হয় কিঞ্চিৎ আঘাত লাগল।

শ্যাম মাস্টার চ'লে যাবার পর ক্লাসের থমথমানি ভাবটা যখন একটু কেটেছে অর্থাৎ ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস ক'রে শ্যাম মাস্টারের বংশবৃদ্ধি করছে, এমন সময় পণ্ডিত মশায় সুর ক'রে ডাক ছাড়লেন, জ্ঞান ঘোষ!

আজ্ঞে স্যার?

এদিকে এস।

জ্ঞান নিজের জায়গা ছেড়ে গটগট ক'রে পণ্ডিত মশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পণ্ডিত মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পদবী ঘোষ না?

হ্যাঁ, স্যার।

কি ঘোষ তোমরা? গয়লা ঘোষ, না, কায়েত ঘোষ?

কায়েত ঘোষ স্যার।

কায়েতের তো বাপু এমন ব্যবহার হয় না। বাড়িতে একটু ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রো তো। আমার মনে হচ্ছে, তোমরা গয়লা ঘোষ।

আমাদের সঙ্গে তিন-চারটি গয়লা ছেলে পড়ত। তাদের মধ্যে সত্যকিঙ্কর ঘোষদের বড় দুধের কারবার ছিল। সত্যকিঙ্করও আহিরীটোলার ছেলে। সেই বয়সেই কুস্তি-টুস্তি ক'রে, ঘি-দুধ খেয়ে চেহারাখানাকে দেখবার মতন ক'রে তুলেছিল। পণ্ডিত মশায়ের কথা শুনে সত্যকিঙ্কর তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আমাদের জাতে অমন ছেলে হ'লে একবার দেখিয়ে দিতুম স্যার।

পণ্ডিত মশায় আর কথা না বাড়িয়ে জ্ঞানকে বললেন, যাও নিজের জায়গায়।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শ্যামামাস্টারের উদ্দেশ্যে বললেন, বেস্ম কিনা, থিয়েটারের নাম শুনলেই লাফিয়ে ওঠে।

ব্যাপারটা কিন্তু এইখানেই শেষ হ'ল না। সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একদিনও শ্যাম মাস্টার কোন না কোনও ছুতোয় আমাদের ক্লাসে এসে সুরেশ্বরকে পিটে যেতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে এক শনিবারে কি একটা উপলক্ষ্যে সুরেশ্বরদের পাড়ায় অভিনয় হওয়ায় সে অভিনয় করেছিল। শ্যাম মাস্টার অন্য ক্লাসের আহিরীটোলার ছেলেদের কাছে নিত্য সুরেশ্বরের খবরাখবর করতেন। এদের কাছ থেকেই বোধ হয় সেদিনের অভিনয়ের খবর পেয়ে প্রথম ঘণ্টাতেই এসে তিনি সুরেশ্বরকে প্রহার আরম্ভ করলেন। সুরেশ্বর প্রথম দু-চার মিনিট চীৎকার করলে, মাস্টার মশায়, আর না। তারপরে মাটিতে প'ড়ে গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

তার ওপরেই বেত চলতে লাগল—সপাসপ।

আমাদের সঙ্গে সূর্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি ছেলে পড়ত। বেশ গোলগাল প্রিয়দর্শন ছেলেটি, গলায় বাবুদের মতন চাদর ঝুলিয়ে কোঁচার খুঁটটি উল্টে কোমরে গুঁজে সে মুরুব্বির মতন ইস্কুলে আসত। এখনকার মতন কুঁচকি অবধি তোলা হাফ-প্যান্ট, হাত-কাটা শার্ট ও পায়ে চপ্পল প'রে ইস্কুলে যাওয়া আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। যাক, আমাদের এই সূর্যির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ব'লে আমরা তার সব রকম মুরুব্বিয়ানাই সহ্য করতুম। কিন্তু ঐ বয়সে বিয়ে হওয়ার জন্যে বাল্যবিবাহবিরোধী ব্রাহ্ম শ্যাম মাস্টার সূর্যির ওপরে হাড়চটা ছিলেন। সেদিন সূর্যির ওপরে বোধ হয় রাহুর দৃষ্টি পড়েছিল, তাই সুরেশ্বরের দুর্দশা দেখে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সহপাঠীর সেই মর্মভেদী চীৎকার শুনে আমাদের সবার চোখই জলে ভ'রে উঠেছিল, তবে সূর্যির গলা দিয়ে আওয়াজ বের হতেই শ্যাম মাস্টারের নজর পড়ল তার দিকে। বেত আপসাতে আপসাতে তিনি সূর্যির দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তোমার কি হ'ল? বন্ধুর দুঃখে একেবারে গ'লে গিয়েছ, না? বিদ্যাসাগর মশায় হয়েছ, কেমন?

এই ব'লেই সূর্যির ওপর সপাসপ বেত হাঁকড়াতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। সূর্যি বেচারা অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হয়ে প্রথমটা একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, তারপরে পরিত্রাহি চীৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামও চীৎকার করতে লাগলেন, বিয়ে করা হয়েছে, কেমন? বন্ধুর জন্যে বড় দরদ, না? বন্ধুর দুঃখের ভাগ একটু নাও, কেমন লাগছে?

যে মাস্টারের ঘণ্টায় এই পাশবিক জলসা চলছিল, তিনি শেষকালে আর সহ্য করতে না পেরে মাঝে প'ড়ে বললেন, শ্যামবাবু, যেতে দিন, খুব শিক্ষা হয়েছে।

সে সময়ে আমাদের ইস্কুলে প্রত্যেক ঘণ্টার শেষে পাঁচ মিনিটের জন্যে ছুটি হ'ত। এই পাঁচ মিনিটের অবকাশ কেন যে দেওয়া হ'ত জানি না, কিন্তু এর জন্যে অশান্তির সীমা ছিল না। ঘণ্টা বাজা মাত্র ক্লাসের অধিকাংশ ছেলেই হৈ-হৈ ক'রে বেরিয়ে যেত, কেউ কেউ মাঠে গিয়ে খেলাও জুড়ে দিত। ক্লাসে যারা থাকত, তারা চীৎকার ক'রে গল্প তর্ক অথবা ঝগড়া করতে থাকত। পাঁচ মিনিট পরে যখন ক্লাস বসবার ঘণ্টা বাজত, তখন সব ছেলে ক্লাসে এসে জুটতে ও ছেলেদের তর্ক বা ঝগড়া থামতে যেত পনরো মিনিট সময়। এজন্যে প্রায় প্রতিদিনই প্রত্যেক ঘণ্টা আরম্ভের সময় ছিল একটা সঙ্কটকাল। প্রায় সব মাস্টার, জন দুয়েক ছাড়া, পাইকারী হিসাবে সব ছেলের ওপর দিয়েই এলোপাতাড়ি একবার বেত চালিয়ে যেতেন। পরে সবাই প্রকৃতিস্থ হ'লে তবে পড়া শুরু হ'ত।

ঘণ্টা বাজতেই মাস্টার ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুরেশ্বর তখনও মেঝেয় প'ড়ে গোঁ-গোঁ করছে। আহিরীটোলার ছেলেরা, বোধ হয় দশ-বারোজন হবে, তার মধ্যে সুরেশ্বরের পরম শত্রু জ্ঞান ঘোষও ছিল, সবাই মিলে সুরেশ্বরকে তুলে বাইরে নিয়ে গেল।

সেদিন সুরেশ্বর ফিরলই না। তার বন্ধুদের মধ্যে তিন-চারজন সেই শেষের ঘণ্টায় এসে সবার বই নিয়ে চ'লে গেল।

পরের দিনও সুরেশ্বর এল না। সত্যকিঙ্করকে তার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, সুরেশ্বর কাল আসবে, আজ একটা মজা হবে কি না।

কি মজা হবে রে?

আজ শ্যাম মাস্টারের বাপের বিয়ে দেখানো হবে।

সে কি রে?

দেখিস না আজ ছুটির পর।

ছুটি অবধি সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম। ইতিমধ্যে ইস্কুলময় র'টে গেল, আজ আহিরীটোলার ছেলেরা শ্যাম মাস্টারকে মারবে। শ্যাম মাস্টারও নিশ্চয় সে কথা শুনেছিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু গ্রাহ্য করলেন না। তাঁর শরীরে শক্তিও ছিল, সাহসও ছিল।

চারটের সময় ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে ছেলেরা অনেকেই অপেক্ষা করতে লাগল, ব্যাপারটা কি হয় দেখবার জন্যে। মিনিট পাঁচেক বাদে শ্যাম মাস্টার ইস্কুল থেকে বেরিয়ে গটগট ক'রে বিডন স্ট্রীটের দিকে এগিয়ে চললেন। তখনও বোধ হয় গেট থেকে পঞ্চাশ গজ দূরেও যান নি, এমন সময় গলি থেকে গোটা আষ্টেক জোয়ান জোয়ান লোক বেরিয়ে তাঁর সামনে এসেই নাকে মারলে এক ঘুষি।

শ্যামবাবুর নাক দিয়ে ঝরঝর ক'রে রক্ত ঝরতে লাগল। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কোঁচাটা তুলে নাকে চেপে ধরতেই একজন বললে, শালা, সুরেশ্বরকে অমন ক'রে ঠেঙিয়েছিস কেন রে?

বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তাঁর গালের এক খামচা দাড়ি শক্ত ক'রে ধ'রে টানতে আরম্ভ ক'রে দিলে। শ্যামবাবু তখুনি তাকে জাপটে ধরলেন, তারপরে দুজনে লেগে গেল ঝুলপিটোপিটি। হঠাৎ লোকটা কি এক প্যাঁচ মারলে যাতে শ্যামবাবুর সেই পৌণে তিন মণ দেহখানা শূন্যে একবার ডিগ্‌বাজি খেয়ে রাস্তার ওপরে চিত হয়ে পড়ল। তারপরে সবাই মিলে তাঁকে এলোপাতাড়ি পিটতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

যা হোক, সেই অসম যুদ্ধের নিখুঁত বিবরণ দেবার দরকার নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, মিনিট পনরোর মধ্যেই শ্যাম মাস্টারকে একেবারে রাম মাস্টারের মত দেখাতে লাগল। আততায়ীরা মারধোর ক'রে বেশ ধীরে সুস্থে চ'লে গেল। যাবার সময় একজন চেঁচিয়ে তাঁকে

বললে, ফের যদি কোনদিন শুনি যে সুরেশ্বরকে মেরেছ, তা হ'লে বাপের বিয়ে দেখিয়ে দোব।

আমরা তো শুনে চমকে উঠলুম, বাবা! আজকের উৎসবটি তা হ'লে আইবুড়োভাত, বিয়েতে এর চেয়েও সমারোহ হবে!

আমরা তিন ভাই ও আমার বাল্যবন্ধু পরিতোষ (ব্রাহ্ম হওয়া ও শ্যামবাবুর সঙ্গে তাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা থাকায় সেও ডফ কলেজে পড়ত)—এই চারজনে শ্যামবাবুকে সাহায্য করতে লাগলুম। তাঁর সে সময়কার অদ্ভুত চেহারার একটু বর্ণনা করি। তাঁর ডান চোখটা একেবারে বুজে গেছে, ভুরু ফুলে কি রকমে চোখের ওপরে এসে ঝুলে পড়েছে; ডান গালের বেশ খানিকটা জায়গায় দাড়ি নেই, উপড়ে নেওয়ার দরুন লোমকূপসমূহে রক্তবিন্দু জমাট হয়ে আছে। নাকটা এমন ফুলেছে যে, নাসারন্ধ্র দুটি শির্যকভাবে ঠোঁটের ওপরে এসে পড়েছে। মিনিট কয়েকের মধ্যে তারা শ্যাম মাস্টারের নলচে খোল একেবারে বদলে দিয়ে তো চ'লে গেল, আমরা চারজনে তাঁকে তুলে ধ'রে একখানা থার্ড ক্লাস গাড়ি ভাড়া ক'রে বাড়ি পৌঁছে দিলুম।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে চারজনেই একবাক্যে সুরেশ্বরকে বাহবা দিয়ে মত প্রকাশ করলুম, বেশ হয়েছে।

শ্যামবাবুর কাছে চোরের মার খেয়ে সুরেশ্বরের অভিনয়প্রীতি ছুটে গিয়েছিল কি না, অথবা সুরেশ্বরের নিযুক্ত লোকদের হাতে সাতচোরের মার হজম ক'রে অভিনয়ের প্রতি শ্যামের অনুরাগ বেড়েছিল কি না, তা জানি না। তবে সে দিন তো মনে হয়েইছিল এবং সেই ঘটনার প্রায় চল্লিশ বছর পর আজও মনে হচ্ছে, সুরেশ্বর ঠিকই করেছিল। সে যদি নিজে শ্যামবাবুকে প্রহার দিত কিংবা তার পাড়ার ছেলেরা যখন তাঁকে ঠেঙাচ্ছিল সে সময় অন্তত সে যদি উপস্থিত

থাকত, তা হ'লে ব্যাপারটি সর্বাঙ্গসুন্দর হ'ত। ঘটনাস্থলে সুরেশ্বরের অনুপস্থিতিতে ঘটনাটির অঙ্গহানি হয়েছিল।

শ্যাম-সুরেশ্বরের কাহিনীটি পূর্বাপর বিচার ক'রে দেখলে মন্দ হয় না।

শ্যামবাবু ও সুরেশ্বরের সম্পর্ক গুরুশিষ্যের। অবশ্য গুরুশিষ্য বলতে আমাদের মনে স্বতই যে ছবি ফুটে ওঠে, সে সম্পর্ক নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে ছিল না। সুরেশ্বর শ্যামের বাড়িতে বাস করত না অথবা তাঁর অন্নও সে খেত না। সুরেশ্বরের সুখ দুঃখ—ভবিষ্যতের কোনও চিন্তাই শ্যামবাবু নিশ্চয়ই করতেন না। সুরেশ্বর পড়ত এক ক্রীশ্চান ইস্কুলে মাসিক দেড় টাকা মাইনে দিয়ে, শ্যামবাবু সেখানে ষাট টাকার বেতন-ভোগী শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে এই সূক্ষ্ম গুরুশিষ্য সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলেও সুরেশ্বর যে শ্রেণীতে পড়ত, শ্যামবাবু সেই শ্রেণীতে অধ্যাপনা করতেন না। কাজেই গুরুশিষ্য সম্পর্কের কোন প্রশ্নই এ ক্ষেত্রে উঠতে পারে না।

ইস্কুলের বিধি অনুসারে পড়া না ক'রে এলে, শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে ছাত্রকে দণ্ডভোগ করতে হ'ত। ইস্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে অথবা ক্লাসের মধ্যে কোন অশিষ্টাচরণ করলে ছাত্রদের প্রতি শাস্তিবিধান করা হ'ত। কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর ছাত্ররা ইস্কুলের বাইরেও সিগারেট খেলে ইস্কুলে তাদের শাস্তি দেওয়া হ'ত এবং তাদের বাড়ির অভিভাবকদের জানানো হ'ত,—যদিও শিক্ষকেরা প্রায় প্রত্যেকে কোন না কোন প্রকার ধূমপানে অভ্যস্ত ছিলেন। ধূমপান করাকে পরস্ত্রী অপহরণ অথবা ইস্কুলের বিবেচনায় অন্যান্য পাপকার্যের মতন যে মনে করা হ'ত না, তার প্রমাণস্বরূপ ইস্কুলের কর্তৃপক্ষই শিক্ষকদের ধূমপান করবার জন্যে একটা আলাদা ঘর নির্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন।

ইস্কুলের দণ্ডবিধির মধ্যে পড়তে পারে এমন কোন অপরাধে সুরেশ্বর

সে ক্ষেত্রে অপরাধী ছিল না। সুরেশ্বর ছিল হিন্দু এবং সে পড়ত ক্রীশ্চানদের ইস্কুলে। হিন্দু অথবা ক্রীশ্চান কোনও সম্প্রদায়ের নীতি-শাস্ত্রে অভিনয় করায় বাধা নেই। সুরেশ্বর যে অভিনয় করে, সে কথা তার অভিভাবকেরা জানত ; শুধু অভিভাবকেরা নয়, তাদের থিয়েটারের ক্লাব পাড়াতেই ছিল, অর্থাৎ তার প্রতিবেশীরাও জানত। এ ক্ষেত্রে আমরা ধ'রে নিতে পারি যে, এ বিষয়ে তার বাড়ির লোকদের সম্পূর্ণ মতও ছিল। ভাল অভিনয় করতে পারত ব'লে নিজের বাড়িতে, পাড়ায় এবং ইস্কুলে তার খাতির-প্রতিপত্তিও ছিল।

সে সময়ে সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজে একদল লোক ছিলেন, যাঁরা থিয়েটারের নাম শুনলে তেলে-বেগুনে জ'লে উঠতেন। শ্যাম মাস্টার ছিলেন এই দলের লোক। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য অভিনয় করা সম্বন্ধে মতামত পোষণ করবার অধিকার আছে। এই সম্পর্কে শ্যাম মাস্টারের মতামতের সঙ্গে সুরেশ্বরের মতামতের অনৈক্য ঘটায় শ্যামবাবুর ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল।

এখন দেখা যাক, রাগ হয় কেন? আমাদের দর্শন এক জায়গায় বলেছেন যে, ইচ্ছার বিরোধিতা ঘটলেই ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং ক্রোধের উৎপত্তি হ'লেই বিরোধিতার কারণের প্রতি দ্বেষ জন্মে এবং দ্বেষ হ'লেই সেই কারণের প্রতি প্রতিহিংসা নেবার প্রবৃত্তি জাগে। এই প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই শ্যাম মাস্টার সুরেশ্বরকে প্রহার দিয়েছিলেন।

ছাত্রকে নির্মমরূপে প্রহার করার প্রথা ক্রীশ্চান-কালের মধ্যযুগে বর্বরদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অন্যান্য অনেক বর্বর প্রথার মত এই প্রথাও দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এসেছে বটে, কিন্তু বিবেকী লোক নির্বিচারে সকল প্রথা গ্রহণ করেন না। এই হিসাবে শ্যামবাবু অবিবেকী ও বর্বর ছিলেন।

শ্যামবাবু যখন সুরেশ্বরকে মেরেছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয় জানতেন যে, সুরেশ্বর উল্টে তাঁকে মারতে পারবে না। যেমন অনেক মনিব চাকর ঠেঙায় এই ভেবে যে, চাকর উল্টে তাকে ঠেঙাতে পারবে না। এই মনোভাব কাপুরুষের। এই দিক দিয়ে শ্যামবাবু ছিলেন কাপুরুষ।

প্রহারের আবার তারতম্য আছে। শ্যামবাবু সপ্তাহে অন্তত একদিন এসে সুরেশ্বরকে ঠেঙিয়ে যেতেন এবং শেষদিনে তাকে অমানুষিক আঘাত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বারো-তেরো বছর বয়সের সুরেশ্বর যখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল, শ্যামবাবু তখন নির্দয় শ্লেষবাক্যে তাকে জর্জরিত করেছিলেন। এই দিক দিয়ে শ্যামবাবু ছিলেন অমানুষ ও নির্দয়।

তার ওপরে ব্যবহারতত্ত্বের একটি প্রধান সূত্র হচ্ছে, নির্যাতনকারীকে দণ্ড না দিলে তার নির্যাতন করার প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি বর্বর, কাপুরুষ, নির্দয় ও অমানুষ, তাকে সিধে করতে হ'লে উঠতে বসতে প্রহার দেওয়া উচিত। সুরেশ্বর হৃদয়বান, তাঁকে একদিন মেরেই ছেড়ে দিয়েছিল।

পরের দিন শ্যামবাবু ও সুরেশ্বর উভয়েরই অন্তর্ধান। তার পরের দিন সুরেশ্বর এল ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে। দ্বিতীয় ঘণ্টায় টমরী সাহেব নিজে এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমরা ভাবলুম, সুরেশ্বরের সুরলীলা বুঝি আজই শেষ হ'ল। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে সে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে আবার ক্লাসে ফিরে এল।

শুনলুম, তাদের পাড়ার কে কে শ্যামকে পিটেছিল, টমরী তাদের নাম জানতে চেয়েছিল। কিন্তু সুরেশ্বর বলেছে, সেদিনকার সে ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। দু দিন সে শয্যাশায়ী ছিল, তার পায়ের একখানা হাড় ভেঙে গিয়েছে, এজন্যে তার বাবা ইস্কুলের কর্তৃপক্ষের নামে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মকদ্দমা রুজু করবেন।

সুরেশ্বরের মুখে এই কথা শুনে টমরীর চক্ষু চড়কগাছে উঠে গিয়েছে। টমরী তাকে অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা ব'লে সমস্ত ব্যাপারটার জন্যে দুঃখ প্রকাশ ক'রে তার বাবাকে চিঠি দিয়েছেন।

সে পকেট থেকে বার ক'রে একখানা খামে-ভরা চিঠি আমাদের দেখালে।

পরের দিন শ্যামবাবু ইস্কুলে এলেন। তাঁর ভুরুর ফুলোটা অনেক কম, নাক স্বাভাবিক আকার, ডান গালের মাঝখানে খানিকটা জায়গায় দাড়ি নেই, সেখানে লাল মতন কি লাগানো।

সত্যকিঙ্কর বললে, ব্যাটা গালে টিরেন্‌চ্যাণ্ডাইন লাগিয়েছে।

শ্যাম-সুরেশ্বরের কাহিনী শেষ হ'ল। সে বছর শ্যামবাবু আর আমাদের ক্লাসে পদার্পণ করেন নি।

এবার মধুসূদন-কথা শুরু করি।

আমাদের সময়ে অনেক ছেলে নর্ম্যাল পাস ক'রে ইংরেজী ইস্কুলে ভর্তি হ'ত। নর্ম্যাল পাস করতে যতদিন সময় যেত, ততদিনে ইংরেজী ইস্কুলের ছাত্ররা তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে যেত। কিন্তু নর্ম্যাল-পাস ছাত্রদের ইংরেজী ইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হ'ত না। বেচারারা সব বিষয়েই আমাদের চেয়ে ঢের বেশি জানত, শুধু ইংরেজী কম জানত ব'লে তাদের প্রতি এই শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। নর্ম্যাল পাস করা এমন অনেক ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ত, যাদের বয়েস পনরো-ষোলো কিংবা তার চাইতেও বেশি। মধুসূদন ছিল এই দলের।

মধু করত কুস্তি। ওই বয়সেই তার চেহারাটি একটি ছোটখাট পালোয়ানের মত দেখতে ছিল। মেজাজ ছিল তার অতি অমায়িক। কোন ছেলের সঙ্গে তার অবনিবনা ছিল না। আমরা তিন-চারজন মিলে তার হাতের গুলিতে ঘুষো মারতুম আর সে হা-হা ক'রে হাসতে

থাকত। মধুসূদনের আর একটি মহৎ গুণ ছিল যে, সে সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি—সপ্তাহে এই চার দিন নিয়ম ক'রে ইস্কুল কামাই করত। শুক্রবার ইস্কুল বসলেই মধুসূদনের বিচার হ'ত এবং তার ফলে সেদিন হয় ক্লাসের মাস্টারের কাছে, নয় তো টমরীর কাছ থেকে তাকে ঘা তিনেক বেত্রাঘাত সহ্য করতে হ'ত। এ ব্যাপার আমাদের ক্লাসে একটা নিয়মের মতন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

মধুকে আমরা জিজ্ঞাসা করতুম, এমন ক'রে ইস্কুল পালাস কেন ?

মধু বলত, ধুর, রোজ ইস্কুলে আসতে কি ভাল লাগে ! দুকুরবেলা বেড়ে ঘুরে বেড়াই, কোন দিন চ'লে যাই সেই মেটেবুরুজের নবাব-বাড়ি, কোনদিন যাই নতুন খাল পেরিয়ে বাদায়—দিব্যি শালতি চ'ড়ে বেড়ানো যায়।

ইস্কুল পালিয়ে ঘুরে বেড়ানোর নানা রকম গল্প ব'লে সে আমাদের তাক লাগিয়ে দিত। সত্য-মিথ্যায় মিলিয়ে কত রকমের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প যে সে করত, তার ঠিকানা নেই। এই ভাবে তার গল্প শুনতে শুনতে আমাদের জনকয়েক ছেলের সঙ্গে মধুর ভারি ভাব জ'মে গেল। মধুর নির্দেশমত আমরা বাড়িতে ডন-বৈঠক করতে শুরু ক'রে দিলুম। মাস তিন-চারেকের মধ্যে শরীরের বেশ উন্নতিও দেখা যেতে লাগল। মধু একরকম আমাদের মুরুব্বিই হয়ে দাঁড়াল। সে মাঝে মাঝে আমাদের হাতের গুলি টিপে টিপে দেখত আর বলত, এবার যেদিন অমুক পাড়ার সঙ্গে মারামারি হবে তোদের নিয়ে যাব।

আমাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবার কিছুকালের মধ্যেই স্রেফ মুরুব্বিয়ানা আর গল্প করবার লোভে মধু ইস্কুল পালানো ছেড়েই দিলে।

একদিন আমাদের ইতিহাসের শিক্ষক প্রিয়বাবুর ঘণ্টায় মধু বেশ গল্প জমিয়েছে, এমন সময় মাস্টার মশায় তাকে কি একটা প্রশ্ন করলেন।

বলা বাহুল্য, মধু সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না। প্রিয়বাবু বললেন, বৃথাই বাপে তোমার নাম দিয়েছে মধুসূদন।

একটু চুপ ক'রে থেকে মাস্টার বললেন মধুসূদন নামে আমাদের দেশে একজন খুব বড় পণ্ডিত ছিল। লোকটা নাটক লিখে এক সময় খুব নাম করেছিল।

একজন ছেলে বললে, মধুসূদন ক্রীশ্চান হয়েছিল স্যার।

হ্যাঁ, ক্রীশ্চান হ'লে কি হবে! শেষকালে সেই হিঁদুর দেবদেবীর ওপরেই তো কবিতা লিখতে হ'ল!

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, ক্রীশ্চান কেন হ'ল স্যার?

প্রিয় মাস্টার বলতে লাগলেন, মোদো তো ক্রীশ্চান হয়ে দেশে গেল। পড়শীদের ডেকে বললে, আমি তোদের জাত ছেড়ে ক্রীশ্চান হয়েছি।

প্রতিবেশীরা বললে, বেশ করেছ বাপ মোদো, জিতা রহো।

কথাটা কানাঘুষো হতে হতে মোদোর মায়ের কানে গিয়ে পৌঁছল। মা বললেন, হ্যাঁ রে মোদো, এ কি শুনছি রে?

মোদো বললে, কি শুনছ মা?

তুই ক্রীশ্চান হ'লি কেন রে?

মোদো বললে, মা, আমার ফেৎ (faith) হয়েছে।

প্রিয় মাস্টারের কথা শেষ হতে না হতে আমাদের মধুসূদন তড়াক ক'রে উঠে বললে, আমারও একটু একটু ফেৎ হচ্ছে স্যার।

ক্লাসসুদ্ধ ছেলে হো-হো ক'রে হেসে উঠল। প্রিয় মাস্টার 'সাইলেন্স' 'সাইলেন্স' ব'লে বার কয়েক চেঁচাতেই ঘর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারপরে ধীর-গম্ভীর স্বরে মধুসূদনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? তোমারও ফেৎ হচ্ছে?

হ্যাঁ স্যার।

প্রিয় মাস্টার মধুরকণ্ঠে ডাকলেন, মনিটার!

সে সময় অক্ষয় নামে একটি ছেলে ছিল মনিটার। অক্ষয় দাঁড়াতেই তিনি হুকুম করলেন, ম্যাপ-পয়েণ্ট।

অক্ষয় ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেল।

এই 'ম্যাপ-পয়েণ্ট' ও 'মনিটার' সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ক্লাসের মধ্যে পাঁচ-ছয়টি ছেলেকে ভাল ছেলে ব'লে বিবেচনা করা হ'ত। এদের মধ্যে দুটি ছেলে সত্যিই ভাল ছিল, কিন্তু বাকিগুলি লেখাপড়া ও অন্যান্য বিদ্যায় আমাদের দলেরই হওয়া সত্ত্বেও কেন যে তারা ভাল ছেলে ব'লে বিবেচিত হ'ত, তা জানি না। এদের মধ্যে পালা ক'রে এক-একজন 'মনিটার' হ'ত। মনিটারের কাজ ছিল বোর্ডের খড়ি ঠিক রাখা, রেজেস্টারি এলে চীৎকার ক'রে নাম ডাকা, মাস্টার আসবার আগে যারা গোলমাল করেছে তাদের নামে নালিশ করা, ভূগোল পাঠের সময় ম্যাপের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেরা ঠিক ম্যাপ দেখাতে পারছে কি না তা শিক্ষককে জানানো ইত্যাদি। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের কন্‌স্টেব্‌লদের মতন এরাও ছিল ক্লাসের কন্‌স্টেব্‌ল। অর্থাৎ এরা কোন ছেলের নামে নালিশ করলে বিপক্ষ তরফের আর কোন কথাই শোনা হ'ত না। এজন্য কোন কোন মনিটারকে মধ্যে মধ্যে ছেলেদের কাছে চাঁটি গাঁট্টা ইত্যাদি খেতে হ'ত।

'ম্যাপ-পয়েণ্ট' বস্তুটি হচ্ছেন বাঁশের লম্বা চেলা, প্রায় তিন সাড়ে তিন হাত লম্বা। সেটিকে বেশ চেঁচে-ছুলে পরিষ্কার করা, একটা দিক ছুঁচলো। মানচিত্রের বরাবে আঙুলের খোঁচা ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ সহ্য করতে পারতেন না ব'লে এই বাঁশের খোঁচা দিয়ে ম্যাপ দেখানো ছিল সেখানকার রীতি। মনিটার ম্যাপের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকত, আর

ছাত্রেরা দূরু থেকে ম্যাপ-পয়েন্টের খোঁচা মেরে দেখিয়ে দিত। ঠিক জায়গাটা দেখানো হচ্ছে কি না, তা ধরবার ভার থাকত মনিটারের ওপরে। আমরা ম্যাপ-পয়েন্ট ধ'রে মানচিত্রের যেখানে সেখানে একটা খোঁচা দিয়ে দিতুম আর মনিটার বলত, ঠিক হয়েছে স্যার।

কেন জানি না, কোন কোন মাস্টার বেতের চাইতে ম্যাপ-পয়েন্ট দিয়ে প্রহার করতে স্ফূর্তি পেতেন বেশি। প্রিয় মাস্টার ছিলেন এই দলের।

অক্ষয় তো হুকুম পেয়ে তড়াক ক'রে লাইব্রেরি থেকে একটা ম্যাপ-পয়েন্ট নিয়ে এল। প্রিয় মাস্টার তাই দিয়ে মধুস্থদনের ফেৎ ছোটাতে আরম্ভ করলেন। ঘা পাঁচ-সাত মারতে না মারতে ম্যাপ-পয়েন্ট ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্রিয় মাস্টার হাঁপাতে হাঁপাতে হুঙ্কার ছাড়লেন, অ্যানাদার ম্যাপ-পয়েন্ট।

অক্ষয় দৌড়ে আর একটা ম্যাপ-পয়েন্ট নিয়ে এল, কিন্তু ঘা কয়েক দিতে না দিতে সেটাও ভেঙে গেল। মধু বললে, কেন ইস্কুলের লোকসান করছেন স্যার, হাত দিয়েই মারুন।

মধুর কথা শুনে মাস্টার মশায় তেলে-বেগুনে জ'লে উঠে গজগজ ক'রে কি বকতে বকতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। শোনা গেল, মধুর নামে টমরীর কাছে লাগাতে গেলেন।

সে দিনটা এমনই গেল, কারণ প্রিয়বাবু একলাই ফিরে এলেন। পরের দিন ক্লাস বসতে না বসতেই টমরী এসে হাজির। তাঁর পেছনে বুড়ো রাজপতি দরোয়ান, তার হাতে দুই মোটা মোটা বেত। মালাক্কা দ্বীপের যে রকম মোটা বেতের লাঠি এ দেশে পাওয়া যায়, সেই রকম এক-মানুষ লম্বা বেত দেখেই তো ভয়ে আমাদের বুকের মধ্যে ঢেঁকি পড়তে লাগল।

টমরী মিনিট দুয়েক ছাত্রদের সবার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে হাঁক ছাড়লেন, মধুসূদন মুখার্জি!

মধু আমাদের কাছেই ব'সে ছিল। ডাক শুনে উঠে দাঁড়াতেই টমরী বললেন, আমার সঙ্গে এস। মধুসূদন সুড়সুড় ক'রে তাঁর পেছন পেছন চ'লে গেল।

মিনিট পনরো বাদে মধুসূদন ফিরে এল। তার ধুতি ও জামায় রক্তের দাগ, চোখ দুটো লাল টকটকে, কিন্তু তাতে এক ফোঁটাও অশ্রু নেই। সে ডান হাতের তেলোটা আমাদের দেখালে। মনে হ'ল, কে যেন ছুরি দিয়ে হাতের তেলোটা আড়াআড়িভাবে কেটে দিয়েছে। সে ক্লাসে চীৎকার ক'রে বললে, শালা টমরীকে আমি দেখে নোব।

ক্লাসে সে সময় যে শিক্ষক পড়াচ্ছিলেন, মারণ-বিদ্যায় তিনিও কিছু কম ছিলেন না। কথাটা তাঁর কানে যেতেই তিনি মধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বকছিস রে মধু?

মধু মাস্টারের কাছে গিয়ে হাতটা দেখিয়ে বললে, দেখুন স্তার, টমরী আমার কি করেছে! আমি ওকে ছাড়ব না, আমার বাড়ি আহিরীটোলায়।

মধুর সাহস দেখে আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠলুম, আবার না মার খায়! কিন্তু মাস্টার মশায় তাকে ধমক পর্যন্ত দিলেন না, শুধু বললেন, যা যা, পাগলামি করে না।

প্রথম ঘণ্টা শেষ হতেই মধু বই নিয়ে দুড়দাড় ক'রে ক্লাস থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

সেদিন ইস্কুল ছুটি হওয়ার পর রাস্তায় গিয়ে দেখি, গেটের সামনে বোধ হয় দু-তিন শো লোক দাঁড়িয়ে। মধু তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইস্কুলের

দিকে মুখ ক'রে চেঁচিয়ে বীভৎস ভাষায় টমরীর চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধের মন্ত্র আওড়াচ্ছে, তার ডান হাতখানা ব্যাণ্ডেজ করা, গলায় ঝোলানো।

রাস্তায় ইস্কুলের ছেলেরা ও পথচারী লোক সব দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। নিমতলা ঘাট স্ট্রীট দিয়ে সে সময় দিনরাত গরুর গাড়ি আর ঘোষের গাড়ি চলাচল করত। ভিড়ের দুপাশে সারবন্দী হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

ইস্কুলের মাস্টারেরা ভয়ে কেউ বেরুতে পারেন না। টমরী ইত্যাদি সাদাচামড়াওয়ালা মাস্টাররা দোতলায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন; আর মধু, গলায় একটা হাত ঝোলানো, আর একটা হাত তুলে তাঁদের ডেকে বলতে লাগল, নেবে আয় কে বাপের ব্যাটা আছিস—

মধুর হালচাল দেখে আমাদেরও ভয় করতে লাগল। এ যেন একেবারে অন্য লোক। সেই শান্ত অমায়িক মধু, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে যে নিঃশব্দে বেত্রাঘাত সহ্য করেছে, হঠাৎ তার এই অদ্ভুত পরিবর্তন আমরা চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারলুম না। তার কোমরে একখানা এক হাত লম্বা চামড়ার খাপ গোঁজা, তার মধ্যে ছোরা। হাত-কাটা গেঞ্জি গায়ে, কোমর বেঁধে ধুতি প'রে খালি পায়ে তড়াক তড়াক ক'রে লাফাচ্ছে ও অনর্গল চীৎকার ক'রে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে। সাপে নেউলে যুদ্ধের সময় নেউলটা যেমন দেখতে দেখতে ফুলে উঠতে থাকে, প্রত্যেক লম্ফের সঙ্গে মধুও যেন তেমনই ফুলতে লাগল। কতবার আমাদের সঙ্গে তার চোখোচোখি হ'ল, কিন্তু সে গ্রাহ্যই করলে না।

মধুর সঙ্গে মারপিট করার জন্যে প্রায় জন পঁচিশ লোক এসেছিল। ইস্কুলের সামনে একটা বাড়ির রকে দেখলুম, দুটো লোক ব'সে আছে, তাদের সামনে এক গাঁজা তিন হাত বাঁশের পাকা লাঠি। শুনলুম, তাদের সবার কাছেই ছুরি ছোরা আছে।

ওদিকে ইস্কুলের শিক্ষকরা দোতলায় ও তেতলায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছেন, নামবার সাহস নেই কারুর, এমন সময় দেখা গেল, স্টিফেন সায়েব রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। স্টিফেন সায়েব ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ, ইস্কুল ও কলেজের সমস্ত ছাত্র, শিক্ষক, এমন কি চাকররা পর্যন্ত তাঁকে ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। এই সেদিন পর্যন্তও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ইস্কুলের গেটের সামনেই অমন যে একটা কাণ্ড চলেছে, সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই তাঁর মনে জাগল না। একবার বাইসাইকেলে ওঠবার চেষ্টা ক'রে বুঝতে পারলেন যে, সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালানো অসম্ভব। টপ ক'রে গাড়ি থেকে নেমে অত্যন্ত অবহেলাভরে একবার চারদিকে চেয়ে টপ ক'রে বাইসাইকেলটা তুলে বগলদাবা ক'রে সেই ভিড় কাটিয়ে হেঁটে বেরিয়ে চ'লে গেলেন।

দার্শনিকদের হালচালই আলাদা।

স্টিফেন সায়েব চ'লে যেতেই মধু আবার চীৎকার করতে শুরু করলে। ওদিকে বেলা বাড়ছে, অথচ হাঙ্গামা তেমন জমবার আশু কোন সম্ভাবনা নেই দেখে আমরা এক রকম ক্ষুণ্ণ হয়েই যে যার বাড়ি চ'লে গেলুম।

পরদিন ইস্কুলে গিয়ে দেখি, গেটের সামনে লালপাগড়ী একেবারে গিজগিজ করছে। ক্লাসে গিয়ে শুনলুম, বেলা পাঁচটা অবধি টমরী রাস্তায় নামলেন না দেখে মধুরা চ'লে গিয়েছিল। মধুরা চ'লে যাবার পর পুলিসে খবর দেওয়া হয়। সন্ধ্যের সময় পুলিস এসে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে।

সেদিন টিফিনের ছুটির পরের ঘণ্টায় ইস্কুলে সারকুলার বেরুল—"সাংঘাতিক অপরাধের জন্য পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ইস্কুল হইতে বিতাড়িত হইল।"

হজরৎ মুশার পুণ্যবলে টমরী প্রাণে বেঁচে গেলেন, আর মহাবীরের মাথায় দুবেলা ফুল চড়িয়েও মধু ইস্কুল থেকে বিতাড়িত হ'ল!

এই সঙ্গে আর একটি নীতিও সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল যে, শ্যামকে সাত চোরের মার মারলেও নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু টমরীকে মারবার উদ্যোগ করলেই ইস্কুল থেকে বিতাড়িত হতে হবে।

কিন্তু মাসখানেক বাদে আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলুম যে, মধুর বাবা নালিশ করবার ভয় দেখানোতে ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ তাকে প্রথম শ্রেণীর ছাড়পত্র দিয়েছে। ইস্কুলের ইজ্জৎ রক্ষার জন্যে মধুর নামে সেই সারকুলার বের করা হয়েছিল, আসলে মধুর নাম কাটা যায় নি।

ইস্কুলে এই রকম সব হাঙ্গামার কথা হয়তো অনেকের কাছে অদ্ভুত ও অসম্ভব ব'লে মনে হতে পারে; কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় মাস্টার ঠেঙানো, ক্লাসে ক্লাসে মারামারি, ইস্কুলে ইস্কুলে খুনোখুনি—এসব তো আকচার হ'তই। তা ছাড়া আরও এমন সব সাংঘাতিক মারামারি খুনোখুনি হ'ত, যার কারণ বর্ণনা করতে গেলেই আইনের খপ্পরে পড়তে হবে, বিবরণ দেওয়া তো দূরের কথা।

কালধর্মে এখনকার ছেলেরা এ বিষয়ে অনেক ভদ্র হয়েছে বটে, কিন্তু তারা অনেক নতুন গুণের অধিকারী হয়েছে, দাঁড়িপাল্লা সমানই আছে। ভলটেয়ার ঠিকই বলেছেন—"We shall leave the world as foolish and wicked as we found it."

আমার বাবা সব সময়েই একটা না একটা খেয়াল নিয়ে মত্ত থাকতেন। রবারের থলিতে গ্যাস ভ'রে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দিতেন আর সেগুলো উড়ে চালে গিয়ে আটকে থাকত। মধ্যে মধ্যে নানা রঙের বারো-চোদ্দটা বেলুন একসঙ্গে গুচ্ছ ক'রে বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হ'ত, সেগুলো সোঁ-সোঁ ক'রে উঠতে উঠতে আকাশে মেঘের মধ্যে মিলিয়ে যেত। এই বেলুন-ওড়ানো আমাদের বেশ লাগত। মা কিন্তু বাবার এই সব খেয়ালকে সুনজরে দেখতেন না। বাবা যখন ঝাঁকে ঝাঁকে রঙিন বেলুন আকাশে ছাড়তে থাকতেন, মা আমাদের সঙ্গে ছাতের এক কোণে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতেন আর মন্তব্য করতেন, এই এক সের মাছ উড়ে গেল, দু সের আলু উড়ে গেল, ইত্যাদি।

মধ্যে মধ্যে সংসারের টানাটানির জন্যে বাবার এই খেয়ালের খরচ মা বন্ধ ক'রে দিতেন। কিন্তু খরচ বন্ধ হ'লেও খেয়াল বন্ধ হ'ত না। খেয়ালের ফানুস এই সব সময়ে আকাশ থেকে নেমে জমিতে কেরামতি দেখাতে থাকত। প্রতি রবিবারে বাবা নিয়ম ক'রে বাড়িঘর পরিষ্কার করতে আরম্ভ ক'রে দিতেন। সেই দোতলা তেতলা থেকে ভারী ভারী আসবাবপত্র একতলার উঠোনে নামিয়ে ঝাড়পোঁছ ক'রে আবার ওপরে তোলা হতে লাগল। মুটে-মজুর ডাকা হ'ত না। বাবা আর আমরা তিন ভাই সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটা অবধি জিনিসপত্র ওঠানো নামানো করতুম। আমরা তিন ভাইয়ে বেদম হয়ে না পড়লে ছুটি হ'ত না। কাজকর্ম বেলা বারোটার মধ্যে শেষ না হ'লে পরের রবিবারের জন্যে তা তোলা থাকত। এতখানি হয়েও নিষ্কৃতি ছিল না। এর পরে একটু জিরিয়ে নিয়ে বাবা নিজের হাতে আমাদের স্নান করিয়ে দিতেন। ওই সাংঘাতিক খাটুনির পর এই স্নানযাত্রাটি ছিল মুষ্টিযুদ্ধের

'নক আউটে'র পরও তলপেটে আর একটা ঘুষি পড়ার মতন। স্নানের পর কোন রকমে ছুটি ভাত মুখে দিয়ে সেই যে ঘুম লাগাতুম—একেবারে বেলা পাঁচটা অবধি।

প্রতি রবিবারে নিয়ম ক'রে বাড়ির আসবাবপত্র ও নিজের সন্তানদের আয়ুক্ষয় দেখে দেখে মা একদিন বিদ্রোহ করলেন। সেই দিন থেকে বাবার বাড়ি পরিষ্কার করবার খেয়ালও ছুটে গেল।

কিন্তু খেয়ালী লোকের খেয়াল একেবারে কখনও ছুটে যায় না, বদলায় মাত্র। বাবার কি রকম খেয়াল হ'ল যে, সংসারের আর্থিক উন্নতি করতে হবে। চাকরিতে সামান্য আয়, কিন্তু ব্যবসায় অর্থাগম কল্পনা দিয়েও মাপা যায় না। তিনি মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করলেন, ব্যবসা করতে হবে। বাবার চামড়ার কারবার ভালই চলত, কাজেই অর্থাগম ও সচ্ছল অবস্থা মা ইতিপূর্বে ভোগ করেছেন, এবং বর্তমান দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভের একটা উপায় বুঝি হ'ল—এই ভেবে তিনিও বাবার প্রস্তাবে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

মূক ও বধির বিদ্যালয়ের অন্যতম স্থাপয়িতা শ্রীনাথ সিংহ কাগজের স্লেট তৈরি করেছিলেন। কিন্তু খরিদ্দারের অভাবেই হোক বা আবিষ্কর্তার অবহেলার জন্যেই হোক, কাগজের স্লেট বাজারে বেরিয়েই বন্ধ হয়ে গেল। বাবার খেয়াল হ'ল, এমন স্লেট বার করতে হবে, যা দেখে বিলেতের লোকদের তাক লেগে যাবে।

তখন বাজারে নানা রকম বিলিতী কাগজের স্লেট পাওয়া যেত, আর সেগুলোর কাটতিও খুব ছিল। পাথরের স্লেটের মতন ভারী নয় ব'লে ছেলেদের মহলে এ জিনিসটির খুব আদর ছিল।

প্রথমে বাবা বাজার থেকে নানা রকম স্লেট কিনে আনলেন। তারপরে সেগুলোকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি ধোয়া-ধুয়ি দিন কতক চলল।

লেখবার স্লেটে পেন্‌সিলের পরিবর্তে খুন্তির আঘাত দিলে, তার ধর্মনষ্ট হবেই, বেচারা কাগজের স্লেটের পক্ষে কতক্ষণই বা আত্মরক্ষা করা সম্ভব! অস্বাভাবিক অত্যাচারে তারা দুদিনেই ছতরে গেল। এই ভাবে বাবা প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, এই অপদার্থ স্লেটগুলো মোটেই শিশুদের উপযোগী নয়। তিনি ঠিক করলেন, এমন স্লেট বানাবেন যা জলে নষ্ট হবে না, আগুনে পুড়বে না, খুন্তি দিয়ে কোপালেও ভাঙবে না, মাটির তলায় পুঁতে রাখলেও ক্ষয় হবে না, একটা স্লেট কিনলে তিন পুরুষ চলবে।

পূর্বপক্ষ প্রশ্ন করতে পাবেন, যে জিনিস একটা কিনলে তিন পুরুষ চলে, সে জিনিসেব ব্যবসা ক'বে এক পুরুষে বড়লোক হওয়া যায় কি না?

বাবার উত্তব ছিল, শিলনোড়া কিংবা ঢেঁকির কারবার ক'রেও তো লোকে বড়লোক হয়, অথচ ঢেঁকি বা শিলনোড়া সাত পুরুষ চলে।

এ ছাড়া আরও একটা হিসাবও তাঁর ছিল। সেটি হচ্ছে পৃথিবীব সমস্ত পরিবারে তাঁর স্লেট যদি একটি ক'রেও বিক্রি হয়, তা হ'লে তাঁর যা লাভ হবে, তা দিয়ে তাঁর পবেব চোদ্দ পুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে খেতে পারবে।

স্লেট তৈরি হতে লাগল মহাসমারোহে। সমারোহে এইজন্যে বলছি যে, সমারোহ নেই এমন ব্যাপারের প্রতি বাবার কোনও আকর্ষণই ছিল না, নিশ্চিত অর্থাগম হতে পারে এমন কাজেও নয়।

বাবা প্রথমেই স্থির কবলেন, বিলিতী কাগজের স্লেটের বদলে তিনি করবেন টিনের স্লেট। কাগজের চাইতে টিন স্থায়ী জিনিস, এবং গোড়াতেই বনেদ বিলিতীর চেয়ে শক্ত ক'রে পত্তন না করলে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারা যাবে কেমন ক'রে?

প্রথমে এল এক বস্তা বালি ও তার সঙ্গে বিলিতী সিমেণ্ট এক পিপে। বাবা বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় আপিস থেকে বাড়ি ফিরতেন। বিকেলে বাড়ি ফিরেই রাত্রি সাড়ে সাতটা আটটা অবধি আর ওদিকে ভোর চারটের সময় উঠে সকাল সাতটা অবধি প্রতিদিন সেই বালি শিলে বেটে, ছেঁকে মিহি করা হতে লাগল। সপ্তাহ দুয়েক এই পরিশ্রমের পর এক বস্তা বালি মিহি হ'ল। তারপরে কাঠকয়লা-গুঁড়ো, জাপান ব্ল্যাক, লোহাচুর, তার্পিন তেল, গর্জন তেল, কোপাল বার্নিশ ও তার সঙ্গে আরও কত কি মিশিয়ে তৈরি হ'ল এক অপূর্ব মসলা। সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্ভবত সমারোহের কিছু অভাব বোধ হওয়ায় বাবা ছাদের ওপরে এক বিরাট উনুন ফাঁদলেন। যজ্ঞিবাড়ির কড়ার মতন বড় এক ঢালাইয়ে কড়া কেনা হ'ল। তারপরে এক রবিবারের সকালে সেই আধ-মণ-কয়লা-ধরে এমন রাক্ষুসে উনুনে আগুন দিয়ে চড়ানো হ'ল অপূর্ব মসলা।

ঘণ্টা দুয়েক নাড়ানাড়ি ক'রে সেই বিরাট কড়া আমরা চার বাপ-বেটায় ধ'রে উনুন থেকে নাগিয়ে ছোট ছোট চ্যাপ্টা বুরুশ দিয়ে টিনের গায়ে বেশ ক'রে লাগিয়ে রোদে শুকোতে দিয়ে দিলুম।

পরের দিন পেন্‌সিল দিয়ে স্লেটে লিখে দেখা গেল, লেখা ফুটছে বটে, কিন্তু তেমন স্পষ্ট নয়। তেল বেশি হয়ে গিয়েছে ব'লে বাবা আপসোস করতে লাগলেন।

এক ভিয়েনেই আধ মণ কয়লা পুড়তে দেখে ও বাবার অর্ধস্ফুট আপসোস শুনে ব্যবসা সম্বন্ধে মার উৎসাহ একেবারে ক'মে গেল; বাবার এই অকৃতকার্যতায় মা যে অপ্রসন্ন হয়েছেন, সেটা আন্দাজ ক'রেই বোধ হয় বাবা এর পরের দু-তিন রবিবার আর কোন আয়োজন করলেন না। দুটো তিনটে রবিবার আমরা বিশ্রাম পেয়ে গেলুম।

উৎসাহের প্রথম ধাক্কাতেই এই রকম বাধা পেয়ে বাবার হালচালও যেন কি রকম হয়ে পড়ল। আমাদের পড়াবার সময় শাসন হয়ে গেল শিথিল। আহার সম্বন্ধে ঔদার্য ছিল তাঁর অপরিমিত, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বিপরীত ব্যবহার লক্ষিত হতে লাগল। সকলের চাইতে আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর সকাল-সন্ধ্যার উপাসনার সময় পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। যে ভগবানকে নিশিদিন তৈলদান করা সত্ত্বেও প্রয়োজনের সময় যিনি তৈল-নিয়ন্ত্রণ করলেন না, তাঁর ওপরে অভিমান হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু যে মনস্তত্ত্বের ফলে মানুষ তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়, বাবার মন অথবা দেহ সে উপাদানে তৈরি ছিল না। মাসখানেক যেতে না যেতে আবার চাঙ্গা হয়ে এক শনিবারের সান্ধ্য উপাসনার পর তিনি ঘোষণা করলেন, কাল সকালে আবার স্লেটের ভিয়েন চড়ানো হবে।

মা বললেন, আমি কিন্তু আগে থাকতে ব'লে দিচ্ছি, কয়লা দিতে পারব না। সেদিন সংসারের আধ মণ কয়লা খরচ হয়ে গিয়েছে।

বাবা বৃথা বাক্যব্যয় করলেন না।

পরদিন সকালবেলা চায়ের পালা সাঙ্গ হবার পর বাবা ভিয়েনের আয়োজন শুরু ক'রে দিলেন। কড়া ও অন্য সব সরঞ্জামাদি ছাতের ওপরে তোলার পর তিনি আমাদের নিয়ে ঢুকলেন সেই অন্ধকার ঘরে, যেখানে তাঁর বহুদিনের সঞ্চিত পুরনো কাঠের আসবাবপত্র বোঝাই করা ছিল। বেছে বেছে একটা বড়গোছের ডেস্ক টেনে বার ক'রে ছাতে গিয়ে সেটাকে ভেঙে চুর করা হ'ল। তারপরে তাতে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে চড়িয়ে দেওয়া হ'ল সেই বিরাট কড়া। একটা ডেস্কে সামলাতে পারা গেল না, আরও কতকগুলো মোটা মোটা চেয়ার ইত্যাদি নিয়ে এসে ছাদের ওপরে দড়াদ্দড় ভাঙা হতে লাগল। দেখতে দেখতে প্রায় অর্ধেক আসবাব চ'লে গেল সেই বিরাট উনুনের গহ্বরে।

কত অশ্রু, অনুনয়, গৃহবিপ্লব, কত আইন আদালত ও চীৎকারের স্মৃতি-বিজড়িত সেই সব আসবাব ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে ভস্মস্তূপে পরিণত হ'ল।

বাবা সেই বিরাট খুন্তি দিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে স্লেটের মসলা নাড়তে নাড়তে আমাদের বলতে লাগলেন, এনামেল যে ব্যক্তি আবিষ্কার করেছিল, তারও ঘরে এমনই কয়লার অভাব ঘটায় সে তার অতি প্রিয় আসবাবপত্র এমনই আগুনে আহুতি দিয়েছিল। সেদিন যদি সে আস-বাবের মায়ায় সে-কাজ না করত, তা হ'লে জগতের লোক এনামেলের বাসনরূপ প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত হ'ত। তার স্ত্রীও—

এমন সময়ে দূরে দেখা গেল, মা আসছেন। বাবা আর কিছু না ব'লে জোরে তাড়ু হাঁকড়াতে লাগলেন।

এনামেল-আবিষ্কারকের স্ত্রীর কাহিনীটা এ জীবনে আমাদের কাছে অজ্ঞাতই র'য়ে গেল।

যা হোক, ঘণ্টা দুয়েক ধস্তাধস্তির পর কড়া নামিয়ে বুরুশ দিয়ে সেই মসলা টিনের গায়ে লাগিয়ে আমরা স্নান করতে গেলুম। সেদিন ও পরের দিন সেগুলো রোদে শুকোবার পর লিখে দেখা গেল, চমৎকার স্লেট তৈরি হয়েছে।

বাবার এবারকার সাফল্যে বাড়িময় আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেল। অদূরভবিষ্যতে যে ধনরাশি আমাদের ঘরে এসে জমা হবে, কি ক'রে তার সদ্ব্যবহার করা হবে, সেই দুর্ভাবনায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। বাড়িতে নানা রকমের ব্যবসাদার লোক আসতে লাগল—গুজরাটী, ভাটিয়া, মাড়োয়ারী প্রভৃতি। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তাদের সঙ্গে বাবার কথা চলতে লাগল। কার সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করা যেতে পারে—এই নিয়ে রোজ দুপুররাত্রি অবধি বাবাতে আর মাতে আলোচনা, পরামর্শ ও

তর্কাতর্কি চলতে লাগল। শেষকালে এক গুজরাটী ধনীর সঙ্গে ঠিক হ'ল যে, সে মাসে পঁচিশ হাজার স্লেট নেবে এবং প্রত্যেক তিন মাস অন্তর হিসাব পরিশোধ করবে। এই ব্যক্তির ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও মরিশসে খুব বড় কারবার আছে, তার জন্যে দু-তিনজন ধনী জামিনও দাঁড়াল। উৎসাহের চোটে বাবা একেবারে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন।

ব্যবসা শুরু হবার আগেই বাবা ঠিক ক'রে ফেললেন, আমাদের তিন ভাইকে বিলেতে Public Schoolএ পাঠিয়ে দেবেন। তাঁর এক ইংরেজ মহিলাবন্ধু ছিলেন। ইনি ক্রীশ্চান প্রচারিকা, নাম ছিল মিস গিল্‌বার্ট। তিনি প্রায়ই বাবাকে বলতেন, লেখাপড়া যদি শেখাতে চাও তো ছেলেদের বিলেতে পাঠিয়ে দাও। মিস গিল্‌বার্ট বিলেতে Eton, Harrow, Rugby ইত্যাদি ইস্কুলের নিয়মাবলীর জন্যে চিঠি লিখতে লাগলেন। দুদিন বাদে বিলেতে পড়তে যাব—এই ধারণায় আমরা তিন ভাই ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলুম।

ওদিকে প্রতিদিন হিসাব চলতে লাগল। মাসে পঁচিশ হাজার স্লেট তৈরি করতে বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন। বাবা এদিকে সেদিকে টাকার জন্যে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। কিছু অর্থের জোগাড় হ'ল বটে, কিন্তু সে এত অল্প যে, তা নিয়ে ব্যবসায় নামতে বাবা পর্যন্ত সাহস করলেন না। ওদিকে যারা স্লেট নেবার জন্যে তৈরি হয়েছিল, তারা এ পক্ষের কোনও গা নেই মনে ক'রে নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে লাগল।

ওদিকে বিলেত থেকে খবর এল, আমাদের যে বয়েস সে বয়েসে Public Schoolএ ঢোকা চলবে না। তার আগে বছর চারেক আর এক জায়গায় পড়াশোনা করতে হবে। মিস্ গিল্‌বার্ট তার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলেছেন, বাবাকে সে সম্বন্ধে কিছুই ভাবতে হবে না।

কিন্তু টাকার যোগাড় কিছুতেই হ'ল না। আমাদের মানস-তুবড়ি মাস ছয়েক ধ'রে কল্পনার ফুলঝুরি কেটে হঠাৎ একদিন ফুস ক'রে নিবে গেল। একদিন সন্ধ্যেবেলা ঘণ্টা দুই ধ'রে "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী" গানটি গেয়ে আবার নবোদ্যমে বাবা আমাদের নিয়ে পড়াতে বসলেন। কোথায় গেল Eton, Harrow, আর কোথায় রইল Lake Lomondএর ধারে মিস গিল্‌বার্টের বন্ধুর সেই Private School, যেখানে চার বছর প'ড়ে আমরা Etonএ ঢুকব! বরাতে আছে নিমতলা ঘাটের ডফ সায়েবের ইস্কুল, কে তা খণ্ডাতে পারে!

মাস তিন-চার মনমরা হয়ে কাটাবার পর হঠাৎ একদিন বাবা দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন। আমাদের ছোট ভাই শিশুকালে পেটের অসুখে বড্ড ভুগত ব'লে তাকে অ্যারারুট খাওয়ানো হ'ত। নিত্য পয়সা খরচ ক'রে অ্যারারুট আনতে আনতে তাঁর মনে হ'ল, অ্যারারুটের ব্যবসা করলে মন্দ হয় না। তিনি ঠিক করলেন, অ্যারারুটের ব্যবসা করতে হবে। এবার কিছু আটঘাট বেঁধে আরম্ভ করার ফলে সত্যিই তাঁর অ্যারারুট বাজারে বেরুল।

তখন প্রায় পাঁচ বছর অন্তর কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ত। সেই সময় এখানে বিডন উদ্যানে কংগ্রেস হয়েছিল এবং তার সঙ্গে ভারতীয় শিল্প-প্রদর্শনীও খোলা হয়েছিল। আমাদের অ্যারারুট দেখাবার জন্যে এখানে 'স্টল' নেওয়া হ'ল। যারা প্রদর্শনীতে 'স্টল' নিয়েছিল, কর্তৃপক্ষ কংগ্রেস দেখার জন্যেও তাদের টিকিট দেওয়ায় আমরা কংগ্রেস দেখতে গিয়েছিলুম।

ছেলেবেলায় আমাদের মনে ধারণা করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, কংগ্রেস হচ্ছে আমাদের জাতীয় মহাসভা। আমরা যে পরাধীন এবং পরাধীন অবস্থা যে অত্যন্ত হেয়—এ কথা বাবার মুখে নিয়ত শুনতুম, ও

কেন জানি না আমাদের মনে হ'ত, এই জাতীয় মহাসভা আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করবে। কিন্তু হায়, আমাদের শিশুচিত্ত যখন স্বাধীনতার মুক্ত আবহাওয়ার জন্তে ছটফট করতে থাকত, সেই সময় আমাদের বিজ্ঞচিত্তরা কংগ্রেসে ব'সে পরামর্শ করতেন, কেমন ক'রে শাসকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা আরও মধুরতর করা যেতে পারে।

সেবারের কংগ্রেসে সভাপতি হয়েছিলেন দিনশা ইদালজী ওয়াচা। তখন কংগ্রেস জিনিসটি যে কি বিচিত্র ব্যাপার ছিল, তার বিবরণ দিতে গেলে শুধু তাতেই একটা বড় কেতাব হয়ে যাবে। কত রকমের লোক কত রকমের শিরস্ত্র, তার আর ইয়ত্তা নেই। অধিকাংশ বাঙালীর অঙ্গেই কোট-প্যাণ্টলুন। তখনকার জাতীয় নেতারা যে ভাবে কংগ্রেস-রথটিকে ঠেলে নিয়ে চলেছিলেন, তাতে বহু শতাব্দী পরে সে রথ হয়তো ইংলণ্ডের উপকূল অবধি পৌছতে পারত, স্বাধীনতার তোরণের নীচে গিয়ে দাঁড়াবার কল্পনাও তাঁরা করতে পারতেন না। যাঁদের মনে সে কল্পনা উঁকি দিত, তাঁরা এই সভায় প্রায় অপাংক্তেয় ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস-পুতুলকে রক্তমাংসে গঠিত মানুষে দাঁড করিয়েছেন—এ কথা অস্বীকার করে, এমন পাষণ্ড বোধ হয় কেউ নেই।

এই কংগ্রেসে প্রথম প্রফেসার মূর্তাজাকে দেখি। ইনি একজন ব্যায়ামবীর ছিলেন। ছোট লাঠি ও তলোয়ার খেলায় তাঁর অদ্ভুত নৈপুণ্য ছিল। বেঁটেসেঁটে বলিষ্ঠ বজ্রবাঁটুলের মতন চেহারাটি, ধবধবে ফরসা রঙ। ধর্মে ছিলেন মুসলমান, কিন্তু জাতিতে যে কি ছিলেন, তা তাঁর সঙ্গে মিশেও আমরা বুঝতে পারি নি। ভদ্রলোক বোধ হয় কিছু নেশা করতেন, কারণ চোখ দুটো সর্বদাই লাল টকটকে থাকত। কখনও বলতেন, আমার বাড়ি তুর্কে; কখনও বলতেন, ককেশাসে। থাকতেন শ্রীরামপুরে, কত বাঙালী হিন্দুর ছেলে যে তাঁর শাগরেদ

ছিল তার ঠিকানা নেই। ভবিষ্যতে আমরাও তাঁর শাগরেদ হয়েছিলুম। মুর্তাজা-সাহেব ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন। ইংরেজ গবর্মেণ্ট সম্বন্ধে এমন সব গরম গরম কথা বলতেন, যা আজকের দিনেও অকুতোভয়ে প্রকাশ করতে অনেকে সাহসী হবেন না। বিচিত্র হালচাল ছিল এই প্রফেসার মুর্তাজার, যাঁরা তাঁর নিকট-সম্পর্কে এসেছেন, তাঁরাই এ কথা জানেন। মুর্তাজা জনপ্রিয়ও কম ছিলেন না, সে সময় কলকাতার প্রায় সব লোকই তাঁকে চিনত এবং সম্ভ্রম করত।

এই স্বদেশী শিল্পপ্রদর্শনী ও কংগ্রেসের মধ্যে যা কিছু আশ্চর্য জিনিস চোখে পড়েছিল তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, বাঙালী দেশোদ্ধারকারীদের ইংরেজী পোশাক। দ্বিতীয়, প্রফেসার মুর্তাজা। তৃতীয়, মাঠের মধ্যে সূর্যালোকে চৌকো-চৌকো আয়না সাজিয়ে তারই উত্তাপ দিয়ে লুচি ভাজা। চতুর্থ, রেভারেণ্ড লালবিহারী সাহার অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বই পড়া।

এই প্রদর্শনীর হাঙ্গামা চুকে যাবার পরই ডফ কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আমাদের অন্য আর একটা ইস্কুলে ভর্তি করা হ'ল। ডফ কলেজ আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দু মাইল দূরে ছিল। প্রতিদিন দুবেলা এতখানি রাস্তা টানা-প'ড়েন করা যে ঠিক নয়, এতদিন বাদে তা বুঝতে পেরে বাবা এবার বাড়ির কাছেই একটা ইস্কুলে আমাদের ভর্তি ক'রে দিলেন। এই ইস্কুলের হেডমাস্টার ও যাঁর ইস্কুল, তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্ম। তখনকার দিনে মালিকিয়ানা হিসাবে অনেকে ইস্কুলের ব্যবসা করতেন; বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ, তাঁরা এই সমস্ত ব্যক্তিগত কারবার তুলে দিয়ে সমস্তটাই নিজেদের যৌথ কারবারে টেনে নিয়েছেন।

ডফ সায়েবের ইস্কুলের চাইতে এই ইস্কুল আমার ঢের ভাল লাগল।

তার প্রধান কারণ, এখানে আমার বন্ধু শচীন যে ক্লাসে পড়ত, ভাগ্যবশে আমি সেই ক্লাসে এসেই ভর্তি হলুম। এখানে ক্লাসে ছেলের সংখ্যা ও মারধোরের মাত্রা ছিল অনেক কম। একটা মুশকিল ছিল এই যে, ছাত্রের সংখ্যা কম থাকায় প্রত্যেক শিক্ষকই প্রত্যেক ছাত্রকে পড়া জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পেতেন, ও তার ফলে কে যে কেমন ছেলে তা ক্লাসের সব ছেলেই জানত।

অতীতের দিকে চেয়ে আজ মনে হয়, প্রত্যেক মানুষই তার ভাগ্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। তার জীবন কি ভাবে গ'ড়ে উঠবে, কি অবস্থার মধ্যে তার মন তৈরি হবে; যাত্রাপথে চলতে চলতে কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে, কাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, কত লোক সারা জীবন কাছে থেকেও আপনার হবে না, কত লোক দুদিনের পরিচয়ে আপনার হয়ে যাবে—সব আগে থাকতেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, কোনও শক্তি দিয়েই তাকে প্রতিরোধ যায় না।

আমার বন্ধু শচীনের বাড়ির লোকেরা আমাকে সাংঘাতিক চরিত্রেব ছেলে ব'লে জানত। ছ-সাত বছব বয়স থেকে সানুডে ইস্কুলে যে দুর্নাম কিনেছিলুম, আজও তা ক্ষালন করতে পারি নি। এই কারণে আমার এই ইস্কুলে ভর্তি হওয়াটা শচীনের বাড়ির লোকেবা বিশেষ সুনজরে দেখলেন না, বিশেষ শচীনের বাবা ছিলেন সেই ইস্কুলের মালিক।

শচীন আগে থাকতেই ক্লাসের সেরা ছেলে ব'লে নাম কিনেছিল। আমি এসে জুটতেই একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ হ'ল। এখানে টমরী বা বেত্রদণ্ডের রেওয়াজ তেমন ছিল না বটে, কিন্তু প্রায় সব মাস্টারই দেখতুম অকারণে অথবা সামান্য কারণেই শচীনকে নিদম ঠেঙাতেন। শচীনের বাবা মাস্টারদের ব'লে দিয়েছিলেন, তার প্রতি যেন কড়া

নজর রাখা হয়। সেইজন্যে শিক্ষকরা এই ভাবে তাঁদের চাকরি বজায় রাখেন।

শচীন আমার শৈশবের বন্ধু, তার প্রতি অকারণ এই অকরুণ ব্যবহার দেখে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ফলে দুই বন্ধুতে মিলে মাস্টারদের সঙ্গে তর্ক ক'রে মধ্যে মধ্যে এমন হাঙ্গামা শুরু ক'রে দিতুম যে, আমাদের শায়েস্তা করবার জন্যে হেডমাস্টার মশায়ের কাছে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হ'ত।

কিছুদিন এই ভাবে চলবার পর মাস্টারেরা ক্লাসে এসেই আমাদের দুজনকে দু জায়গায় বসিয়ে দিতে আরম্ভ করলেন। দুই মাথা একত্র হ'লেই যে অনর্থের সূত্রপাত হয়, বহুদর্শিতার ফলে তাঁরা সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা শচীনকে চোখের সামনেই অর্থাৎ 'ফার্স্ট বেঞ্চে' আর আমাকে শেষে অর্থাৎ একেবারে 'লাস্ট বেঞ্চে' বসতে হুকুম দিলেন। লাস্ট বেঞ্চে একটি মাত্র ছেলে বসত, তার নাম ছিল প্রমথ। আমার স্থান নির্দিষ্ট হ'ল এই প্রমথর পাশে।

প্রমথ আমাদের চাইতে দু-তিন বছরের বড় ছিল, কিন্তু তাকে দেখলে আট-ন বছরের চেয়ে বেশি ব'লে মনে হ'ত না। রোগে, বোধ হয় ম্যালেরিয়ায়, ভুগে ভুগে তার দেহের বাড়-বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাতজন্মে সে স্নান করত না। চুলগুলো পাতলা, তা থেকে খুশকি উড়ছে, হাতের তেলো থেকে আরম্ভ ক'রে সর্বাঙ্গ ফাটা, আর সেই ফাটার মধ্যে ময়লা জ'মে থাকায় মনে হ'ত, যেন তার গায়ে ম্যাপ এঁকে দেওয়া হয়েছে। ফুল প্যাণ্ট, লম্বা কোট প'রে এক তাড়া বই নিয়ে সে ইস্কুলে আসত। পড়াশুনো কিছুই করত না সে, গেল বছর বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় এই ক্লাসেই প'ড়ে আছে। মাস্টারেরা স্রেফ দয়াপরবশ হয়ে তাকে কোন প্রশ্ন করতেন না।

প্রতিদিন ইস্কুল বসবার মিনিট পাঁচেক আগে এক তাড়া বই নিে ক্লাসে ঢুকে তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে বসত, সমস্ত দিন কারুর সঙ্গে কথা বলত না। ক্লাসের কোন ছেলের সঙ্গেই তার ঝগড়া বা ভাব ছিল না। ছুটির ঘণ্টা বাজলে বিনা উচ্ছ্বাসে বইগুলি গুছিয়ে নিয়ে সে চ'লে যেত। মাস্টারেরা চূড়ান্ত সাজা দেবার জন্যে এই রহস্যময় প্রমথর পাশে আমাকে বসবার হুকুম দিলেন।

প্রমথর পাশে ব'সে সারাদিন তার হালচাল পর্যবেক্ষণ করতে লাগলুম। দেখলুম, কখনও সে খেয়ালমত তার সেই বইয়ের তাড়া থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে পড়ছে, কখনও বা খাতা খুলে কি লিখছে, কখনও বা একটার পর একটা এমনই ক'রে পাঁচ-সাতটা পেন্‌সিলই কাটছে। পেন্‌সিল-কাটা কল, হাড়ের বাঁটওয়ালা ছুরি, ছুঁচমুখো Independent pen, মোটা লাল-নীল পেন্‌সিল—কোন সরঞ্জামের ত্রুটিই তার কাছে নেই। ক্বচিৎ কোনও শিক্ষক তাকে পড়ার প্রশ্ন করলে, সে দাঁড়িয়ে নীরব থাকত। শিক্ষক সে ইঙ্গিত বুঝতে পেরে অন্য ছাত্রকে প্রশ্ন করতেন, প্রমথ ব'সে পড়ত। এই কর্মতৎপর, স্বল্পভাষী, ক্লাসে ব'সেই তার পরিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন প্রমথর মধ্যে আমি একটা রহস্যের ইঙ্গিত পেলুম।

একদিন অঙ্কর ঘণ্টায় দেখলুম, প্রমথ তার বইয়ের তাড়া থেকে বেঁটেসেঁটে চৌকো একখানা সুদৃশ্য লাল বই টেনে বার ক'রে নিবিষ্ট মনে পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমাদের বাড়িতে বইয়ের যে রাশি আবিষ্কার করেছিলুম, তার মধ্যে ঠিক এই রকম আকৃতির কালো মলাটের একখানা বই ছিল। সে বইখানার নাম 'ত্রৈলোক্য তারিণীর জীবন বা পাপীর আত্মকথা'—এই রকম একটা কিছু। বইখানা প্রথম যেদিন খুলে বসেছি, সেই দিনই যার চোখে পড়ায় তিনি সেখানা পড়তে বারণ ক'রে

দিয়েছিলেন। ফলে এক দিনেই বইখানা শেষ ক'রে ফেলেছিলুম। সে বইয়ের কাহিনী ছিল লোমহর্ষক। এক গৃহস্থের কন্যাকে এক বৈষ্ণবী ফুসলিয়ে কুলত্যাগ করায়। শেষকালে মেয়েটি ধাপে ধাপে নামতে নামতে নরহত্যা পর্যন্ত করতে আরম্ভ করে। অনেকগুলি নরনারী হত্যা করার পর ধরা পড়ায় তার ফাঁসি হয়। কাহিনীটা খুব ভাল না লাগলেও আমার কি জানি ধারণা হয়েছিল যে, নিষিদ্ধ পুস্তকগুলির আকারই ওই রকম ছোট ধরনের হয়ে থাকে। প্রমথর এই বইখানা 'পাপীর আত্মকথা'-জাতীয় কোনও বই মনে ক'রে তার পাশে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি পড়ছিস রে?

প্রমথ চমকে উঠে চট ক'রে বইখানা বন্ধ ক'রে ফেললে। দেখলুম, মলাটের ওপরে রূপোর জলে বড় অক্ষরে লেখা—'গীতা'।

এক মুহূর্তেই প্রমথর প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে গেল। সেই অতি ক্ষীণ, জরাগ্রস্ত, হেয়, গায়ের বোটকা গন্ধে যার কাছে বসতে আমরা ইতস্তত করতুম এমন যে প্রমথ, সে আমার কাছে মহনীয় হয়ে উঠল।

আমাদের বাড়িতে বাবা ও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যে সব ধর্মকথা ও ধর্মপুস্তকের আলোচনা হ'ত তাই শুনে শুনে বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পতঞ্জলি, গীতা প্রভৃতি সম্বন্ধে এমন সব চটকদার কথা আমরা আয়ত্ত করেছিলুম এবং মাঝে মাঝে তালমাফিক ছাড়তুম, যা শুনে অভিভাবকেরা আমাদের সম্বন্ধে আশান্বিত, শিক্ষক-সম্প্রদায় ক্রোধান্বিত এবং বন্ধু-সম্প্রদায় আমাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠত। বুলিচালি ছাড়লেও বেদ, বেদান্ত বা গীতা প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য এ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি।

সে গীতার কথা এতদিন অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে স্মরণ ক'রে এসেছি,

সেই গীতা প্রমথর বইয়ের তাড়ার মধ্যে! এর চেয়ে বিস্ময়ের বস্তু আর কি হতে পারে!

বিস্ময়টা যতদূর সম্ভব চেপে জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে! গীতা পড়ছিস?

প্রমথ কিছু না ব'লে একটু হাসলে মাত্র। সে হাসির অর্থ—এতদিনে দেখলি! ও তো হাতের পাঁচ।

জিজ্ঞাসা করলুম, তুই গীতা মুখস্থ করিস বুঝি?

প্রমথ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, ও মুখস্থ হয়ে গিয়েছে কবে, তিন-চার বছর আগে। তারপরে গম্ভীর হয়ে বললে, গুরুর আদেশ কিনা!

সেদিন ড্রইং-মাস্টারের ঘণ্টায় নিছক আড্ডা না দিয়ে প্রমথর সঙ্গে গীতা নিয়ে আলোচনা হ'ল। প্রমথর গীতাখানার পেছনে 'মোহমুদ্গার' কবিতাটাও ছিল। সে আমাকে সুর ক'রে 'মোহমুদ্গার' আবৃত্তি ক'রে শোনালে। ভারি ভাল লাগল।

পরের দিন প্রমথ জানালে যে, সে শিগগিরই সংসার ত্যাগ ক'রে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করবে। তার গুরুর আদেশ।

পরের দিন ইস্কুল বসবার অনেক আগেই প্রমথ এসে আমাকে আর একবার সুর ক'রে 'মোহমুদ্গার' শোনালে। উপরি উপরি তিন দিন নিয়মিত মুদ্গরের আঘাতে আমার মোহ প্রায় বোতলচুরের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রমথকে বললুম, তোর সঙ্গে আমিও সংসার ত্যাগ ক'রে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করব।

আমার প্রস্তাব শুনে প্রমথ উৎসাহিত তো হ'লই না, বরং মুখ গম্ভীর ক'রে রইল, কিছু জবাব দিলে না।

আমার মতন একটা লোক সঙ্গী হতে চাইছে, তাতে আনন্দ প্রকাশ

না ক'রে প্রমথ গম্ভীর হয়ে পড়ল দেখে আমার আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে?

প্রমথ বললে, তোরা আবার বেম্ম কিনা—

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। বললুম, যা যা ব্যাটা ম্যান্‌চেস্টার! বেম্মরা ছিল ব'লে আজ তোরা ভদ্রলোকের সঙ্গে একত্র বসতে পারছিস।

প্রমথ বললে, রাগ করছিস কেন ভাই? আমি কি তোকে কিছু গালাগালি দিয়েছি? বেম্মরা যোগ-টোগ মানে না কিনা, তাই বলছিলুম।

প্রমথর সঙ্গে খুব ভাব জ'মে গেল। ঠিক হ'ল, আমরা দুজনে জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করব। প্রমথ কোথা থেকে—খুব সম্ভব সেগুলো বটতলা থেকে প্রকাশিত হ'ত—সব ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আসতে লাগল। তাকে দিয়ে একখানা 'গীতা'ও আনিয়ে নিলুম। রোজ বিকেলে ঘুড়ি ওড়াবার আধ ঘণ্টা আগে গীতার শ্লোক, মায় বটতলার ভাষ্য, কণ্ঠস্থ ক'রে রাতে অস্থিরকে গীতা সম্বন্ধে লেকচার দেওয়া চলতে লাগল। মোট কথা, জগৎ যে মায়াময় ও বিরাট একটি যাতনা-যন্ত্র, সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহই রইল না। যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের একমাত্র পন্থা যে যোগ, তারই অনুশীলনে মনকে মাসখানেকের মধ্যে একাগ্র ক'রে ফেলা গেল। একদিন প্রমথ একখানা ম্যাপ নিয়ে এল। ভারতের কোথায় কোথায় জঙ্গল আছে, কোন্ জঙ্গলে কি কি শ্রেণীর জীব ও গাছপালা আছে, তার বিবরণ তার সঙ্গে দেওয়া ছিল। এই ম্যাপ দেখে আমরা একটা গভীর জঙ্গল ঠিক করলুম বটে; কিন্তু কি ক'রে কোথা দিয়ে যে সেখানে পৌঁছতে পারা যাবে, ম্যাপ দেখে তা কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না। শেষকালে অনেক পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'ল যে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধ'রে চলতে চলতে পথে জঙ্গল নিশ্চয় পাওয়া যাবে। বেশ ঝরনা-টরনা

ও ভাল ভাল ফলমূলের গাছ আছে, এমন একটা জঙ্গল দেখে ঢুকে প'ড়ে সেখানে আসন পাতা যাবে।

প্রস্তাবটা দুজনেরই আমাদের বেশ লাগল। গীতা পাঠ ও তপস্যার আনুষঙ্গিক মানসিক ক্রিয়াকর্মের ওপর মন নিবিষ্ট করবার জোর চেষ্টা চলতে লাগল।

এই ইস্কুলে এসে মাস্টারদের প্রশ্ন ও তদুপযোগী চাঁটি, গাঁট্টা ও বহুবিধ তাড়নার ইঙ্গিতে আমার উদ্দাম মন পাঠে কথঞ্চিৎ মনোনিবেশ করেছিল মাত্র, এমন সময় সংসারে দারুণ বৈরাগ্য উপস্থিত হ'ল। পড়াশুনো চুলোয় গেল, ফলে শ্যাম ও কুল অর্থাৎ ইস্কুল ও বাড়ি—দু জায়গাতেই নির্যাতনের মাত্রা হয়ে উঠতে লাগল নির্মমতর।

একদিন প্রমথকে জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা, জঙ্গলে কোনদিন যদি বাঘ-টাঘ আসে?

প্রমথ বললে, সে তুই কিছু ভাবিস নি। আমার কাছে গুরুর দেওয়া একটা বাণ আছে, সেটাকে জলে ভিজিয়ে সেই জল যে কোনও জিনিসে ঠেকানো যাবে তাই মারাত্মক হয়ে উঠবে।

বলিস কি! কি রকম শুনি?

সে বাণের গুণ এই যে, কোন রকমে একবার কারুর পাঁজরায় ঠেকাতে পারলেই হ'ল, তা বাঘই হোক আর মানুষই হোক, তাকে আর বাঁচতে হবে না।

উঃ! প্রমথটা কি? আমার তো ভিরমি লাগবার উপক্রম হতে লাগল।

প্রমথ ব'লে যেতে লাগল, এই বাণ তার গুরুর দেওয়া। গুরুদেব গভীর রাত্রে ঘুমের মধ্যে রোজ তাকে দেখা দেন, বাড়ির কেউ কিছু জানতে পারে না, কারণ তার দেহটা বিছানায় প'ড়ে থাকে, তার

আত্মাটা গুরুর সঙ্গে চ'লে যায় বাগানের এক কোণে, সেইখানে তিনি তাকে যোগ শিক্ষা দেন। গুরু থাকেন হিমাচলের কোন এক নিভৃত গুহায়, সেখান থেকে আসতে তাঁর এক মিনিট সময়ও লাগে না।

বাপ রে! প্রমথর কথা শুনে আমি তো শিউরে উঠতে লাগলুম। এই পুঁইয়ে-মরা প্যাংলা প্রমথ, তার মধ্যে এত গুণ!

আমি দেখেছি, আমার মনের মধ্যে দুটি বোধশক্তি সর্বদা জাগ্রত থাকে। একটি শক্তি—সে যে-কোন জিনিস শোনা বা দেখা মাত্র তা থেকে সত্য তত্ত্বটি তৎক্ষণাৎ ধ'রে ফেলতে পারে, তার কাছে আর ফাঁকি চলে না। এই বোধশক্তিটি হচ্ছে আত্মরক্ষার সংস্কার, একে সত্যবোধ অথবা সংস্কারবোধ বলা যেতে পারে। এই আত্মরক্ষার সংস্কার অথবা সত্যবোধ প্রাণীমাত্রেরই আছে। আমাদের দর্শন বলেন যে, পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি আমাদের মন থেকে মুছে গেলেও মৃত্যু এবং মৃত্যুযন্ত্রণার স্মৃতি মনের অতি গভীর প্রদেশে থেকে যায়। বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার যে সহজাত প্রবৃত্তি জীবের থাকে, তার মূল হচ্ছে গতজন্মের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা।

মনের মধ্যে যে আর একটি বোধশক্তি আছে, তার বর্ণনা করা সহজ নয়। সে এক অদ্ভুত রাজ্য, বিচিত্র সেখানকার হালচাল। কোনও নিয়মকানুনের বেড়িতে সে বাঁধা নয়। মনের অনুকূল যে কোন জিনিস বা অবস্থাকে সে আঁকড়ে ধরতে চায়। তার মধ্যে অসত্য বা অসম্ভাব্য যা আছে—সংস্কারবোধ বা সত্যবোধ তা প্রকাশ করতে থাকলেও আমার মনের এই দ্বিতীয় বোধশক্তি তার ওপরে কল্পনার রঙ চড়াতে থাকে। ক্রমে সত্য ও কল্পনায় একাকার হয়ে যায়, আর সেই সত্যমিথ্যাজড়িত কল্পলোকে মহানন্দে বাস করতে থাকি। আমার অন্তরের এই দ্বিতীয় বোধশক্তি, যা কঠিন বাস্তবের ওপর নিয়ত রামধনুর রঙ চড়ায়, দেবতারা

তাকে 'কুমতি' আখ্যা দিতে পারেন ; কিন্তু এই বোধই সংসারকে আমার কাছে সহনীয় করেছে, এ না থাকলে আমার জীবন্মৃত্যু হ'ত।

প্রমথ যে আমার কাছে ডাহা মিথ্যা কথা বলছে, তা বুঝতে আমার এক মুহূর্তও দেরি হ'ল না। কিন্তু মনের মায়াকাননে যে দুটি ধ্যানস্তিমিত তরুণ তাপসমূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল, রূঢ় সত্যালোকের জ্যোতিতে তখুনি তারা শুকিয়ে যেত। বরঞ্চ আমি এমন ভাব দেখাতে লাগলুম, যাতে প্রমথ আরও উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগল। শেষকালে সে নিজে থেকেই বললে, তোকেও গুরুদেবের শিষ্য ক'রে দোব।

কোন্ বিশেষ দিনটিতে আমরা এই মায়াময় সুখ-দুঃখের সংসার পরিত্যাগ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব, তা নিয়ে দিন কতক আলোচনা চলল। অবশেষে প্রমথ একদিন বললে, গুরুদেব বলেছেন, তিনি নিজেই দিন ঠিক ক'রে দেবেন।

আমি ও প্রমথ যখন সংসারত্যাগের নেশায় মশগুল, এই রকম সময়ে একদিন শচীন এসে বসল আমাদের পাশে। অনেক দিন দূরে থেকে সে আর সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করলে। আশ্চর্যের বিষয়, মাস্টার মশায়রাও সেদিন তার এই স্থানত্যাগের ব্যাপারটা লক্ষ্যই করলেন না।

শচীনকে কাছে পেয়েই ব'লে ফেললুম, আমরা দুজনে সংসার ত্যাগ করছি, দুদিনের জন্মে কেন আর কাছে ব'সে মায়া বাড়াচ্ছিস?

শচীন তো আমাদের প্ল্যান শুনে একেবারে অবাক! বলা বাহুল্য, সেও বললে, আমিও তোদের সঙ্গে যাব।

ঠিক হ'ল, প্রত্যেকে থানদুয়েক ক'রে ধুতি আর দুটো ক'রে জামা নেবে। তাতে যতদিন চলে চলবে, তারপরে বল্কল তো আছেই। ধর্মগ্রন্থের একটা ফর্দ ক'রে ফেলা গেল। আধ মণ টাক চিঁড়ে আর সেই অনুপাতে গুড়ও কিছু চাই। আরও অন্যান্য সমস্ত জিনিস মিলিয়ে

পোঁটলা যা হ'ল, তার আয়তন প্রত্যক্ষ না করলেও সেটা যে প্রায় অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে, তা মনশ্চক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হতে লাগল।

প্রমথ বললে, বিলাসিতা করা চলবে না। তিনটে সমান ওজনের পোঁটলা ক'রে তিনজনে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

সেদিন এই পর্যন্ত ঠিক হয়ে রইল।

পরদিন শচীন ক্লাসে এসেই আমাদের বললে, পোঁটলা ব'য়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা সব ঠিক ক'রে ফেলা গেছে।

কি রকম ?

শচীন বললে, আমাদের বাড়ির পাশেই একটা মাঠ আছে, সেখানে ধোপারা কাপড় শুকোতে দেয়। এদের একটা ছেলে আমার খুব বন্ধু। সে বলেছে, পোঁটলা ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের সঙ্গে একটা গাধা দেবে।

আমি বললুম, তার পরে ? আমরা জঙ্গলে ঢুকে গেলে গাধার কি হবে ? সারাদিন তপস্যা করব, না, গাধার তদারক করব ?

শচীন বললে, সে ব্যবস্থা কি আমি করি নি ? ধোপার ছেলে গাধা নিয়ে আমাদের সঙ্গে জঙ্গল অবধি যাবে। সেখানে আমাদের বসিয়ে-টসিয়ে দিয়ে গাধা নিয়ে আবার ফিরে আসবে।

যাক, কাঁধ থেকে মস্তবড় বোঝা নেমে গেল।

প্রমথ বললে, জানি, শচেটা চিরকালই খুব ওস্তাদ।

দু-তিন দিন যেতে না যেতেই মাস্টারদের টনক নড়ল। শচীনকে আমাদের পাশ থেকে উঠে আবার তার পুরনো জায়গায় গিয়ে বসতে হ'ল বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ অসুবিধা হ'ল না। পরামর্শ ওরই ফাঁকে ফাঁকে জোর চলতে লাগল।

একদিন প্রমথ এসে বললে, কাল রাতে গুরুদেব এসে আমাদের

যাত্রার দিন স্থির ক'রে দিয়েছেন। আগামী বুধবার বেলা বারোটার মধ্যে যাত্রা করতে হবে। তিনি আমাদের তিনজনকেই আশীর্বাদ ক'রে গেছেন।

সেদিন ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ঘুড়ি-লাটাই অস্থিরের হাতে দিয়ে ছাতের এক কোণে ব'সে প্রাণ খুলে গান গাওয়া গেল, "তনয়ে তার' তারিণী—"

বুধবার এল। ঘুম থেকে উঠেই ছাতে গিয়ে মহানির্বাণতন্ত্রের "ও নমস্তে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়" শ্লোকটি (ব্রাহ্ম version নয়) আবৃত্তি ক'রে নীচে নেমে এসে দুখানি ধুতি ও দুখানি শার্ট কাগজে মুড়ে একটি পরিপাটি প্যাকেট বানিয়ে রাখা গেল, বেরুবার সময় দাদার চোখে পড়লে যাতে সে সন্দেহ না করতে পারে। কোনও রকমে পায়ে পা ঠেকিয়ে মাকে একটা প্রণাম ক'রে নেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সুবিধা হ'ল না ব'লে মনে মনেই তাঁকে প্রণাম ক'রে মাত্র সংস্কৃত বইখানা ও একখানা খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল।

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখি যে, প্রমথ আগেই এসে আমাদের অপেক্ষা করছে। তাদের বাড়ি-সংলগ্ন যে বাগান, তারই পেছনে সে জায়গাটা। এর ধার দিয়ে যে রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে শচীন রোজ ইস্কুলে যাতায়াত করে। দশটা সওয়া দশটা অবধি রাস্তায় আপিসের লোকের ভিড় থাকে। সে সময় গাধা ঠেঙাতে-ঠেঙাতে এলে নিশ্চয় কোন না কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় শচীন বলেছিল, সে একটু দেরি ক'রে আসবে। আমরা দুজনে বাগানের এক কোণে দাঁড়িয়ে তা'র অপেক্ষা করতে লাগলুম। প্রমথ মস্তবড় একটা পোঁটলা নিয়ে এসেছে, তার মধ্যে ধুতি জামা ছাড়া রাজ্যের বই, তার সেই মারাত্মক বাণ, আরও কত যে জিনিস আছে, তার ঠিকানা নেই। আশা,

উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় নির্বাক হয়ে আমরা দুজনে রাস্তার মোড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু শচীনের দেখা নেই। ওদিকে ইস্কুল বসবার ঘণ্টা কানে এসে বাজতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে দূরে শচীনকে দেখতে পাওয়া গেল। দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে পান চিবোতে চিবোতে হেলে-দুলে সে এগিয়ে আসছে, তার ত্রিসীমানার মধ্যে রজকনন্দন বা শীতলার বাহনের চিহ্নমাত্রও নেই।

আমি আর প্রমথ একবার দৃষ্টি-বিনিময় ক'রেই দৌড়ে শচীনকে গিয়ে ধরলুম, কই রে, গাধা কোথায় ?

শচীন অবাক হয়ে বললে, গাধা! কার গাধা রে! পাগল হলি নাকি ?

প্রমথ ব'লে উঠল, উঃ, বিশ্বাসঘাতক !

আর দেরি করা চলে না, তখুনি ইস্কুলের দিকে ছুটতে হ'ল। ক্লাস সব ব'সে গিয়েছে, আমাদের ক্লাসে পণ্ডিত মশায় পড়াচ্ছিলেন। আমরা তিনজনে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ক্লাসে ঢুকতেই পণ্ডিত মশায় বললেন, এই যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—একত্রে যাওয়া হয়েছিল কোথায় ?

ক্লাসসুদ্ধ ছেলে আমাদের এই নতুন নামকরণ শুনে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

বোধ হয় দু সপ্তাহ শচীনের সঙ্গে কথা বলি নি, তারপরে আবার ভাব হয়ে গেল।

একদিন, সেদিন কিসের ছুটি ছিল। সারাদিন পিসীমার বাড়িতে কাটিয়ে বেলা প্রায় তিনটে নাগাদ গলি দিয়ে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় আকাশ অন্ধকার ক'রে এল মুষলধারে বৃষ্টি। ব্যাপার গুরুতর দেখে আমি আত্মরক্ষার জন্যে একটা বাড়ির উঁচু রোয়াকে আশ্রয় নিলুম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও বৃষ্টি থামল না। জলের ছাটে প্রায় আধভেজা হয়ে গিয়েছি। রাস্তায়ও বেশ জল দাঁড়িয়েছে, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—মনে ক'রে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বাড়ির দিকে রওনা হব মনে ক'রে ধুতি সামলাচ্ছি, এমন সময় প্রায় সামনের এক বাড়ি থেকে ছাতা নিয়ে একটি ছেলে রাস্তায় বেরিয়েই মুখ তুলে বললে, কে রে, স্থবির নাকি?

কে রে ললিত?

ললিত সুলতার ছোট ভাই। সে বছর সে মেয়ে-ইস্কুল ছেড়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? এঃ, ভিজে গিয়েছিস যে!

আর ভাই বলিস নি, ঘণ্টাখানেক ধ'রে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছি।

এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিস আর বাড়ির মধ্যে যাস নি? এই তো আমাদের বাড়ি।

আরে, ওইটে তোদের বাড়ি? আমি তা তো জানি না।

ললিত ছাতা বন্ধ ক'রে হাত ধ'রে বললে, আয় আয়।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে ললিত চীৎকার ক'রে উঠল, দিদি, দেখ, কে এসেছে!

ললিতের চীৎকার শুনে তার ভাইবোনেরা ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হ'ল, সবার পেছনে এল সুলতা হাঁপাতে হাঁপাতে।

ললিত চেঁচাতে লাগল, আজ ঠিক ধরেছি, এইখানে দাঁড়িয়ে ছিল।

সুলতা আমাকে দেখেই বললে, এতদিনে মশায়ের সময় হ'ল বুঝি? মিথ্যেবাদী কোথাকার! প্রতিজ্ঞা করেছিলি না?

সুলতার কথার কোন জবাব দিতে পারলুম না। তাকে দেখে শুধু মনে হ'ল, কি সুন্দর দেখতে হয়েছ তুমি?

সুলতার ছোট বোন সুজাতা আমাদের দু ক্লাস নীচে পড়ত। ইস্কুলময় চড়ুইপাখির মতন নেচে বেড়াত সে। সুজাতা চড়ুইপাখির মতই কিচকিচ ক'রে উঠল, আবার কথা কওয়া হচ্ছে না বাবুর!

সুলতা এগিয়ে এসে আমার হাত ধ'রে বললে, চল্ মার কাছে।

মা বড় ভালমানুষ। প্রণাম ক'রে বসতে না বসতে কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারে আপনার ক'রে নিলেন। তিনি বললেন, লতু কতদিন থেকে বলছে—তুমি আসবে, তা ছেলের বুঝি সময়ই হয় না, না?

তখুনি তাস পাড়া হ'ল। ললিত একবোঝা মুড়ি আর তেলে-ভাজা এনে হাজির করলে। তেলে-ভাজা কিনতে যাবার মুখেই আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।

'গ্রাবু' খেলা শুরু হ'ল। আমি আর সুলতা এক দিকে, সুজাতা ও ললিত আর এক দিকে। বাকি যারা ছিল, তারা আমাদের ঘিরে বসল। হৈ-হৈ ক'রে খেলা জ'মে উঠল।

ও'দিকে আকাশ বিরাট আর্তনাদে বার কয়েক দিগ্বিদিক চমকে দিয়ে আমাদের ঘিরে একঘেয়ে ঝরঝরানি-সুরে বিনিয়ে কাঁদতে থাকল।

সময় যে কোথা দিয়ে কাটতে লাগল, তা বুঝতেই পারি নি। দিনের আলো আর রাতের অন্ধকার মিলিয়ে ঘরের মধ্যে যে স্বপ্নালোকের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই মায়ায় আমার আত্মজ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল। নিজের বাড়িতে নিয়ত নানা শঙ্কায় মন আমার সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকত,

উদ্যত শাসনকে কত মিথ্যায় বা ছলনায় ঠেকিয়ে রাখতে হ'ত তার আর ঠিকানা নেই ; কিন্তু লতুদের ওখানে দেখলুম, ঠিক তার উল্টো। বাবা-মার সঙ্গে তাদের ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ, ঠিক বন্ধুর মতন। অথচ তাদের কেউ লেখাপড়ায় আমার চাইতে খুব ভাল ছিল না। তা ছাড়া অনাত্মীয় পরিবারের মধ্যে তেমন ভাবে মেশা এর আগে জীবনে হয় নি। আমার স্নেহলোলুপ অন্তর তাদের আদরে এমন সাড়া দিলে যে, কিছুক্ষণের জন্যে নিজের বাড়ির কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। হঠাৎ পাশের ঘরের একটা ঘড়ি ঢং ঢং ক'রে জানিয়ে দিলে, সাতটা বাজল যে হে স্থবির শর্মা, আর কত আড্ডা দেবে ? আজ বরাতে দুঃখু আছে তোমার।

আর নয়। তড়াক ক'রে উঠে পড়লুম। আমার ও লতুর কাঁধে তখনও একটা পাঞ্জা ও একটা ছক্কা চাপানো রয়েছে।

উঠে পড়লুম। আর নয়, আর নয়, আর নয়।

সুজাতা বললে, কাল আসতে হবে কিন্তু।

নিশ্চয় আসব।

লতু বললে, না এলে দেখবে মজা। আজকের হারের শোধ দিতে হবে, মনে থাকে যেন।

চলতে চলতে বললুম, নিশ্চয় আসব।

পথে একবুক জল ঠেলে চলতে চলতে মনে হতে লাগল, কাল নিশ্চয় এসে আজকের হারের শোধ নিতে হবে।

পরাজয়ের বন্ধনে আমার ও লতুর মধ্যে বন্ধুত্ব হ'ল।

সেদিন রাশিচক্রের কি সমাবেশ ছিল, বলতে পারি না। সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যের পর ভিজে বাড়িতে ফেরার অপরাধে প্রহার তো হ'লই না, বাবার কাছে কিছু জবাবদিহিও করতে হ'ল না।

বরং তিনি আমার অবস্থা দেখে তক্ষুনি এক কাপ গরম চায়ের হুকুম দিয়ে দিলেন।

পরদিন অস্থিরকে নিয়ে লতুদের ওখানে গিয়ে হাজির হলুম। অস্থির ওদের অচেনা নয়। লতুর ছোট বোন সুজাতা ও ললিত অস্থিরের সঙ্গে পড়ত, তাকে পেয়ে ওরা ভয়ানক খুশি হয়ে উঠল। এর পর থেকে আমরা প্রায় রোজই বিকেলে লতুদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে লাগলুম।

ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বাবার হুকুমমত আমাদের তিন ভাইকে এক পাতা ইংরেজী, এক পাতা বাংলা ও এক পাতা সংস্কৃত হাতের লেখা লিখতে হ'ত। এ ছাড়া আবার দশটা ক'রে অঙ্ক কষতে হ'ত। প্রতিদিন সকালবেলায় বাবাকে এইগুলি দেখাতে হ'ত। নিয়মমত এইগুলো দেখাতে না পারায় সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একদিন আমাদের তিন ভাইয়ের কেউ না কেউ মার খেত। আমি আর অস্থির ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি লেখা-টেখাগুলো সেরে ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে ছাতে উঠে যেতুম। আমাদের ছাত থেকে পাশের বাড়ির ছাত, তার পাশের বাড়ির ছাত ঘুরে সেই সন্ধ্যের সময় নেমে পড়তে বসতুম। ঘুড়ি ওড়ানোটা বাবা বিশেষ পছন্দ করতেন না, তবে রাস্তায় বেরুনোর চাইতে ভাল মনে ক'রে সেটা সহ্য করতেন মাত্র। এই ছাতের ওপরে ওঠা ও সেখান থেকে নেমে আসা পর্যন্ত সময়টুকু আমাদের আর খোঁজ হ'ত না।

আগেই বলেছি, ইস্কুলে যাওয়া ও বাড়ির কাজ ব্যতীত বাইরে বেরুনো আমাদের মানা ছিল। বিনা অনুমতিতে অন্য সময় রাস্তায় পা দেবার জো ছিল না। দিন কয়েক লতুদের ওখানে যেতে না যেতেই একদিন ধরা প'ড়ে বাবার কাছ থেকে বেশ কিছু নগদ পাওয়া গেল;

আমরাও বুদ্ধি খাটিয়ে আর একটি উপায় আবিষ্কার ক'রে ফেললুম। আমরা ঘুড়ি লাটাই ও সেই সঙ্গে জামা ও জুতো নিয়ে ছাতে উঠে পাশের বাড়িতে লাটাই ঘুড়ি রেখে তাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে লাগলুম। সন্ধ্যে হবার কিছু আগে ওই প্রণালীতে আবার বাড়িতে ফিরে আসতুম।

কিছুদিন এইভাবে বেশ চলল। ওদের ওইখানেই আমাদের লাটাই রেখে আসা গেল। চলছিল বেশ, কিন্তু একদিন আবার ধরা প'ড়ে গেলুম। উত্তম-মধ্যম তো হ'লই, সঙ্গে সঙ্গে ছাতে ওঠাও বন্ধ হয়ে গেল।

এই বাইরে বেরুনো নিয়ে আমাদের তিন ভাইকে বাল্যকালে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। বাবা মনে করতেন, ছেলেরা বাইরে গেলেই তাদের পরকালটি একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবে। ছেলেদের জগতে ইহকাল ব'লে যে একটা বড় জিনিস আছে এবং সেটি বাঁচাতে না পারলে পরকালটির ঝরঝরানি যে অনিবার্য, সে সত্য তখনকার দিনের অনেক অভিভাবকই স্বীকার করতেন না।

বাড়ির মধ্যে ছেলেরা যে নিরুদ্বিগ্নতার আওতায় বেড়ে ওঠে, সে রকম নিরুদ্বিগ্নতা ছেলেবেলায় কখনও উপভোগ করি নি। শুনতুম, লেখাপড়ার প্রতি বালকদের স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে, কিন্তু আমার তা ছিল না; বরং বিরাগই ছিল। লেখাপড়া করাকে আমি ভীষণ, ভয়াল, ভয়ঙ্কর মনে করতুম। শৈশবে ইস্কুলে যাবার আগে বাড়িতে অক্ষরপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ পর্যন্ত লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহই ছিল; কিন্তু ইস্কুলে ভর্তি হবার পর লেখাপড়ার জন্যে যে দিন থেকে চাপ শুরু হ'ল, সেই দিন থেকে ধীরে ধীরে তার বিরুদ্ধে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণাই সঞ্চিত হতে লাগল। ইস্কুলের বই ছাড়া যে-কোন বিষয়ের যে-কোন বই

আগ্রহের সঙ্গে পড়তুম ও তার মর্মার্থ জানবার চেষ্টা করতুম। পড়ার বই ছাড়া অন্য বই পড়তে দেখলে বাবা যে তার মর্মার্থ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবেন, সেই ভয়ে এই সুখও পেতুম কচিৎ। এই সব কারণে বাড়ির বাইরে আমি পেতুম ফুর্তি, আর যদি সেখানে স্নেহ-ভালবাসার আকর্ষণ থাকত তা হ'লে পেতুম স্বর্গ।

বাবার ধমক ও প্রহারের জন্যে হয়তো তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি বেড়ে যাওয়া উচিত ছিল। হয়তো মনে হওয়া উচিত ছিল যে, ভদ্রলোক আমাদের জন্যেই চাকরি করেন, সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত শরীব নিয়েই আমাদের পড়াতে আরম্ভ করেন, আমাদেরই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে অপত্যস্নেহের প্রস্রবণকে রুদ্ধ ক'রে নিজের অন্তরকে নির্মমভাবে পীড়ন ক'রে আমাদের এমন শাসন করেন যে, সন্তানবতী প্রতিবেশিনীরা ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকেন। হয়তো আরও অনেক কিছু মনে করা উচিত ছিল, কিন্তু আমার কল্পনা জীবনের ব্যবহারিক দিকটাকে সর্বদাই উপেক্ষা করেছে, তাই প্রহারের পূর্বে হ'ত ভয় এবং পরে হ'ত রাগ। রাগটা ছিল নিষ্ফল, এবং প্রহার থেমে যাবার পরই ভয়টা যেত চ'লে। তাই বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ হাওয়ার অর্ডিন্যান্স জোরসে পাস হবার পরও লতুদের ওখানে যাওয়া বন্ধ করবার ইচ্ছা তো দূরের কথা, কোন্ সুযোগে আবার সেখানে রোজ হাজিরা দিতে পারা যায়, দিনরাত দুই ভাইয়ে তারই পরামর্শ চলতে লাগল।

পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে সুযোগও এসে গেল। এসে গেল বললে বোধ হয় ভুল হবে, সুযোগ ক'রে নেওয়া গেল। ছেলেবেলায় সুযোগ জুটিয়ে নেওয়া ব্যাপারে আমার ও অস্থিরের বুদ্ধি খেলত অদ্ভুত ও চমকপ্রদ। এ বিষয়ে অস্থির আমার চাইতে ঢের বেশি ওস্তাদ ছিল।

ভাগ্যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতিভার এই দিকটা ম্লান হয়ে এসেছিল, নইলে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াত, তা ঠিক বলা যায় না। সুযোগ কি ক'রে টেনে নিয়ে এসে কাজে লাগাতুম, সেই কথা বলি।

আমাদের দরিদ্রের সংসার হ'লেও চাকরবাকর, ঝি, আশ্রিত প্রতিপাল্যের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। এ ছাড়া বাবার ও আমাদের তিন ভাইয়ের কুকুরের শখ থাকায় বিলাতী অভিজাত সম্প্রদায়ের গুটি পাঁচ-ছয় সারমেয়নন্দন আমাদের বাড়িতে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে পালিত হ'ত। তা ছাড়া মার নিজের ছিল ছাগলের শখ। বাড়ির একতলা থেকে তেতলা অবধি গুটি বারো-তেরো ছাগল অবাধে বিচরণ করত। এই মানুষ, কুকুর ও ছাগলের প্রত্যেকটিকেই মা অতি যত্নে পালন করতেন। এদের প্রত্যেকে কে কি খেতে ভালবাসে, কার কি সহ্য হয় না, সব তাঁর একেবারে নখদর্পণে থাকত। বিশেষ ক'রে জানোয়ারদের তদারক সম্বন্ধে তাঁর নজর ছিল খুবই কড়া। প্রত্যেকে ঠিক সময়ে তার নির্ধারিত খাদ্য পাচ্ছে কি না, তা তিনি নিজে দেখাশোনা করতেন। জানোয়ারদের প্রতি মার এই দুর্বলতাটা আমরা নিজেদের সুযোগে খাটিয়ে নিলুম।

দুই ভাই বিমর্ষ হয়ে রকে ব'সে আছি, সন্ধ্যে হয় হয়, এইবার পড়তে বসতে হবে, এমন সময় ঘাসওয়ালা এল ছাগলের ঘাস নিয়ে। ঘাসওয়ালাকে দেখেই মুহূর্তের মধ্যে আমাদের প্ল্যান তৈরি হয়ে গেল। তাকে ব'লে দিলুম, মা ব'লে দিয়েছেন, আজ থেকে আর ঘাস নেওয়া হবে না।

আমাদের কথা শুনে সে বেচারীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এমন বাঁধা খদ্দের হঠাৎ কি কারণে বিগড়ে গেল ভেবে সে হতভম্বের মত আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমরা বললুম, সব ছাগল বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মা বলছেন—ছাগল বড় অপয়া জাত।

ঘাসওয়ালা বেচারী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে আবার ঘাসের বোঝা মাথায় তুলে নিয়ে চ'লে গেল দেখে আমরা গিয়ে পড়তে বসলুম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ রে, ঘাস দিয়ে গিয়েছে ?

কই, না।

আবার কিছুক্ষণ পরে মা বললেন, দেখ্ তো, ঘাস দিয়ে গিয়েছে কি না! ও আবার মাঝে মাঝে কারুকে না জানিয়েই ঘাসের বোঝা ফেলে দিয়ে চ'লে যায়।

আমি উঠে রক অবধি গিয়ে ফিরে এসে বললুম, ঘাস দেয় নি মা।

মা সেই যে বকতে শুরু করলেন, রাত্রি এগারোটায় গিয়ে তা থামল।

প্ল্যান আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল। পরদিন ইস্কুল থেকে এসেই শুনলুম, মা ভীষণ চেঁচামেচি করছেন। রাত্রে ঘাস খেতে পায় নি ব'লে ছাগলেরা দুধ দিচ্ছে না। আমরা দুজনেও ছাগলের দুঃখে ললিত-গলিত হয়ে ঘাসওয়ালার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সম্বন্ধে অনেক রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। অনেক বকাবকির পর ঠিক হ'ল যে, আমরা দুজনে রোজ ঘাস নিয়ে আসব। এতে আমাদের কষ্ট হবে বটে, কিন্তু সে জন্যে ছাগলগুলোকে কষ্ট দেওয়া কিছু নয়। আহা, অবোলা জানোয়ার!

পরদিন থেকে আমরা ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে হাতের লেখা ইত্যাদি

কর্তব্যকর্ম সম্পাদন ক'রে ঘাস আনতে যেতে লাগলুম। ঘাস আনবার প্রোগ্রামটা ছিল এই, বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে লতুদের বাড়ি যাওয়া। সেখানে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে ও খেলা ক'রে মিনিট দশ-পনরো বেলা থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়তুম ঘাস আনতে। তেরো আঁটি ভিজে নোনোঘাস দুই ভাইয়ে সমান ভাগ ক'রে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ফিরতুম বাড়িতে।

লতুদের বাড়ির সবার সঙ্গে আমাদের দুজনের এত ভাব হয়ে গিয়েছিল যে, একদিন না যেতে পারলে সেখানে একেবারে হাহাকার উপস্থিত হ'ত। পরদিন তাদের বাবা মা থেকে আরম্ভ ক'রে চাকরদের পর্যন্ত অনুপস্থিতির জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত।

মাস কয়েক বেশ চলল। একদিন ইস্কুল থেকে এসে শুনলুম, ঘাসওয়ালা ব্যাটা দুপুরবেলায় এসে মার সঙ্গে দেখা ক'রে আবার ঘাস দেবার ব্যবস্থা ক'রে গেছে।

হায় ভগবান! এত দুঃখও তোমার ভাণ্ডারে আছে! সেদিনও কিন্তু নিয়মিত সময়ে লতুদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে সমস্তক্ষণটাই ঘাসওয়ালার বিশ্বাসঘাতকতা মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগল। আবার নতুন সুযোগ আহরণের পরামর্শ শুরু হয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যের সময় দু-একটা চড় ও কানৌটি দিয়েই বাবা ক্ষান্ত হলেন। পড়তে ব'সে যাওয়া গেল।

দিন দুই আর লতুদের বাড়িমুখো হলুম না। তৃতীয় দিন অস্থির সেখানে গেল, আমি বাড়িতে রইলুম। বাবা আপিস থেকে ফেরবার আগেই সে ফিরে এল। পরের দিন আমি গেলুম। এই রকম চলতে লাগল।

একদিন অস্থির ওখান থেকে ফিরে এসে বললে, সুজাতার অসুখ করেছে।

পরদিন দুই ভাইয়ে একসঙ্গে লতুদের ওখানে চ'লে গেলুম। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে পেয়ে তাদের ভাইবোনদের মধ্যে খুশির হুল্লোড় লেগে গেল। দেখলুম, সুজাতা শুয়ে রয়েছে, তার গলায় একটা ফ্ল্যানেল বাঁধা, গলায় ভয়ানক ব্যথা। জ্বর রয়েছে, বুকেও খুব বেদনা।

আমরা তাকে ঘিরে বসলুম। আমাদের পেয়ে সুজাতাও তার রোগযন্ত্রণা ভুলে গেল। কয়েকদিন পরে বেশ লাগতে লাগল। আমরা ঠিক করেছিলুম, বাবা বাড়ি ফেরবার আগেই চ'লে আসব, কিন্তু সুজাতা কিছুতেই উঠতে দেয় না। বাবা বাড়ি ফেরবার আগেই আমাদের যাওয়া যে বিশেষ প্রয়োজন, সে কথা সেখানে প্রকাশ করতে পারি না, ওদিকে লতু ও সুজাতা কিছুতেই ছাড়ে না। শেষে অনেক কষ্টে কাল তাড়াতাড়ি আসবার প্রতিজ্ঞা ক'রে সেদিন পালিয়ে এলুম।

বাড়িতে ফিরে দেখি যে, বাবা এসে গিয়েছেন। বার কয়েক খোঁজও হয়েছিল। বেশ কিছু প্রহার সেবান্তে পাঠে নিযুক্ত হওয়া গেল। বাবা বললেন, তোমাদের বাইরে-যাওয়া রোগ আমি ছাড়াতে পারি কি না একবার দেখব।

পরের দিন সাহস ক'রে আর লতুদের ওখানে যেতে পারলুম না। দিন দুই পরে সেই পুরনো কায়দায় অস্থির সেখান থেকে চট ক'রে একবার ঘুরে এল। অস্থির বললে, সুজাতার নিমোনিয়া হয়েছে, কথা বলতে পারছে না।

রাত্রে ঘুমোবার আগে খালি সুজাতার কথাই মনে হতে লাগল। সুজাতা কি ভাল হবে? কতদিনে সে একেবারে সেরে উঠবে? নীলরতন সরকার যখন দেখছেন, তখন আর কোনও ভাবনা নেই।

আজকাল নিমোনিয়ার অনেক ভাল ওষুধ বেরিয়েছে—এই ভাবতে ভাবতে অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথমে সুজাতার কথা মনে পড়ল।

সারাদিন দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটিয়ে বিকেলে অস্থিরকে বাড়িতে রেখে সুজাতাদের বাড়ি চ'লে গেলুম।

রোগিণীর ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। একটা তীব্র ঝাঁজালো গন্ধে ঘর ভরপুর হয়ে রয়েছে। সন্তর্পণে সুজাতার কাছে এগিয়ে গেলুম, তার দুই চোখ অর্ধনিমীলিত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। লতু তার মাথার কাছে ব'সে, মা এক পাশে ব'সে আছেন। আমি কাছে যেতেই তিনি মুখ তুলে বললেন, কে, স্থবির? আয়, এদিকে ব'স্।

মায়ের দুই চক্ষু অশ্রুতে পরিপূর্ণ।

আমি ধীরে ধীরে লতুর পাশে বসলুম। মা বললেন, কালও তোদের নাম করেছে কতবার!

সুজাতার দিকে চাইলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারলুম না। কি এক অস্বাভাবিক ধরনের নিশ্বাস টানছিল সে। উজ্জ্বল গৌর তার বর্ণের ওপর কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে! জেগে আছে কি ঘুমিয়েছে, তা বুঝতে পারলুম না। সুজাতার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে লতুর দিকে চাইলুম। রহস্যময় দৃষ্টিতে সে আমার দিকে অনিমেষ চেয়ে রইল। গভীর সে দৃষ্টির মধ্যে কি মৃত্যু লুকিয়ে ছিল? তার দিকেও চেয়ে থাকতে পারলুম না, মায়ের দিকে চাইলুম। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই তিনি আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কেমন আছিস বাবা? চেহারাটা তো ভাল দেখাচ্ছে না!

বাবা ফেরবার আগেই যে বাড়ি পৌছতে হবে সে জ্ঞান তখনও হারাই নি, তাই মিথ্যে ক'রেই বললুম, শরীরটা তেমন ভাল নেই।

মা বললেন, তা হ'লে তাড়াতাড়ি বাড়ি যা।

কিছুক্ষণ ব'সেই বাড়ি চ'লে এলুম।

পরের দিন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আধ মাইল ঘুরে ইস্কুলে যাবার আগে সুজাতাকে দেখ্‌তে গেলুম। তাকে তখন গ্যাস দেওয়া হচ্ছে; শুনলুম, সে গ্যাস নিতে পারছে না। ঘরের মধ্যে ঢুকতে আর সাহস হ'ল না, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে থাকবারও উপায় ছিল না, তাড়াতাড়ি যেতে হবে, নইলে ইস্কুল ব'সে যাবে। কিন্তু লতু ব'লে দিলে, তাড়াতাড়ি আসিস।

ইস্কুল থেকে ফিরে নাকে-মুখে চাট্টি গুঁজে দুই ভাই ছুটলুম সুজাতাকে দেখতে। তাদের গলির মোড়ে পৌছেই চীৎকার শুনে বুঝতে পারলুম, সুজাতা চ'লে গেছে।

সেইখান থেকেই কাঁদতে কাঁদতে ছুটলুম তাদের বাড়িতে। বাড়ির ভেতরের সে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের খুঁটিনাটির কথা আজ আর সমস্ত মনে নেই। পুজোবাড়িতে শাঁক, ঘণ্টা, জয়ঢাক, কাঁসর মিলিয়ে যে অখণ্ড আওয়াজ বাতাসে গুমরোতে থাকে, তেমনই নানা কণ্ঠের চীৎকারোত্থিত এক অখণ্ড আওয়াজ নিষ্ফল অভিযোগে সেখানে আর্তনাদ করছিল। কত পুরুষ ও নারী যে সেখানে এসে জমেছে, তাদের এতদিন দেখি নি। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই হাহাকার করছে—সুজাতা চ'লে গেছে।

মৃতদেহ যে ঘরে, সে ঘরে মেয়েদের ভিড়। তাঁরা সকলেই কাঁদছেন—কেউবা চীৎকার ক'রে, কেউবা নীরবে। লতু ও তার বাবা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করছিলেন, আমাদের দেখে তাঁরা দুজনেই চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। আমরা দুজনে একেবারে দৌড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম।

দেখলুম, সুজাতার মৃতদেহ খাটের ওপরে শায়িত। তাকে স্নান করিয়ে নতুন একখানা শাড়ি পরানো হয়েছে। রুক্ষ চুলগুলি যতদূর সম্ভব গুছিয়ে আঁচড়ানো। কৈশোরের চাপল্য ও জীবনের চাঞ্চল্যের চিহ্ন সে মুখে নেই, এতদিন রোগযন্ত্রণার যে ছায়া তার মুখে দেখেছিলুম, তা একেবারে অপসারিত হয়ে গিয়েছে। শান্ত সৌম্য সে মুখমণ্ডল, বুকের ওপরে দুটি হাত জোড় করা, সে মূর্তি আমার মনে একাধারে শোক ও শ্রদ্ধার প্রস্রবণ ছুটিয়ে দিলে। মনে হ'ল, আমাদের এই অতি নিকট বন্ধু পরম শান্তিতে মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করেছে। সে যেন আর আমাদের নয়, আমাদের চাইতে অনেক দূরে অনেক উঁচুতে চ'লে গেছে। সংসারের প্রতি দারুণ অভিমানে তার মুখে এই যে গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছে, কোন কিছুতেই আর তা ভাঙবে না।

অস্থির ঘরের মধ্যে ঢুকে কিছুক্ষণ সুজাতার মৃতদেহের প্রতি শঙ্কিত বিস্ময়ে চেয়ে থেকে চীৎকার ক'রে তার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল।

মৃতদেহ ঘিরে ব'সে যে সব মহিলা এতক্ষণ কান্নাকাটি করছিলেন, হঠাৎ অস্থিরের এই কাণ্ড দেখে তাঁরা প্রথমে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, তারপরে সেই শোকাপ্লুত চোখগুলিতে ফুটে উঠতে লাগল বিশ্বজোড়া কৌতূহল—কে এই ছেলেটি ?

অস্থিরের চীৎকার শুনে সুজাতার বাবা ঘরের মধ্যে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

লতুদের বাড়িতে তাদের এক আধপাগলা মামা থাকত। আধপাগলা হ'লে কি হবে, সে-ই তাদের সংসারের বিষয়-আশয় থেকে আরম্ভ ক'রে সব দেখাশোনা করত। মামা সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে সুজাতার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। এগারো বছরের ললিতও তাদের সঙ্গে গেল, কারুর মানা সে শুনলে না।

সেদিনকার বিকেলের একখানি মধুর ছবি আজও আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে, স্মৃতির পরশ লাগলেই সেটি ঝকঝক ক'রে ওঠে। দোতলার খোলা ছাতে একখানা শতরঞ্চি পাতা। মধ্যিখানে লতুর বাবা অস্থিরকে কোলে নিয়ে ব'সে আছেন। অস্থির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর তিনি মধ্যে মধ্যে তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরছেন। এক ধারে লতুর মা ব'সে আছেন, তাঁর দক্ষিণ উরুতে মাথা রেখে লতু শুয়ে আছে, বাঁ পাশে আমি ব'সে, মা ধীরে ধীরে বাঁ হাতখানি আমার পিঠে বুলোচ্ছেন। শোকের আগুনে আমাদের বয়েস ও সাংসারিক অবস্থার তারতম্য ঘুচে গেছে। সকলেই আত্মহারা, সবারই মন একই কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরছে। আমাদের চারিদিকে বাড়ির আত্মীয়, বন্ধু ও প্রতিবেশীর দল, নারী ও পুরুষ—কেউবা ব'সে, কেউবা দাঁড়িয়ে।

বেলা প'ড়ে আসার সঙ্গে একে একে সকলে বিদায় নিতে লাগলেন। আমাদের চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল, সেই অন্ধকারে আমাদের চোখে ঝরতে লাগল অশ্রু, আর মন ফিরতে লাগল অমর্ত্যলোকের সন্ধানে।

সময়ের জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ লতুর মা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, স্থবির, অস্থির, এবার বাড়ি যাও বাবা, তাঁরা আবার ভাববেন।

লতুদের একজন চাকর চলল আমাদের বাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে। বাড়ির দিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই আমরা চাকরকে বিদায় দিয়ে রাস্তার ধারে গরু-ঘোড়ার জলখাবার জন্যে যে লোহার চৌবাচ্চা তখন থাকত, তারই একটাতে বেশ ক'রে চোখ-মুখ ধুয়ে ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে বাড়িতে ঢুকলুম। পথে ঠিক হ'ল যে, বলা হবে, গড়ের মাঠে খেলা দেখতে গিয়ে ফেরবার সময় পথ হারিয়ে গিয়েছিলুম।

পড়ার ঘরের কাছে গিয়ে দেখলুম, বাতি জ্বলছে বটে, কিন্তু সেখানে বাবাও নেই, দাদাও নেই। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে জামা ছেড়ে বই নিয়ে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় মা এসে বললেন, পোড়ামুখোরা, গিয়েছিলে কোথায়? আজ যে খুন ক'রে ফেলবে।

শুনলুম, দাদাকে নিয়ে বাবা বেরিয়েছেন আমাদের খোঁজে।

পড়তে বসলুম। অচিরেই সাংঘাতিক রকমের একটি ফাঁড়া রয়েছে জেনেও মনের মধ্যে কোনও ত্রাসই হচ্ছিল না। নিদারুণ মানসিক ক্লান্তি সারা দেহ-মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগল।

মিনিট পনের পরেই বাবা দাদাকে নিয়ে ফিরে এলেন। মিনিট পাঁচেক জিজ্ঞাসাবাদের পরই প্রহার শুরু হ'ল, প্রহারের সরঞ্জাম আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল।

সেদিনকার প্রহারের বিবরণ আর দোব না। শুধু এইটুকু বললেই হবে যে, উত্থানশক্তিবিরহিত অবস্থায় আমরা মেঝেতে প'ড়ে গোঁ-গোঁ করছি, আর বাবা ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে আমাদের হত্যা করবার জন্যে বঁটি খুঁজছেন, এমন সময় কয়েকজন প্রতিবেশিনী আমাদের বাড়িতে ঢুকে মাকে গালাগালি কবতে আরম্ভ করায় তিনি বাবাকে নিরস্ত করলেন।

চাকরেরা আমাদের তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে বাতি নিবিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। আমাদের চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগল বালিশে। পিতা ও পরম-পিতা উভয়ের অত্যাচারে জর্জরিত সেই দুটি বালককে সুপ্তি এসে মুক্তি দিলে।

আজ আশ্বিনের বুকে আষাঢ়ের নবঘন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। ছাতের ঘরে জানলার ধারে ব'সে আছি, সামনে আমার জাতকের খাতা খোলা। খেয়ালী প্রকৃতির দাপাদাপি চলেছে আমাকে ঘিরে—আমার মনকে ঘিরে। আমার উদাসীন মন ফিরে চলেছে স্মৃতির সরণী বেয়ে সুদূর অতীতে। গাঢ় বিস্মৃতির যবনিকা ভেদ ক'রে চ'লে গেছি একেবারে অতীতের অন্তস্তলে, যেখানে আমার মানসরচিত রাজ্য প'ড়ে আছে সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে। সেখানে কত বিরাট প্রাসাদ, জ্যোতির্ময় হর্ম্য, বজ্রমণির দেওয়াল, মরকতের ছাদ! উপবনে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল মূর্ছিত হয়ে নুয়ে পড়েছে মাটির দিকে। ঘরে ঘরে কত নর-নারী—বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—আমার নর্মসহচর, আমার আত্মার সহধর্মিণী তারা, সকলেই ঘোরতর সুপ্তিতে আচ্ছন্ন। স্মৃতির সোনার কাঠির পরশ পেয়ে কত বন্ধু-বান্ধবী জেগে উঠতে লাগল, তারই মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল আমার গোষ্ঠদিদির বিষণ্ণ মুখখানি—আমার দুঃখিনী গোষ্ঠদিদি।

আমরা তখন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে গলির মধ্যে একটা নতুন বাড়িতে উঠে গিয়েছি। গলির মধ্যে বাড়িগুলো প্রায় সবই গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি, মধ্যে এক আঙুল পরিমিতও জায়গা নেই। আমাদের বাড়ির ছাতে উঠলে পাশাপাশি প্রায় পাঁচ-ছটা বাড়ির ছাতে যাওয়া যেত। বাড়ি সব পাশাপাশি থাকায় এবাড়ি-ওবাড়ি, মেয়েদের মধ্যে আলাপচারীও চলত। আমরা তখন সবে গিয়েছি, আশপাশের প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে মাদের তখনও পরিচয় ভাল ক'রে জমে নি। কৌতূহলসূচক চাহনি ও মাঝে মাঝে উভয় পক্ষ থেকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত দু-চারটে প্রশ্নোত্তর চলছে মাত্র।

মনে পড়ছে, তখন আশ্বিন মাস, পূজোর ছুটি চলছে। নিস্তব্ধ দুপুরবেলা দুই ভাই ঘুড়ি-লাটাই নিয়ে ছাতে উঠেছি। পাশের বাড়ির মস্ত ছাত দেখে লোভ হ'ল; অতি সন্তর্পণে সেখানে গিয়ে ঘুড়ি চড়ানো গেল।

দুপদাপ শব্দ হয়ে পাছে নীচের লোকেরা টের পেয়ে যায়—এই ভয়ে খুব সাবধানেই চলাফেরা করছিলুম; কিন্তু কিছু দূরেই আর একখানা ঘুড়ি উড়ছে দেখে আত্মহারা হয়ে গেলুম। অস্থির চেঁচিয়ে উঠল, দু—য়ো লাল বুলুক—কো—ও—ও—ও—, সুতো ছাড়ে না, জুতো খায় এক্—কো—ও—ও—ও—; স্বর্‌রে, নীচে পড়্, নীচে পড়্, মার্ টান, মার্ টান—ভো-কাট্টা—হো-হো-হো—

জয়ের আনন্দে উল্লসিত হয়ে অস্থিরের মুখের দিকে চেয়েছি মাত্র, এমন সময় সে লাটাইটা ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবা, পাহারাওয়ালা রে! তারপরে এক দৌড় ও তিন লাফে এ ছাত পেরিয়ে নিজেদের ছাতে পালিয়ে গেল।

সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেলুম, একজন মেয়ে, ইয়া লম্বা-চওড়া, রঙটি ময়লা, মাথার ওপরে চুড়ো ক'রে বাঁধা একরাশ চুল—কোমরে একখানা হাত, দুটি টানা বিশাল চোখে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমার হাতে ঘুড়ি, পালাতে পারি না। অপ্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘুড়ি নামাতে লাগলুম। মিনিট দুয়েক পরে সে আমার কাছে এসে বললে, তুমি কাদের বাড়ির ছেলে?

পাশের বাড়ির।

ও, তোমরা নতুন ভাড়াটে এসেছ বুঝি?

হ্যাঁ।

যে পালাল, সে তোমার কে হয়?

আমার ভাই।

দেখ, দুপুরবেলায় ওই উঁচু ছাতটায় উঠো না, বুঝলে?

পরের ছাতে উঠে ধরা প'ড়ে এত সহজে পরিত্রাণ পাবার আশা করি নি। আশা করেছিলুম, ধমকধামক—অন্তত কিছু বিরক্তিও সে প্রকাশ করবে। কিন্তু কিছুই না ক'রে বেশ প্রসন্ন মুখেই সে বললে, ওই ছাতের নীচে যে ঘর, সেখানে আমার শ্বশুর থাকেন। দুপুরবেলা তিনি ঘুমোন কিনা, ছাতের ওপরে দুপদাপ শব্দ হ'লে তিনি ঘুমুতে পারবেন না।

সেদিন আর কোনও কথা না ব'লে সে নীচে নেমে গেল। এরই দু-তিন মাস পরে এক শীতের দ্বিপ্রহরে মাতে আর গোষ্ঠদিদিতে কথা হচ্ছিল—

গোষ্ঠদিদি বলছিল, দুপুরবেলাটা আর কাটতে চায় না মা। গড়িয়ে গড়িয়ে কিছুক্ষণ কাটাই, তারপরে এঘর-ওঘর ঘুরি, খানিকক্ষণ ছাতে বেড়াই, আবার এসে গড়াই—

মা বললেন, দুপুরে পড় না কেন, গল্পের বই-টই? বেশ কেটে যাবে।

কোথায় পাব মা গল্পের বই? শ্বশুরের লাইব্রেরির আলমারিতে গাদা গাদা সব ইংরিজী বই ঠাসা, একখানিও বাংলা বই নেই। মধ্যে মধ্যে বাংলা বই আনিয়ে পড়ি, রোজ তো আর পাই না।

আচ্ছা, তোমার স্বামী কখনও আসেন?

আসেন বইকি মা। ব্রহ্মচর্যটা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন আসেন।—ব'লেই সে হাসতে লাগল। হাসি থামতে বললে, স্বামীর কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না, রাম-লক্ষ্মণ রয়েছে, ওদের সামনে আর—

গোষ্ঠদিদি আমাদের দুই ভাইয়ের নাম রেখেছিল রাম-লক্ষ্মণ। আমি রাম, অস্থির লক্ষ্মণ।

গোষ্ঠদিদির জীবন বিচিত্র। বাংলা দেশের কোন এক অখ্যাত গ্রামে অতি দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। জ্ঞান হবার আগেই তার বাপ-মা মারা যায়। মাতুল ছিল, সেও অতি দরিদ্র। তবুও সে অনাথিনী ভাগ্নীকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের পরিবারে পালন করতে লাগল। দু-তিন বছর যেতে না যেতে মামাও মারা গেল। মামী নিজের তিন-চারটে অপোগণ্ড শিশু ও গোষ্ঠদিদিকে নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠল। তাদের অবস্থাও এদের চাইতে খুব উন্নত ছিল না। বরাতে নেহাত অনাহারে মৃত্যু নেই ব'লে মরণ হয় নি। তবু কিন্তু এতদিন চলছিল মন্দ নয়। কারণ নিজের বাড়ি থেকে মামার বাড়ি ও মামার বাড়ি থেকে মামার শ্বশুরবাড়ির মধ্যে পথের দূরত্ব থাকলেও অবস্থার বৈষম্য বিশেষ কিছু ছিল না। কাজেই স্থানভেদে ব্যবস্থার কিছু ইতর-বিশেষ ঘটলেও তার মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু ছিল না। বৈচিত্র্য এল বিয়ের পর।

গোষ্ঠদিদির শ্বশুরঘর ছিল বিচিত্র। ব্রাহ্মণ ছিল তারা। শ্বশুর কোন সরকারী আপিসে বড চাকরি করতেন, দুশো টাকা পেন্‌শন পেতেন। আমরা যখন তাঁকে দেখেছি, তখন তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়ে গিয়েছে। ধপধপে সাদা বাবরি চুল ঘাড়ের ওপর লতিয়ে পড়েছে, সেই অনুপাতে লম্বা সাদা দাড়ি। ধুতি ও আলখাল্লা গেরুয়া রঙে ছোপানো। জুতো পায়ে দিতেন না, খড়ম পায়ে দিয়েই পেন্‌শন আনতে যেতেন।

আমি আর অস্থির এঁর নাম দিয়েছিলুম—পাগলা সন্ন্যেসী।

পাগলা সন্ন্যেসীর দুই ছেলে। বড়কে তিনি বিলেত পাঠিয়েছিলেন লেখাপড়া শেখবার জন্যে। সেখানে সে বছর পাঁচেক রহস্যজনকভাবে

কাটিয়ে নামের পেছনে গুটিকয়েক রহস্যজনক অক্ষর জুড়ে ফিরে এসে বর্মায় কি এক রহস্যজনক ব্যবসা করত ও প্রতি মাসে দশ তারিখের মধ্যে বাপকে দুশো টাকা নিয়মিতরূপে পাঠাত। একদিন আমি তাঁকে বড় ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, সে কোথায় থাকে, কি করে, কিছুই জানি না। চিঠিপত্র সেও লেখে না, আমিও লিখি না। গরু আমার বটে, কিন্তু কাদের মাঠে ঘাস খায়, তা জানি না। তবে দুধ নিয়মিত পাচ্ছি, তাতেই খুশি আছি।

পাগলা সন্ন্যেসীর ছোট ছেলে যিনি, তিনিই আমাদের গোষ্ঠদিদির দেবতা। ছেলেবেলাতেই ইস্কুল-টিস্কুল ছেড়ে দিয়ে নেশা করতে শেখে। মা মরা ছেলে, বাপ কোনদিনই কিছু বলতেন না তাকে। পাগলা সন্ন্যেসী ছিলেন সেই পুরনো দিনের ইংরেজীওয়ালা, তার ওপরে মাসে পাঁচশো টাকা মাইনেওয়ালা সরকারী চাকুরে। কলকাতায় প্রায় পনেরো কাঠা জমির ওপর পৈতৃক ভিটে—লোকে তাঁকে বড়লোক ব'লেই জানত। তাই ষোলো-সতেরো বছর বয়েস হতে না হতে ছেলের চরিত্র সংশোধন করবার জন্যে একটি প্রায়-সমবয়সী সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ধুমধাম ক'রে ছোট ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

আদিযুগে মানুষ ছিল যাযাবর। পশু পাখি কীট পতঙ্গ যাবতীয় প্রাণী যখন নিজেদের বাসা বেঁধে বাস করতে শিখেছে, মানুষ তখনও নিজের নীড় বাঁধতে শেখে নি। নেহাত প্রয়োজন ও বিপদ মানুষকে বাসা বাঁধতে শেখালেও অনেকের মনেই এই যাযাবর-প্রবৃত্তির বীজ সুপ্ত থাকে। অনুকূল অবস্থা পেলেই তা জেগে ওঠে। তাই মানুষের ইতিহাসের গোড়া থেকেই দেখা যায়, ঘরের বউ পালাচ্ছে, ঝি পালাচ্ছে, ছেলেপিলে পালাচ্ছে। এর মধ্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই, বৈচিত্র্যও কিছু নেই।

একদিন সকালবেলা শয্যাত্যাগ ক'রে পাগলা সন্ন্যেসী দেখলেন, তাঁর ছোট ছেলে সপরিবারে হাওয়া হয়েছে।

এ রকম একটা ব্যাপার বাড়িতে ঘটলে পাড়ার লোকে আইনতঃ আশা করে যে, খুব একটা হৈ-চৈ হবে। কিন্তু পাগলা সন্ন্যেসী এ নিয়ে কোনও অনুসন্ধান, এমন কি কোনও উদ্বেগও প্রকাশ করলেন না। তাঁর একটানা জীবনযাত্রা যেমন চলছিল, তেমনিই চলতে লাগল। তাঁর পুত্রবধূর বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল, তারা পুলিসে খবর দিলে। কিন্তু তাতেও তাদের সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষকালে তারা রটাতে লাগল যে, বুড়ো বাড়িখানা বড় ছেলেকে দেবার মতলবে ছোট ছেলে ও তার বউকে কোথায় উড়িয়ে দিয়েছে।

পাড়ার লোকদের তিনি অত্যন্ত তুচ্ছ করতেন ব'লে তারাও তাঁর ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। এই ব্যাপারের পর তারা খোলাখুলি-ভাবেই ব'লে বেড়াতে লাগল, লোকটা অতি বদমাইস।

বছর পাঁচ-ছয় এই ভাবে কাটবার পর একদিন সকালবেলায় পাগলা সন্ন্যেসীর নির্জন গৃহকুঞ্জ 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

ব্যাপার কি! তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি দেখলেন, পুত্র ও পুত্রবধূ ফিরে এসেছে। পুত্র একেবারে মহাদেব, পুত্রবধূ সাক্ষাৎ পার্বতী। পুত্রের কোমরে ল্যাঙট, সর্বাঙ্গ বিভূতিলিপ্ত, হাতে মাথা-সমান উঁচু ত্রিশূল। পুত্রবধূর অঙ্গ গৈরিক শাড়িতে আবৃত, মাথায় চূড়া ক'রে চুল বাঁধা, হাতে ত্রিশূল। উভয়ের চক্ষুই রক্তবর্ণ।

পাগলা সন্ন্যেসী তো এই দৃশ্য দেখে পরম পুলকিত হয়ে উঠলেন। বাইবেলের উদার পিতা ছেলের গৃহ-প্রত্যাগমনে উল্লসিত হয়ে সর্বাপেক্ষা স্থূল মেষশাবকটি বধ করেছিলেন। কিন্তু মেষপালনের কারবার এঁর ঘরে ছিল না, তাই তিনি ছেলের অভিনন্দনে মুরগী বধ করলেন গোটা

পাঁচ-সাত। তাঁর এক মুসলমান চাকর ছিল, তাঁর নিজের যা কিছু কাজ সে-ই করত। সকালবেলা তিনি বউমার হেঁসেলে খেতেন আর রাত্রের রান্না করত এই চাকর—একটি বড় মুরগীর রোস্ট, গ্রেট ঈস্টার্ন হোটেলের চারপয়সাওয়ালা একখানা রুটি দিয়ে তিনি নিত্য এই রোস্টের সদ্ব্যবহার করতেন।

ছেলে ও বউমা ফিরে আসায় দু-বেলা মুরগী বধ হতে লাগল। বাড়িতে মহোৎসব শুরু হ'ল। ছোট ছেলে যে এমন 'তালেবর' হবে, এ কথা তিনি কোনদিন কল্পনা করতে পারেন নি। গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থের এমন synthesis ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যেরও সাধ্যের অতীত ছিল।

পাড়ার অধিকাংশ লোকই তাঁকে অপছন্দ করলেও অনেকে কৌতূহলপরবশ হয়ে ছেলে ও ছেলের বউকে দেখতে আসতে লাগল। ছেলে বাবার সামনেই গাঁজা ও চরস ফুঁকতে লাগল সারাদিন, রাত্রে কারণ উড়তে লাগল বোতল বোতল।

এতদূর অবধি চলছিল মন্দ নয়, কিন্তু পুত্রবধূও যখন শ্বশুরের শ্মশ্রু গাঁজার ধোঁয়ায় ধূমায়িত করতে আরম্ভ করলেন, তখন পাড়ার লোকে গালাগালি দিতে লাগল। আমাদের পাগলা সন্ন্যেসী কিন্তু এসব ভ্রূক্ষেপ করতেন না। বেলেল্লাপনা করুক, কিন্তু ছেলে-বউ যাতে বাড়িতেই থাকে, সে বিষয়ে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি; কিন্তু গৃহাশ্রমে ব'সেই সাধনমার্গে চলবার সর্বরকম সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও একদিন তারা আবার চ'লে গেল।

বছর ছয়েক পরে একদিন পুত্র বাড়ি ফিরে এল, সঙ্গে স্ত্রী নেই। বছর খানেক ধ'রে পেটের নানা রকম অসুখে ভুগে হরিদ্বারে তিনি দেহরক্ষা করেছেন। গৃহস্থ ভদ্রলোকের মেয়ে গাঁজা, চরস ও কারণ—এই সব দেবভোগ্য জিনিস বেশিদিন সহ্য করতে পারলেন না।

ছেলে বাড়িতে ফিরে সন্ন্যাসীর বহির্বাস অর্থাৎ ল্যাঙট ছেড়ে আবার ধুতি পরা শুরু ক'রে দিলে। স্ত্রীর শোকে অনেকে গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, কিন্তু এ ব্যক্তি স্ত্রীর শোকে সন্ন্যাস ত্যাগ ক'রে গৃহী হবার দিকে মন দিলে। পাগলা সন্ন্যেসী বছরখানেক ছেলের হালচাল দেখে আবার তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

পছন্দ-অপছন্দের বালাই যদি না থাকে, তবে কোনও দেশে কোনও কালে কোনও ছেলেমেয়েরই বিয়ে আটকায় না। পাগলা সন্ন্যেসীর ছেলের বিয়েও আটকাল না। আমাদের গোষ্ঠদিদি শিশুকাল থেকে মনে মনে শিবপুজো করত, তাই প্রজাপতি তাকে শিব জুটিয়ে দিলেন।

গোষ্ঠদিদির যখন বিয়ে হ'ল, তখন তার পনেরো-ষোল বছর বয়স। বাড়ন্ত গড়ন ব'লে তাকে বয়সের চেয়ে অনেক বড় দেখাত। সে সময়ে বারো বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিতে না পেরে কত বাঙালী বাপ-মা যে নরকস্থ হ'ত, একমাত্র চিত্রগুপ্তই তার হিসাব দিতে পারেন। কিশোর বয়সে এই সুন্দরী ধরণী রঙিন স্বপ্নের মতন যখন মেয়েদের মনে অতি সন্তর্পণে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, মেঘমণ্ডিত বর্ষার প্রভাতে ক্ষীণ রবিকরের মত স্তিমিত যৌনচেতনা যখন তার অবজ্ঞাত মানসলোকে ঈষৎ চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে, অজানিত সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎজীবন অনভিজ্ঞ সংসারবুদ্ধির প্রতিফলকে যখন রঙিন হতে থাকে, জীবনের সেই পরম সন্ধিক্ষণে অভিভাবকদের আর্তনাদ—গেল রাজ্য, গেল কুল, চোদ্দ পুরুষ বুঝি নরকস্থ হ'ল রে—অন্তর ও বাহিরের এই বিষম হট্টগোলের মধ্যে গোষ্ঠদিদির জীবনে একদিন সানাইয়ের সাহানা বেজে উঠল।

বিয়ে দিয়ে ঘরে এনেই পাগলা সন্ন্যেসী বউমাকে ছেলের গুণের কথা সব খুলে বললেন। অতীতকালে যিনি তাঁর পুত্রবধূরূপে ঘরে এসেছিলেন,

স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে তিনি কি নির্বুদ্ধিতা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কয়েকদিন ধ'রে তাকে বিধিমতে তালিম দিলেন।

এদিকে ছেলে নতুন খেলনা পেয়ে দিন কতক খুব খুশি রইল। গৃহাশ্রমে ফিরে এলেও সন্ন্যাসাশ্রমের নেশাপত্র তখনও সে ছাড়ে নি। একলা ঘরে ব'সে নেশা করায় কোন মজা নেই। কিছুদিন যেতে না যেতে সে বউকেও গাঁজা ও মদ খাবার জন্যে জেদ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কিন্তু গোষ্ঠদিদি কিছুতেই নেশা করতে রাজী নয়। শেষকালে অবাধ্য স্ত্রীর ওপর বীতশ্রদ্ধ্ হয়ে আবার একদিন সে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

পাগলা সন্ন্যেসী শুনে বললেন, গেছে যাক, আবার ফিরে আসবে, তুমি কিছু ভেবো না বউমা।

এই ইতিহাস আমরা কিছু পাগলা সন্ন্যেসীর মুখে ও কিছু গোষ্ঠদিদির মুখে শুনেছি।

এই পাগলা সন্ন্যেসী ও তাঁর পুত্রবধূ ছিল আমার ও অস্থিরের প্রাণের বন্ধু। গোষ্ঠদিদি আমাকে রাম-ভাই আর অস্থিরকে লক্ষ্মণ-ভাই ব'লে ডাকত। পাগলা সন্ন্যেসী আমাদের রামবাবু আর লক্ষ্মণবাবু ব'লে ডাকতেন। আমরা তাঁকে ডাকতুম পাগলা সন্ন্যেসী ব'লে। তিনি বলতেন, আমার বাপ-মা, ছেলেপুলে, বন্ধু-বান্ধব, কেউ আমার আসল নাম ধ'রে ডাকে নি। তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, এই আমার আসল নাম, এই আমার স্বরূপ, এই আমার সারা জীবনের পরিচয়।

একদিন বিকেলে আমরা গোষ্ঠদিদির সঙ্গে ব'সে গল্প করছি, এমন সময়ে পাগলা সন্ন্যেসী সেখানে এসে আমাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, আট-দশটা দরজাওয়ালা মস্ত বড় হলঘর।

একটি কি দুটি মাত্র দরজা খোলা, সমস্ত ঘরখানাই প্রায় অন্ধকার। দেওয়ালের গায়ে ঘেঁষানো বড় বড় সারবন্দী আলমারিতে বই ঠাসা। এক ধারে একখানা সরু খাট, তাতে বিছানা পাতা। বিছানার চাদর বালিশের খোল সব গেরুয়া রঙের। খাটের ওপরে বালিশের চারি-পাশে অগোছালভাবে একরাশ বই ছড়ানো।

পাগলা সন্ন্যেসী খাটের ওপরে বসলেন। সামনেই মান্ধাতার আমলের পুরনো গোটা দুই সোফা, তারই ওপরে আমাদের বসিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। ডফ্ সায়েবের ইস্কুলে পড়ি শুনে ডফ্ সায়েব সম্বন্ধে, ক্রীশ্চান ইস্কুল ও তাঁদের আমলের ইংরেজ অধ্যাপকদের হালচাল ইত্যাদি অনেক মজার গল্প শোনালেন। ওঠবার সময়ে বললেন, দেখ, তোমাদের সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হ'ল, তখন রোজ আসবে, বুঝলে ?

পাগলা সন্ন্যেসীর মত সর্ববিষয়ে এমন উদার ও অদ্ভুত লোক আমি জীবনে দুটি দেখি নি। আমাদের বয়েস তখন দশ-বারো বৎসর ও তাঁর বয়স সত্তর-বাহাত্তর, অথচ আমাদের সঙ্গে কোথাও কোন বিষয়েই তাঁর বাধত না। আমাদের লাট্টু ঘোরানো, ঘুড়ি ওড়ানো, জানোয়ার পোষা প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ আমাদের চাইতে কিছু কম ছিল না। পাড়ার লোকেরা কেন যে তাঁকে বদমাইস বলত, তা আমরা ভেবে ঠিক করতে পারতুম না। এঁরই বাড়ির ভেতর দিয়ে বিকেলে আমরা লতুদের বাড়ি পালিয়ে যেতুম। তাঁর কাছে আমাদের গোপন কিছুই ছিল না। আমরা কোথায় যাই আর কেমন ক'রে যাই, কি ক'রে ঘাসওয়ালাকে ফাঁকি দিয়ে লতুদের বাড়িতে যাবার ব্যবস্থা করেছি, সে সব শুনে তিনি খুব উপভোগ করতেন আর হো-হো ক'রে হাসতে থাকতেন।

সে সময়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকলেই কথায়-বার্তায় ব্রাহ্মদের

খোঁচা দিতেন, কিন্তু পাগলা সন্ন্যেসীর মুখে কখনও ব্রাহ্মদের নিন্দা শুনি নি। ব্রাহ্মসমাজের কথা উঠলে তিনি হেসে বলতেন, ওদের খেয়াল হয়েছে, সমাজ সংস্কার করবে, তা করুক না।

একদিন, বোধ হয় সেদিন শনিবার, বেলা তিনটে হবে, আমরা পাগলা সন্ন্যেসীর ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি খাটে আধ-শোওয়া হয়ে কি একখানা বই পড়ছেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি বই রেখে উঠে ব'সে বললেন, এস এস, রামবাবু, লক্ষ্মণবাবু, ব'স। মন আমার তোমাদেরই খুঁজছিল, ঠিক সময়ে এসে পড়েছ।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি পড়ছিলেন ?

আরে, সেইজন্যেই তো তোমাদের খুঁজছিলুম। পড়ছি শেলী; একলা প'ড়ে মজা নেই ব্রাদার, বড় সুসময়ে এসেছ।

এই ব'লে বই রেখে তিনি উঠে পড়লেন। একটা বেঁটে আলমারি খুলে একটা সজারু-কাঁটার বাক্স বের ক'রে নিয়ে আবার খাটে এসে বসলেন। আমাদের উদ্‌গ্রীব দু-জোড়া চোখ বাক্সর ওপর গিয়ে পড়ল। তিনি বাক্স থেকে বার করলেন এক-হাত-টাক লম্বা টকটকে লাল একটা তামার কলকে। কলকে একটা অতি সাধারণ জিনিস, কিন্তু তার এমন সুন্দর রূপ হতে পারে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। সেটাকে হাতে নিয়ে দেখবার ইচ্ছা হতে লাগল, কিন্তু সাহস ক'রে কিছু বলতে পারলুম না। তারপরে বেরুল একটা মোটা ছোট্ট চন্দনকাঠের চাকতি, একটা সুন্দর ঝিনুকের বাঁটওয়ালা চকচকে ছুরি। তারপরে রূপোর পানের ডিবে থেকে কি কতকগুলো জড়িবুটি বের ক'রে বেছে নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা গোলাপজল দিয়ে টিপতে টিপতে শেলী সম্বন্ধে গল্প বলতে লাগলেন। কি ক'রে কবি বাড়ির লোকদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বিয়ে করলেন, স্ত্রীর সঙ্গে বনল না, আবার জীবনে নতুন সঙ্গিনী

এল। বাড়িঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন কোন্ বিদেশে, তারপরে জলে ডুবে মৃত্যু—উপন্যাসের কাহিনীর চেয়ে কবির সেই চিত্তাকর্ষক জীবন-কথা শুনতে শুনতে আমাদের বালক-মন ব্যথিত হয়ে উঠতে লাগল।

কথার সঙ্গে সঙ্গে হাত সমানভাবেই চলছিল। বেশ ক'রে গাঁজায় কয়েকটি দম লাগিয়ে ঘরের মধ্যে দস্তুরমতন একটি মেঘলোক সৃষ্টি ক'রে পাগলা সন্ন্যেসী আগের বইখানা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলতে লাগলেন, তোমাদেব কাছে শেলীর কবিতা পডব। ভয় পেও না, আমি বুঝিয়ে দোব, কোন কষ্ট হবে না বুঝতে।

এই ব'লে একটা পাতা বের ক'বে বললেন, এ কবিতাটার নাম Alastor।

প্রথমে তিনি Alastor কবিতার ভাবার্থ ব'লে গেলেন, তারপরে সমস্ত কবিতাটি আবৃত্তি ক'রে পড়লেন। এ রকম অসামান্য আবৃত্তি এর আগে আমরা শুনি নি। মেঘগর্জনেব মতন সেই কণ্ঠস্বর প্রকাণ্ড হলঘরের প্রতিধ্বনিকে জড়িয়ে নিয়ে গমগম ক'রে আমাদের কানের মধ্যে দিয়ে সমস্ত দেহটাকে ঝঙ্কার দিতে লাগল। কবিতার ভাষা বোঝবার মত বিদ্যে আমাদের ছিল না, তার ভাবার্থ একটু আগেই শুনেছি মাত্র। শুধু ধ্বনি ও সুর মনের মধ্যে একটার পর একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতে লাগল। চোখের সামনে যেন দেখতে লাগলুম, Alastor-এর কবি চলেছে দূরে, সুদূরে—তার অন্তরে যে চেতনা জেগেছে তারই সন্ধানে। চলেছে, চলেছে—কত দেশ, কত মেয়ে এল তার জীবনে, তবুও সে চলেছে, বিরামবিহীন। চলতে চলতে জরায় তার দেহ শুকিয়ে গেল। অমন যে সুন্দর কিশোর, তাকে দেখলে তখন ভয় হয়, চেনা যায় না। তার বুকের মধ্যে যে অতৃপ্তি, দুর্লভকে লাভ করবার যে পিপাসা, তারই আগুন শুধু দুই চোখে ধকধক ক'রে

জলছে। গ্রামের লোকেরা দয়া ক'রে তাকে দুটি খেতে দেয়, সে আবার চলা শুরু করে। পাহাড়ের চুড়োয় চুড়োয় সে ঘোরে, লোকেরা মনে করে—সে বুঝি ঝড়ের অন্তরাত্মা, মানুষের রূপ ধরেছে। শিশুরা তাকে দেখে সভয়ে জননীর বুকে মুখ লুকোয়। দুনিয়ার কেউ তার মনের কথা বোঝে না। সকলেই সভয়ে সবিস্ময়ে বা শ্রদ্ধায় তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে থাকে। শুধু—

Youthful maidens, taught
By nature, would interpret half the woe
That wasted him, would call him with false names
Brother and friend, would press his pallid hand
At parting, and watch him through tears, the path
Of his departure from their father's door.

কত অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য! সুন্দরে ভয়ালে কি আশ্চর্য সংমিশ্রণ—তারই মধ্য দিয়ে আমাদের কবি চলল মৃত্যুর দিকে। মুখে এক মন্ত্র—

—'Vision and love'
—I have beheld
The path of thy departure.] Sleep and death
Shall not divide us long ! [

তারপরে একদিন অতি দূর দুর্গম শান্ত সুন্দরী প্রকৃতির কোলে তার শ্রান্ত দেহ বিছিয়ে দিলে—শান্তিময়ী মৃত্যু এসে তাকে নিয়ে চ'লে গেল।

পড়া শেষ ক'রে পাগলা সন্ন্যেসী বই বন্ধ ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার পরে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, তবুও তো Alastor-এর কবির বরাতে—

One silent nook
Was there. Even on the edge of that vast mountain
…that seemed to smile
Even in the lap of horror—

ছিল হে রামবাবু! আমাদের বরাতে যে তাও জোটে না, কি বল?

ব'লেই তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। অন্ধকার হয়ে এলেও স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাঁর চোখ থেকে একসঙ্গে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝর-ঝর ক'রে ঝ'রে পড়ল। আমার চোখও জলে ভ'রে উঠেছিল। অস্থিরের দিকে ফিরে দেখলুম, তার চোখও অশ্রুতে পরিপূর্ণ।

সেদিন থেকে পাগলা সন্ন্যেসীর সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা খুবই বেড়ে গেল। তাঁর কাছে গিয়ে কবিতার আলোচনা হতে লাগল। আলোচনা মানে, তিনি শেলীর কবিতা প'ড়ে আমাদের শোনাতেন আর ব্যাখ্যা করতেন, আর আমরা তার মধ্যে থেকে চটকদার কথা বেছে নিয়ে মুখস্থ করতুম।

একদিন পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, আজ রামবাবু, তুমি একটা কবিতা আবৃত্তি কর।

নিজেদের কোন একটা কেরামতি দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে একটু প্রশংসা পাবার ইচ্ছা সর্বদাই মনের মধ্যে জাগ্রত ছিল। গোষ্ঠদিদি আমাদের মুখের সামনে ও আমাদের আড়ালে মার কাছে নিয়ত আমাদের প্রশংসা করত আর বাহাদুরি দিতে থাকত। সে কথায় কথায় বলত, আমার রাম-লক্ষ্মণ ভাই আছে, আমার ভাবনা কিসের? কিন্তু পাগলা সন্ন্যেসী আমাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোন শ্রুতিসুখকর মন্তব্য করতেন না ব'লে ক্ষুণ্ণ না হ'লেও, সে সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা উদ্‌গ্রীব

আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেদিন আবৃত্তি করার প্রস্তাব করামাত্র মনে হ'ল, আজ একটু কায়দা দেখিয়ে দেওয়া যাক তা হ'লে।

ইস্কুলে প্রাইজ-ট্রাইজ না পেলেও প্রাইজের জলসায় আমার খাতির ছিল। প্রায় প্রতি বছরেই প্রাইজের সময় আমাকে একটা ইংরেজী ও একটা বাংলা কবিতা আবৃত্তি করতে হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে হাততালিও পেতুম, যদিও সে হাততালির অর্থ তখন সম্যক বুঝতে পারি নি।

সে সময়ে বাংলা দেশের সর্বত্রই হেমচন্দ্রের 'বাজ্‌রে শিঙা বাজ্‌ ঐ রবে' কবিতাটির খুব আদর ছিল। সভা-সমিতি জমাবার ওইটি ছিল একটি অব্যর্থ বাণ। দু-তিন বার কবিতাটি আমিও আবৃত্তি করেছিলুম। পাগলা সন্ন্যেসী বলামাত্র আমি তড়াক ক'রে উঠে বুক চিতিয়ে এমন চীৎকার ক'রে আবৃত্তি শুরু ক'রে দিলুম যে, বাড়ির ভেতর থেকে গোষ্ঠ-দিদি দৌড়তে দৌড়তে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেল।

আবৃত্তির পর ঘরখানা গমগম করতে লাগল। গোষ্ঠদিদির সঙ্গে চোখোচোখি হতে দেখলুম, তার মুখে চোখে প্রশংসা উপচে পড়ছে।

গোষ্ঠদিদি বাড়ির ভেতর চ'লে গেল, আমিও কোচে ব'সে পড়লুম। বোধ হয় মিনিট খানেক চোখ বুজে চুপ ক'রে ব'সে থেকে পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, কি শিঙে ফোঁকার কবিতা আবৃত্তি করলে হে রামবাবু! ছিঃ, তোমার কাছ থেকে এ আশা করি নি।

ইস! একেবারে দ'মে গেলুম।

এক মুহূর্ত পরে পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, আচ্ছা লক্ষ্মণবাবু, এবার তুমি একটা আবৃত্তি কর।

অস্থির উঠে বিনিয়ে বিনিয়ে আবৃত্তি করলে—

"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে
হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।"

অস্থিরের আবৃত্তি শেষ হতে না হতে পাগলা সন্ন্যেসী ব'লে উঠলেন, বা বা লক্ষ্মণবাবু, তুমি ফুল মার্কস পেলে। ছি ছি রামবাবু, তোমার কাছ থেকে এ আশা করি নি। শেষে কিনা ওই শিঙে ফোঁকার কবিতা আবৃত্তি করলে!

সজারু-কাঁটার বাক্স বেরুল। গাঁজা টিপতে টিপতে বললেন, এ বিদ্যেটা আমায় ছোট ছেলে শিখিয়েছে। তা না হ'লে আমরা ছেলেবেলা থেকে সরাব-টরাব খাই। গাঁজা খেতে শেখালে আমার ছোট ছেলে আর বউমা—তোমাদের গোষ্ঠদিদির সতীন।

তিন-চারটি দম লাগিয়ে কলকেটি উল্টে রেখে পাগলা সন্ন্যেসী জিজ্ঞাসা করলেন, লক্ষ্মণবাবু, যে কবিতাটি আবৃত্তি করলে, সেটি কার লেখা?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

ঠাকুর! কোথাকার ঠাকুর? পাথ্‌রেঘাটার, না, জোড়াসাঁকোর?

জোড়াসাঁকোর।

ও, তা হ'লে দেবেন ঠাকুরের ছেলে হবে। হ্যাঁ, দেবেন ঠাকুরের ছেলেরা খুব তালেবর বটে। বেশ লিখেছে হে ছোকরা—"মাতৃহারা মা যদি না পায় তবে আজ কিসের উৎসব!" ছি ছি রামবাবু, তোমার ওটা কি কবিতা! লক্ষ্মণবাবু, তুমি আজ ফুল মার্কস পেয়েছ।

আমাদের বাড়িতে পুজো কিংবা বড়দিনের ছুটির সময় এক ভদ্রলোক এসে দিন কয়েক ক'রে থাকতেন। এঁর নাম ছিল বিপিন চক্রবর্তী। ইনি মফস্বলে সরকারী চাকরি করতেন। বিপিনবাবু ছিলেন কবি এবং সে সময় একখানা কবিতার বইও ছাপিয়েছিলেন, নাম তার 'বুদ্বুদ'।

কবিতা লেখবার ক্ষমতা চক্রবর্তী মহাশয়ের কতখানি ছিল তা বলতে পারি না, তবে তাঁর দূরদৃষ্টি যে খুব ছিল তা বইয়ের নামকরণ দেখেই বোঝা যায়।

কিন্তু কাব্যপ্রতিভা থাক্ আর নাই থাক্, বিপিনবাবুর প্রকৃতিটি ছিল একেবারে কবির মত—যা কবিদের মধ্যেও দুর্লভ। এক কথায় বলতে গেলে তিনি অতি 'মহাশয় ব্যক্তি' ছিলেন। আমার আর অস্থিরের একটা আলাদা ঘর ছিল। বিপিনবাবু আমাদের বাড়িতে এলে আমাদের ঘরেই তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হ'ত, আর তাঁর সমস্ত কিছু তদারকের ভার আমাদের দুই ভাইয়ের ওপরে পড়ত।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা ছিল। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে পরিচয় এবং রবীন্দ্রনাথের একজন মহাভক্ত ছিলেন তিনি। সে সময়ে সাহিত্যচর্চা অতি অল্প লোকই করতেন, যাঁরা করতেন তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের রসগ্রাহী লোক খুব কমই ছিল। ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ এবং ব্রাহ্মসমাজের বাইরে গোনাগুন্তি কয়েকজন ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা উপভোগ করা তো দূরের কথা, সকলে তাঁকে গালাগালিই দিত। এমন লোকও আমরা দেখেছি, যারা অন্য সাহিত্যিকদের যে সব দোষগুলোকে গুণ ব'লে কীর্তন করত, সেই সব দোষ রবীন্দ্রনাথের ওপর আরোপ ক'রে তাঁকে গালাগালি দিতে থাকত। এই সব ব্যক্তিগত আক্রমণের সঙ্গে কবিতা-সমালোচনার কোন যোগ না থাকলেও রবীন্দ্র-কাব্যের রস-গ্রহণ তারা ওই মাপকাঠি দিয়ে করত। এখন মনে হয়, দেশসুদ্ধ লোক রবীন্দ্রনাথের এমন ভক্ত কি ক'রে হয়ে উঠল!

যাই হোক, রাত্রে ঘুমোবার আগে বিপিনবাবুর সঙ্গে আমাদের কাব্য-আলোচনা হ'ত। আলোচনা শুরু হতেই আমরা কায়দা ক'রে শেলীকে এনে ফেলতুম। তারপরে এতদিন ধ'রে পাগলা সন্ন্যেসীর যে সব চটকদার বাক্য আমরা মুখস্থ করেছিলুম, গড়গড় ক'রে বিপিনবাবুর কাছে তা ওগরাতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

আমাদের বয়েসী ছেলেদের মুখে সেই সব বিজ্ঞজনোচিত বাক্য শুনে

বিপিনবাবুর চক্ষু একেবারে চড়কগাছে উঠে গেল। আমরা তাঁকে দম নেবার সময় না দিয়ে Episychidion, Prince Alhanase, Ode to Intellectual Beauty, The Revolt of Islam-এর Dedication থেকে ছাঁকা ছাঁকা লাইন, যা সব এই রকম সুযোগে ছাড়বার জন্যে মুখস্থ ক'রে রেখেছিলুম, তাই পাগলা সন্ন্যেসীর অনুকরণে আমি আবৃত্তি করতে লাগলুম, আর অস্থির চোখ বুজে বুড়ো মানুষের মতন ধরা-ধরা গলায় বলতে লাগল, আহা-হা, এর কি তুলনা আছে!

বিপিনবাবু তো খুব খুশি। এমন কি আমাদের হালচাল দেখে ভদ্রলোক দস্তুরমত ভড়কেই গেলেন। একদিন তিনি মাকে ডেকে বললেন, ঠাকরুণ, আপনার এই স্থবির ও অস্থির এরা মহাপুরুষ।

মা বললেন, হ্যাঁ, আমাদের ছলনা করতে এসেছেন।

তিনি হেসে বললেন, দেখে নেবেন আপনি, এদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তখনও জ'মে ওঠে নি। ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে সব গান ছিল তার সুর, বাঁধুনি ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা বুঝতে পারতুম মাত্র। 'কথা ও কাহিনী'র দু-একটা কবিতার সঙ্গে যা পরিচয় হয়েছিল, তা খুব ভাল লাগত; কিন্তু কেন যে ভাল লাগত, তা প্রকাশ করতে পারতুম না। যদিও অন্য বাংলা কবিতার সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে তা অনুভব করতুম মাত্র। আমাদের কাব্যালোচনার মজলিসে বাংলা কবিতার কথা উল্লেখ করবার জো ছিল না। তখনকার দিনে বাঙালীরা হেম, নবীন, মধুসূদনকে, অধিকাংশ স্থলে না প'ড়েই, দেবতা জ্ঞান করত। পাগলা সন্ন্যেসী যখন তাঁদেরই

নস্যাৎ ক'রে দিতেন, তখন আর সেখানে রবীন্দ্রনাথের কথা তুলতেই সাহস হ'ত না, রসভঙ্গ হবার ভয়ে।

বিপিনবাবুর সঙ্গে আমাদের ভাব খুব জ'মে ওঠবার পর আমরা তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর কাব্য সম্বন্ধে যে সব কথা শুনতে লাগলুম, তাঁর ছন্দ, তাঁর প্রকাশভঙ্গী, কবিতার বিষয়নির্বাচন ও ব্যঞ্জনা—এই সব কথা পাগলা সন্ন্যেসীর কাছে অতি সন্তর্পণে ছাড়তে আরম্ভ ক'রে দেওয়া গেল, আর পাগলা সন্ন্যেসীর বাক্যাবলী বিপিন-বাবুকে গিয়ে বলতে লাগলুম। ফলে উভয় স্থানেই দিনে দিনে আমাদের খাতির বেড়ে যেতে লাগল।

এমনই দিন চলেছে, এরই ফাঁকে ফাঁকে লতুদের বাড়িও যাওয়া-আসা ঠিক চলেছে, এমন সময় একদিন রাত্রে বিপিনবাবু আমাদের রবীন্দ্রনাথের 'অসময়' ও 'দুঃসময়' এই কবিতা দুটি শোনালেন। রবীন্দ্রনাথ যে খুব বড় কবি মনে মনে সে কথা নিশ্চিত স্বীকার করলেও, স্রেফ মুরুব্বিয়ানা ক'রে পাগলা সন্ন্যেসীর বুকনিগুলো শোনাবার লোভে বিপিনবাবুর কাছে আমরা সে কথা স্বীকার করতুম না। কিন্তু এই কবিতা দুটি আমাদের মুখ থেকে পাণ্ডিত্যের মুখোশ একেবারে উড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেল। 'অসময়' ও 'দুঃসময়' আমাদের এত ভাল লাগল যে, তখুনি দুই ভাই কবিতা দুটি মুখস্থ ক'রে ফেললুম।

কয়েকদিন পরে পাগলা সন্ন্যেসীর কাছে কোন ছুতোয় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ তুলে দুজনে সেই দুটো কবিতা তাঁকে আবৃত্তি ক'রে শুনিয়ে দিলুম।

কবিতা দুটো শুনে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে হকচকিয়ে চেয়ে থেকে একেবারে উছলে উঠলেন। আহা, অদ্ভুত, অদ্ভুত! খুব কবিতা লিখেছে হে তোমাদের রবীন্দ্রনাথ। কোনও বাঙালী এর আগে এমন কবিতা লিখতে পারে নি।

চটপট উঠে সজারু-কাঁটার বাক্স নিয়ে এসে গাঁজা তৈরি করতে করতে বলতে লাগলেন, রবীন্দ্রনাথের বই কোথায় পাওয়া 'যায় আমায় বল তো? ওরা নাটক লিখে বাড়িতে অভিনয় করে শুনেছি, কিন্তু এমন কবিতা লেখে তা জানতুম না।

গাঁজা-টাঁজা টেনে পাগলা সন্ন্যেসী ভোম হয়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলেন। তারপর হঠাৎ একবার উছলে উঠে বললেন, আহা-হা, কি কথাই বলেছে হে—

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে—

বল না রামবাবু, আমার কি ছাই জানা আছে, তুমি বল, তোমার সঙ্গে আমিও বলি।

কিশোর কণ্ঠের সঙ্গে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর গ'র্জে উঠল—

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে,
দীর্ঘ ভ্রমণ একদিন হবে অন্ত রে
শান্তি সমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে—

রামবাবু, লক্ষ্মণবাবু, এই শেষ বয়সে তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল। তোমাদের এখনও অনেক দূর চলতে হবে। দেখবে, জীবনে কত দুঃখ, কথা ব্যর্থতা, কত অশান্তি আসবে। কারুর মুখেই শুনবে না যে, সে বেশ ভাল আছে। এই জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কে এমন ক'রে বুক ঠুকে আশ্বাস দিতে পারে—

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে?

ভাগ্যে তোমাদের সঙ্গে ভাব হয়েছিল!

সুজাতার মৃত্যুর পরদিন অতি প্রত্যুষে বাবা দরজা ধাক্কা দিয়ে আমাদের দুই ভাইকে ঘুম থেকে তুলে হেদোয় বেড়াতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পাক পাঁচেক চক্কর দিয়ে বাড়িতে এসেই বললেন, জামা-টামা ছেড়ে বই নিয়ে এসে পড়তে ব'স।

তিনি হয়তো মনে করেছিলেন, সব দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টির অভাব ঘটাতেই আমাদের পক্ষে এমন বেয়াড়া হয়ে পড়া সম্ভব হয়েছে। পড়তে বসামাত্র আমার ইতিহাসের বইখানা হাতে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, কুতবউদ্দিন কে ছিল?

আমার মন তখন কুতবউদ্দিনের চেয়ে অনেক বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তি—Merry Godwin, Emily Viviana-র চিন্তায় মশগুল। কুতবউদ্দিনের মতন লোক সেখান থেকে চিরদিনের জন্যে নির্বাসিত হয়েছে। বাবার মুখে সে নাম শুনে কুতবমিনারের চিন্তায় কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় খটখট শব্দ শুনে সামনে চেয়ে দেখি যে, ধীরপদক্ষেপে পাগলা সন্ন্যেসী আসছেন আমাদের পড়বার ঘরের দিকে।

খড়ম পায়ে খটখট শব্দ করতে করতে তিনি আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরের মধ্যে একখানা তক্তাপোশ আর তার ধারে খানকয়েক চেয়ার সাজানো থাকত। আমরা বসতুম তক্তাপোশে আর বাবা বসতেন চেয়ারে। ঘরের মধ্যে কোনও গুরুজন থাকলে চেয়ারে বসা আমাদের বারণ ছিল। যাই হোক, পাগলা সন্ন্যেসী ঘরের মধ্যে আসতেই বাবা তাঁকে নমস্কার ক'রে বললেন, বসুন।

পাগলা সন্ন্যেসী মিনিটখানেক চুপ ক'রে ব'সে থেকে আমাদের দেখিয়ে বললেন, আমি এই রামবাবু আর লক্ষ্মণবাবুর বন্ধু।

আমরা প্রমাদ শুনতে লাগলুম। মনে হ'ল, ফাঁড়া এখনও কাটে নি

বোধ হয়, নইলে পাগলা সন্ন্যেসীর মতন লোক এমন কাঁচা কাজ করবেন কেন ?

বাবা তো একেবারে অবাক! আমাদের দিকে একবার চেয়ে তাঁর দিকে মুখ করতেই তিনি বললেন, আমরা এদের রাম-লক্ষ্মণ ব'লে ডাকি। স্থবির-অস্থির আবার কোন্ দেশের নাম মশায় ?

বাবা একটু হাসবার চেষ্টা করলেন মাত্র।

পাগলা সন্ন্যেসী আমাদের দেখিয়ে বললেন, এ দুটি কি আপনার ছেলে ?

হ্যাঁ।

এদের মা বেঁচে আছেন ?

হ্যাঁ।

মা বেঁচে থাকতেই এই!

বাবা মনে করলেন, তিনি বোধ হয় আমাদের নামে কোন গুরুতর অভিযোগ করতে এসেছেন। একটু সঙ্কুচিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসব প্রশ্ন করছেন বলুন তো ?

একটু কারণ আছে। দেখুন, রামবাবু আর লক্ষ্মণবাবু আমার বন্ধু —বিশেষ বন্ধু। আপনি কাল রাতে এদের ওপর যখন অমানুষিক অত্যাচার করছিলেন, তখন আমার উচিত ছিল আপনার হাত থেকে এদের রক্ষা করা। কিন্তু আমি বৃদ্ধ, হয়তো সামর্থ্যে আপনার সঙ্গে পারব না, তাই ভেবে তখন আসি নি। কিন্তু আপনি এদের যত মেরেছেন, তার প্রত্যেকটি আঘাত আমায় লেগেছে। বারদিগর এমন হ'লে আমাকে আসতে হবে।

এমন সব কথা বাবার মুখের সামনে কেউ বলতে পারে, তা আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল। বাবা সব শুনে একটু আমতা আমতা

ক'রে বললেন, বড় অবাধ্য ছেলে মশায়, কিছুতেই কথা শুনতে চায় না। বড় বদ ছেলে, আপনি চেনেন না এদের।

আমি চিনি না এদের!

পাগলা সন্ন্যেসীর হাসি শুনে বাবা চমকে উঠলেন।

আমি চিনি না এদের! আপনি চেনেন না এদের। আমার তো মনে হয়, এরা মহাপুরুষ। আপনার ভাগ্য যে, এমন সব ছেলে আপনার ঘরে জন্মেছে। কিন্তু এদের মানুষ করতে পারবেন না আপনি, আমি দিব্যচক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি।

বেশ বোঝা গেল, আমাদের প্রশংসা শুনে বাবা খুশি হয়েছেন। তিনি বললেন, দেখুন, কথা না শুনলে আমার বড় রাগ হয়, আর এক-বার রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না। এদের বিকেলে বাড়ি থেকে বেরুতে বারণ করি, কিন্তু কিছুতে ওরা সে কথা গ্রাহ্য করে না। কি করি বলুন তো?

কেন বাড়ি থেকে বেরুতে বারণ করেন?

বাইরে বদ সঙ্গী জুটতে পারে।

আচ্ছা, আপনি আর ক বছর এদের বাড়িতে বন্ধ রাখবেন, জিজ্ঞেস করি? ওরা ইস্কুলে যায়, সেখানে তো বদ সঙ্গী জুটতে পারে! তা হ'লে ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে ছেলেদের সিন্দুকে তুলে রেখে দিন।

বাবা একটু হাসলেন মাত্র।

পাগলা সন্ন্যেসী আবার শুরু করলেন, আপনি তো এদের বাইরে যেতে বারণ ক'রে দিয়েই নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর, বাইরে এদের বন্ধুবান্ধব রয়েছে, খেলা রয়েছে, কত রকম উত্তেজনা রয়েছে, তার বদলে বাড়িতে কি ব্যবস্থা করেছেন শুনি? মশায়, এই দাড়ি পাকতে সত্তর

বছর লেগেছে আমার, ছেলে-বয়েস আপনারও একদিন ছিল, ছেলেদের মনটা সেই বয়েস দিয়ে একবার বুঝতে চেষ্টা করবেন।

বাবা আমাদের বললেন, যাও, তোমরা বাড়ির ভেতরে যাও।

আজ্ঞা পাওয়ামাত্র আমরা বই গুটিয়ে নিয়ে উঠে গেলুম।

তারপর পাগলা সন্ন্যেসীর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধ'রে বাবার আলাপ-আলোচনা চলল।

সেদিন খেতে ব'সে বাবা ঘোষণা করলেন, আচ্ছা, তোমরা বিকেলে ঘণ্টাখানেক ক'রে বেড়িয়ে আসবে। সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরতে হবে, বুঝলে?

গোষ্ঠদিদির সঙ্গে আমাদের বাড়ির সবারই খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ ক'রে আমার ও অস্থিরের ছিল সে প্রাণের বন্ধু। সেই মিষ্টভাষী, স্বামীপরিত্যক্তা অসহায়ার চরিত্রে এমন একটা মাধুর্য ছিল যে, দুদিনেই সে অপরিচিতকে আপনার ক'রে নিতে পারত। অথচ সবার চেয়ে আপনার করার যাকে প্রয়োজন, সেই স্বামীকে সে কোনও আকর্ষণেই বাঁধতে পারে নি।

গোষ্ঠদিদির শ্বশুর তাঁর পেন্‌শনের টাকা ও বড় ছেলে যে টাকা পাঠাত সে টাকা তার কাছেই রেখে দিতেন খরচের জন্যে। ভদ্রলোক কখনও তার কাছে কোনও হিসাব চাইতেন না। এজন্যে গোষ্ঠদিদির তহবিল সর্বদা পূর্ণ থাকত। আমরা তার জন্যে লুকিয়ে সেকরা ডেকে আনতুম, সে গয়না গড়াত। খাওয়াদাওয়া তো প্রায় নিত্যই হ'ত। শুক্লপক্ষের সময় আগে থাকতে সে পয়সা দিয়ে রাখত আর আমরা লতুদের বাড়ি থেকে ফেরবার মুখে এক চ্যাঙারি খাবার কিনে এনে তার কাছে জমা রেখে বাড়িতে আসতুম। অনেক রাত্রে আমাদের বাড়ি ও পাড়া নিঝুম হয়ে পড়লেও আমরা দু ভাই বাতি নিবিয়ে জেগে প'ড়ে থাকতুম,

তার পরে গোষ্ঠদিদির সঙ্কেতধ্বনি শোনামাত্র নিঃশব্দে তাদের ছাতে চ'লে যেতুম। গোষ্ঠদিদি আগে থাকতেই মাদুর, বালিশ, কুঁজো, গেলাস নিয়ে এসে রাখত। আমরা আগে ভরপেট খেয়ে নিয়ে তারপরে গল্প করতুম। সেই তার ছেলেবেলাকার জীবন ; অত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কদিনের জন্যে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল, কে তাকে কোন্ দিন কি মিষ্টি কথা বলেছিল, —কত লোকের কথা, তার স্বামীর কথা, তার অদ্ভুত শ্বশুরের কথা।

আমরাও বলতুম, আমাদের ইস্কুলের কথা, লতুদের কথা, দিদিদের কথা।

গোষ্ঠদিদির সঙ্গে আমাদের সব কথা হ'ত। তার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করলে বলত, ও আমার মাছ খাওয়ার টিকিট।

শ্বশুর মারা গেলে যে তার কি হবে তাই নিয়ে আমরা তিনজনে যে কত চিন্তা করেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ ক'রে ছাতে ব'সে ভেবেছি, তার ঠিকানা নেই। গোষ্ঠদিদি থেকে থেকে বলত, তোরা আমার রাম-লক্ষ্মণ ভাই রয়েছিস, আমার ভাবনা কি ?

মাঝে মাঝে সে আমাদের গল্পের বই নিয়ে আসবার জন্যে তাগাদা দিত। আমরা মধ্যে মধ্যে লতুদের বাড়ি ও দিদিদের ওখান থেকে বই এনে দিতুম। কিন্তু তার ছিল বিপুল অবসর, আর আমাদের যোগান ছিল অল্প, কাজেই তার বইয়ের পিপাসা কিছুতেই মেটাতে পারতুম না। আমাদের পাড়ায় একটা কন্‌সার্টের আখড়া ছিল, সেখানে তিন-চারটে আলমারি থাকত বইয়ে ভরা। পাড়ার ছেলেরা এটাকে লাইব্রেরি বলত। একদিন আমি সাহস ক'রে এই ক্লাবের একজনের কাছে বই চাইলুম। ক্লাব-ঘরে তখন আর কেউ ছিল না।

আমি বই চাইতেই লোকটা একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি, খোকা, এই বয়সেই নভেল পড়তে শুরু করেছ ?

খোকা যে স্রেফ দয়া ক'রে নভেল লেখা শুরু করে নি, সে কথা তো আর সে জানত না। যা হোক, সে অমর্যাদা উপেক্ষা ক'রে বললুম, আমি পড়ব না, গোষ্ঠদিদির জন্যে চাইছি।

লোকটা আমার কথাগুলো ভাল ক'রে শুনতে পায় নি। সে একেবারে খেঁকিয়ে উঠে বললে, গোষ্ঠদা! কে তোমার গোষ্ঠদা? সে কি লাইব্রেরির মেম্বার?

বললুম, গোষ্ঠদা নয়, গোষ্ঠদি।

আহা! মুহূর্তের মধ্যেই কি অপূর্ব রূপান্তর! তবু দুর্জনেরা বলে, বাঙালী নারীর সম্মান জানে না।

গোষ্ঠদিদির নাম শুনেই সে আমায় খাতির ক'রে বসিয়ে ঠারে-ঠুরে তার চেহারাটা কি রকম, তা জানবার চেষ্টা করতে লাগল।

সন্ন্যেসীর ছোট ছেলের বউ বললে না?

হ্যাঁ।

ও, ওদের বাড়ির ছাতে সন্ধ্যেবেলায় দেখেছি বটে। রঙটা খুব ফরসা, না?

হ্যাঁ, একেবারে দুধে-আলতায়।

মুখখানা তো তেমন ভাল নয়।

কেন, গোষ্ঠদির চমৎকার মুখ, যেমন চোখ তেমনই নাক, যেন তুলি দিয়ে আঁকা। আপনি তা হ'লে অন্য কারুকে দেখেছেন।

হ্যাঁ, আমি দুজনকে দেখেছি, তার মধ্যে কোন্‌টি তোমার গোষ্ঠদি তা তো জানি না।

বলা বাহুল্য, গোষ্ঠদিদিদের বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক কেউ ছিল না।

লোকটা কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে আবার বললে, তা গোষ্ঠদি বুঝি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে?

হাঁ।

তা দেখ, বিকেলবেলা এসো। এখন চাবি নেই, তখন বই বের ক'রে দোব, খুব ভাল বই দোব।

বিকেলে লোকটার কাছে যেতেই সে একখানা চটি বই দিয়ে বললে, এর পরে মোটা বই দোব।

তখন লতুদের বাড়ি যেতে হবে, তাড়াতাড়ি বইখানা গোষ্ঠদিদিকে দিয়েই মারলুম দৌড়, তবু বইখানার নাম মনে আছে—'গয়ার ভূত', প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

পরের দিন গোষ্ঠদিদির সঙ্গে দেখা হতেই সে বললে, হ্যাঁ রে, কার কাছ থেকে বই এনেছিলি ?

কেন ?

কেন কি রে! তার মধ্যে চিঠি দিয়েছে।

সত্যি! দেখি।

প'ড়ে দেখি, লোকটা গোষ্ঠদিদিকে একখানা দু-পৃষ্ঠাব্যাপী প্রেমপত্র ছেড়েছে। কোন একখানা বটতলার নভেলের সর্বনাশ ক'রে চোখা চোখা প্রেমবাণ ছেড়েছে গোষ্ঠদিদির উদ্দেশ্যে।

গোষ্ঠদিদি বললে, বইখানা ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

আমরা বললুম, তুমি বেশ ক'রে গালাগালি দিয়ে একখানা চিঠি লেখ।

আমি গালাগালি জানি না।

তাতে কি হয়েছে, আমরা শিখিয়ে দিচ্ছি।

না না, কি হতে কি হবে, বইটা ফেরত দিগে যা।

বইখানা নিয়ে বাড়িতে রেখে দেওয়া গেল। রাত্রে পড়াশুনো সেরে নিজেদের ঘরে এসে দুই ভাইয়ে মিলে লোকটাকে গালাগালি দিয়ে

একখানি চিঠির খসড়া করা গেল। খিস্তিবিদ্যার আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা তখন আমরা পার হয়েছি, কাজেই ভাষার অভাব হ'ল না। গোষ্ঠদিদিই যেন লিখছেন, এই ভাবে শুরু করা গেল। তাতে লোকটার পিতৃ ও মাতৃ-পুরুষের সমস্ত গুরুস্থানীয়ার সঙ্গে তার অসম্ভব, অসঙ্গত ও অনৈসর্গিক সম্বন্ধ আরোপ ক'রে শেষে লেখা হ'ল—এমন চিঠি আর যদি আসে, তবে তার মুণ্ডপাত অনিবার্য।

পরের দিন 'গয়ার ভূতে'র মধ্যে চিঠি ভ'রে লোকটাকে ফিরিয়ে দিয়ে এলুম। তারপরে অনেকদিন পর্যন্ত লোকটা আমাদের দেখলেই মুখ তুলে চেয়ে থাকত। তার মুখ দেখে মনে হ'ত, যেন সে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়; কিন্তু কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।

গোষ্ঠদিদি সব সময়েই বেশ হাসিখুশিই থাকত, কিন্তু মাঝে মাঝে তার কি হ'ত জানি না, সে দিনের পর দিন বিষণ্ণ হয়ে থাকত।

একদিন মনে পড়ে, অনেক রাতে ছাতের ওপরে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই উঠে বসলুম। দেখি, এক পাশে অস্থির প'ড়ে ঘুম লাগাচ্ছে, আর এক দিকে গোষ্ঠদিদি দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে ব'সে আছে। কৃষ্ণপক্ষের রহস্যময় জ্যোৎস্নার সঙ্গে শরৎ-শেষের হিমানীর জাল বোনা চলেছে—ঘুমন্ত নগরীর ওপরে কে যেন আবছায়ার মশারি ঢেকে দিয়েছে। দূর ও কাছের বাড়িগুলো যেন একটা অদ্ভুত আকারের জীব, গাছের মতন তাদেরও প্রাণ আছে, কিন্তু চলবার শক্তি নেই। চারিদিকে দেখতে দেখতে আমার মনটা কেমন ঔদাস্যে ভ'রে উঠতে লাগল। পাশে অস্থির ঘুমিয়ে আছে; গোষ্ঠদিদি তখনও সেই ভাবে দূরে চেয়ে। আমার মনে হতে লাগল, আমরা তিনজন যেন কোন দূর নক্ষত্রের দেশ থেকে এইমাত্র এখানে এসে পড়েছি। আমরা এখানকার কারুর নয়, এখানে আমাদেরও কেউ নেই। এ জগতে

এইমাত্র যেন আমার চেতনা আরম্ভ হ'ল। তিনজনে কতদিন একসঙ্গে চলব? সেই মুহূর্তেই মনের মধ্যে কে যেন বললে, তুমি একা। কেন জানি না, আমার মনে হতে লাগল, এদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে, দীর্ঘ জীবনপথ এদের ছাড়াই চলতে হবে। তারপরে কোনদিন কোন লোকে দেখা হতেও পারে, নাও হতে পারে। বুকের মধ্যে সহস্র নিষেধ হাহাকার ক'রে উঠল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ডেকে উঠলুম, গোষ্ঠদি!

কি ভাই?

তুমি কদিন থেকে অমন মনমরা হয়ে রয়েছ কেন? তোমার কি দুঃখ আমাকে বলবে না ভাই?

গোষ্ঠদি ঘুরে দু-হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে আমার গালে মুখ রেখে কাঁদতে লাগল। ক ।ক মিনিট সেই ভাবে থেকে মুখ তুলে বলতে লাগল, আমার দুঃখ তো তোরা জানিস। মনে কর্, ছেলেবেলায় কবে বাপ-মা হারিয়েছি মনে নেই। মামার ছেলেমেয়ের সঙ্গে মানুষ হচ্ছিলুম, তারা যাকে মা বলে, আমিও তাকে মা ব'লে জানি; হঠাৎ একদিন জানতে পারলুম, আমার মা নেই। সেদিনকার সে দুঃখ তোরা কল্পনা করতে পারবি না। পুজোর সময় একখানা নতুন কাপড় কখনও পাই নি। তারপরে অন্নকষ্ট। ভগবান শত্রুকেও যেন তা না দেন।

তা বিয়ে হওয়ার পর তোমার সে কষ্ট তো আর নেই।

না, তা নেই বটে, কিন্তু অন্নকষ্ট মিটলেই কি সব কষ্ট মিটে যায়?

ছেলেবেলা থেকে পথে-ঘাটে ভিখিরীর আকুতি শুনে, চাকরবাকরদের দারিদ্র্য ও অতি সামান্য আহার্য দেখে, কি জানি, মনের মধ্যে ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, অন্নকষ্টই মানুষের জীবনের একমাত্র কষ্ট। এটি কোন রকমে এড়াতে পারলে জীবন সুখময় হয়। অন্নকষ্ট পরমসুখে নিবৃত্তি

হওয়ার অনিবার্য পরিণামস্বরূপে যে আরও নানা রকম কষ্ট আসতে আরম্ভ করে, তার স্পষ্ট ধারণা তখনও হয় নি।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে গোষ্ঠদিদি আবার বলতে আরম্ভ করলে, এই নির্জন প্রেতপুরীব মধ্যে একলা জীবন কাটে, একটা লোক নেই যে, মনের কথা দুটো বলি। স্বামী থেকেও নেই, এ কি কম দুঃখ রাম-ভাই!

গোষ্ঠদিদিকে বললুম, তোমার স্বামী যখন তোমাকে ভালবাসে না, তখন তুমিও অন্য কারুকে ভালবাসতে আরম্ভ কর না কেন?

তাতে লাভ কি?

তার সঙ্গে চ'লে যাবে, সে তোমায় যেখানে নিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে তাই ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাবা রে!

কেন?

যার সঙ্গে যাব, সে যদি কোনদিন ফেলে পালায়! সারাজীবন ভাত-কাপড়ের কষ্ট পেয়েছি, আবার যদি সেই কষ্ট পাই, এখানে দুটি খেতে পাচ্ছি তো।

ভাত-কাপড়েব পাছে অভাব হয়, সেই ভয়ে গোষ্ঠদিদি পালায় নি; কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক মেয়ের মুখে শুনেছি ও নিজেও দেখেছি, যারা ভাত-কাপড়ের অভাব ঘোচাবার জন্যেই বাড়ির বাইরে পা বাড়িয়েছে।

শচীনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমাদের সন্ন্যাসব্রত তখনকার মত ভেঙে গিয়েছিল বটে, কিন্তু বছর খানেক যেতে না যেতে আবার আমাদের যুক্তি শুরু হয়ে গেল। প্রমথ গোড়াতেই সাবধান ক'রে দিলে, এবার আর শচেটাকে ভিড়তে দেওয়া নয়।

খুব গোপনে ও সাবধানেই আয়োজন ও পরামর্শ চলছিল, কিন্তু তবুও শচীন একদিন টের পেয়ে গেল। সে অনুতপ্ত হয়ে বললে যে, তখন সে সংসারকে ভাল ক'রে চিনতে পারে নি, এখন সংসারের প্রতি সত্যিই তার আর কোন মায়া নেই, জগৎকে ভাল ক'রেই সে চিনে নিয়েছে।

তিনজনে মিলে আবার পরামর্শ শুরু হ'ল। সেদিন থেকে এ দিনের এক বছরের তফাত। বয়স মাত্র এক বছর বাড়লেও এরই মধ্যে দশ বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। গাধার পিঠে মাল চাপিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লেই যে শান্তি ও তপস্যামার্গে বিচরণ করতে পারা যায় না, সে বুদ্ধি টনটনে হয়েছে। তাই প্রথমেই আমরা হিংস্র জানোয়ারদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র সংগ্রহ করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

অস্ত্র-আইন থাকলেও তখন বাজারে ভাল ভাল দিশী ও বিলিতী ছোরা কিনতে পাওয়া যেত। আমরা পয়সা জমিয়ে প্রথমেই তিনটি ভাল ছোরা কিনে ফেললুম। তারপরে তিনটি পাকা বাঁশের লাঠি। কামারের দোকানে ইস্পাত দিয়ে তিনটে চমৎকার ধারালো বর্শাফলক বানানো হ'ল। এ ছাড়া প্রমথর গুরুদত্ত সেই মারাত্মক বাণগুলো তো আছেই।

অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া ধান, কাঁচামুগ ইত্যাদি কেনা হ'ল চাষ করবার জন্যে। দেশলাই নেওয়া হ'ল বারো ডজনের একটি বড় বাণ্ডিল। দেশলাই ফুরিয়ে গেল শুকনো পাতা সংগ্রহ ক'রে তাতে আগুন ধরাবার জন্যে একটি বড় আতশ-কাচ ইত্যাদি সব প্রমথদের বাড়ির একটা অন্ধকার

ঘরে জমা হতে লাগল। এসব ছাড়া ইস্ক্রুপ, পেরেক ও ছুতোরমিস্ত্রির যন্ত্রপাতিও যোগাড় হ'ল,—জঙ্গলে থাকবার মতন অন্তত একখানা ঘরও তৈরি করতে হবে তো!

আবার এক শনিবারে ইস্কুলের ছুটির পর সেই বিরাট বোঝা তিন ভাগে ভাগ ক'রে নিয়ে একটা খাবারের দোকানে ব'সে ভরপেট খেয়ে আমরা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অভিমুখে যাত্রা করলুম। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড আমার চেনা ছিল, অনেক দিন আগে দাদার সঙ্গে এসে দেখে গিয়েছিলুম।

হাওড়ার পোল পেরিয়ে, মাঠের ধার দিয়ে গিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের কাছে এসে কি রকম সন্দেহ হ'ল, এই রাস্তাটা সেই রাস্তা কি না! বোঝার ভারে তখন আমাদের তিনজনেরই অবস্থা কাহিল। পথের ধারে বোঝা নামিয়ে পরামর্শ করতে লাগলুম, অতঃপর কি করা যায়?

কিছুক্ষণ বাদে স্থির হ'ল, আগে কোন লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে নেওয়া যাক, এইটা আসলে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কি না! তখন বেলা প্রায় পাঁচটা হবে, হাওড়ার মাঠে বোধ হয় কোন খেলা-টেলা ছিল, দলে দলে লোক মাঠের দিকে যাচ্ছিল। দুটি নিরীহ-গোছের ভদ্রলোক সেই দিকেই যাচ্ছিল, আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ মশায়, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটা কোন্ দিকে?

তাদের মধ্যে একজন মিনিট-খানেক আমার মুখের দিকে কটমট ক'রে চেয়ে থেকে আমাকে বললে, কোথায় যাবে? গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড?

হ্যাঁ।

তোমার বাড়ি কোথায়?

আমার বাড়ি ওতোরপাড়া, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারেই।

লোকটা এবার টপ ক'রে আমার একখানা হাত ধ'রে তার সঙ্গীকে বললে, দেখ, আমার মনে হচ্ছে, এ ছোকরা বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

আমি কাঁধ থেকে পুঁটলিটা নামিয়ে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলুম। ততক্ষণে প্রমথ ও শচীন কাছে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে মশায়, ওকে ধ'রে টানাটানি করছেন কেন?

তোমরা কে?

শচীন বললে, আমরা এর বন্ধু।

তোমাদের বাড়ি কোথায়?

শচীন বললে, অত হাঁড়ির খবরে তোমাদের দরকার কি হে? যাও না, যেখানে যাচ্ছ, সেদিকে এগিয়ে পড়।

ব্যাপারটা হয়তো সহজেই মিটে যেত, কিন্তু আমাদের মুখে ওই রকম চোটপাট জবাব তারা বরদাস্ত করতে পারলে না, তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। একজন বললে, ধর এদের। ছোঁড়াগুলো নিশ্চয় বাড়ি থেকে ভেগেছে।

একজন প্রমথর হাত চেপে ধ'রে বললে, চল, তোমাকে থানায় যেতে হবে।

প্রমথ ছিল রোগা, তার গায়েও মোটে জোর ছিল না। সে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু পারলে না। আমি গিয়ে লোকটার হাত ছাড়িয়ে দিলুম। ইতিমধ্যে তাদেরই আরও দু-তিনজন বন্ধু মাঠের দিকে যাচ্ছিল, তারা ওই রকম হুটোপাটি দেখে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে হে?

একজন বললে, এই ছোঁড়াগুলো বাড়ি থেকে পালাচ্ছে, চল, এদের ধ'রে থানায় নিয়ে যাওয়া যাক।

তারাও আগের লোক দুটোর সঙ্গে জুটে গিয়ে আমাদের টানাটানি আরম্ভ ক'রে দিলে। আমরা ছেলেমানুষ হ'লেও নেহাত দুর্বল ছিলুম না, ব্যায়াম করে না এমন দু-তিনজন যুবকে মিলেও চট ক'রে

আমাদের কাবু করতে তো পারতই না, বরং বিপদে পড়ত। তার ওপরে মারামারির প্রতি আমার ও শচীনের একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল যে, যেখানে সামান্ত দু-চারটে কথা-কাটাকাটি হয়ে মিটে যেতে পারে, সেখানে হাঙ্গামা না বাধিয়ে আমরা পারতুম না। এই যে চার-পাঁচজন লোক, তাদের প্রত্যেকেরই বয়স বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশের কম হবে না, তবুও মারামারির গন্ধ পেয়ে আমি আর শচীন একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলুম ; শুধু ভয় হচ্ছিল, কখন তারা পোঁটলা খুলে দেখে ফেলে।

মিনিট দু-তিনের মধ্যে হৈ-হৈ ব্যাপার লেগে গেল। একজন আমাকে কোল-পাঁজা ক'রে তুলে ধরামাত্র তার থুতনিতে জুতো সমেত এমন একটি লাথি লাগালুম যে, তার দাড়ি কেটে দরদর ক'রে রক্ত ঝরতে লাগল। আমাদের জামা-কাপড ছিঁড়ে গেল, সর্বাঙ্গ কেটে রক্ত পডতে লাগল।

আমরা এদিকে যখন আক্রমণে ও আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, সেই অবকাশে একটা লোক প্রমথ বেচারীকে ধ'রে খুব ঠেঙাতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মারের চোটে প্রমথ ক্ষিপ্ত হয়ে শেষকালে পুঁটলি থেকে বর্শা বের ক'রে নিয়ে আততায়ীর উরুতে ঘ্যাঁচ ক'রে বসিয়ে দিলে।

ব্যাপারটি যে এতদূর গড়াবে, ওরা তা কল্পনাও করতে পারে নি। বর্শার আঘাত পেয়েই সে লোকটা—ওরে বাবা, ছুরি মেরেছে রে, ব'লেই রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। প্রমথ তার পোঁটলা তুলে নিয়ে মারলে দৌড়।

লোকটা শুয়ে পড়তেই আমাদের আততায়ীরা ও যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ মজা দেখছিল, তারা আমাদের ছেড়ে সেদিকে ছুটল। সে সময় রাস্তার ওপর দিয়েই মার্টিন কোম্পানির ছোট রেল চলত, ভাগ্যক্রমে একটা ট্রেন এসে পড়ায় যে যার চারিদিকে ছিটকে পড়ামাত্র আমি আর শচীন পোঁটলা তুলে নিয়ে মারলুম দৌড়। দুর

থেকে এক-আধটা চীৎকার—পাকড়ো, পাকড়ো, পুলিস ইত্যাদি শোনা যেতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে হাওড়া টাউন-হলের কাছে এসে দেখি, প্রমথ সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। আমরা আর বাক্যবিনিময় না ক'রে দৌড়ে হাওড়া স্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। আধ ঘণ্টাটাক স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বুক-ধড়ফড়ানি ক'মে গেলে পোল পেরিয়ে বড়বাজারে এসে পড়লুম। সেখানে একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান কেনা হ'ল। দোকানে একটা বড় আয়না ছিল, তাতে আমাদের চেহারা দেখে একেবারে আঁতকে উঠলুম। মুখময় কালশিরে, জামা ছিঁড়ে কুটিকুটি, চুল উস্কখুস্ক, শচীনের মাথার খানিকটা চুলই নেই, প্রমথর বাঁ কানটা ছিঁড়ে গেছে, রক্ত গড়িয়ে গলা অবধি নেমেছে—সে এক বীভৎস দৃশ্য!

পরামর্শ ক'রে বাড়ি ফেরাই সাব্যস্ত হ'ল. এত বড় বাধা যে ওপরওয়ালারই ইঙ্গিত, তা মেনে নিয়ে আমরা ক্ষুণ্ণমনেই বাড়িমুখো হলুম। প্রমথকে পৌঁছে দিয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সেই অল্প-আলো অল্প-অন্ধকারে কাঁধের বোঝা এক জায়গায় লুকিয়ে চুপিচুপি নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, এমন সময়—যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়—

ইস্কুল থেকে আমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে মা ছটফট করছিলেন। তিনি বোধ হয় কিছু সন্দেহ ক'রে আমাদের ঘরে এসে জিনিসপত্র ওটকাচ্ছিলেন। এমন সময় আমার সেই মূর্তি দেখে একেবারে শিউরে উঠলেন।

বললুম, টেরিটিবাজারে গিয়েছিলুম এক বন্ধুর জন্যে খরগোশ কিনতে। পথে তিন-চারটে ফিরিঙ্গী ছেলে খরগোশ কেড়ে নেবার চেষ্টা করায় ভয়ানক মারপিট হয়ে গিয়েছে।

মা আর দ্বিরুক্তি না ক'রে আমার পিঠে গদাগম পাঁচ-সাতটি কিল চাপিয়ে বললেন, পোড়ারমুখো ছেলে, ডনকুস্তি ক'রে আর বাদাম-বাটা খেয়ে গুণ্ডা হয়েছ, না! সন্ধ্যেবেলা গুণ্ডামি ক'রে বাড়ি ফেরা হ'ল!

তারপরে টানতে টানতে কলতলায় নিয়ে গিয়ে গা থেকে কাদা তুলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। শরীরের কত জায়গায় যে কেটে ছিঁড়ে গিয়েছিল তার আর ঠিকানা নেই, যেখানেই জল লাগে, সেখানটাই জ্বালা করতে থাকে।

স্নান ক'রে উঠে সর্বাঙ্গে তাপ্পি মেরে পাগলা সন্ন্যেসীর কাছে যাওয়া গেল। তিনি বাড়িতে বউমা ও ঝি-চাকরদের ওপরে হোমিওপ্যাথির হাত পাকাতেন। সেখানে গিয়ে এক ফোঁটা ওষুধ খেয়ে টেরিটিবাজারে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মারপিটের এক লোমহর্ষণ বর্ণনা করা গেল তাঁর কাছে। আর এক প্রস্থ বর্ণনা গোষ্ঠদিদির কাছেও করতে হ'ল। সেখান থেকে ফিরে বাবার কাছে আরও বাড়িয়ে বলা গেল। বাবা সব শুনে বললেন, বাড়িতে কিছু না জানিয়ে টেরিটিবাজারে যাওয়াটা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছিল; কিন্তু তোমরা যে মার খেয়ে পালিয়ে আস নি, তাদেরও মেরেছ, এতে আমি খুবই খুশি হয়েছি।

সত্যি কথা বলতে কি, বার কয়েক সেই কাল্পনিক ফিরিঙ্গী-নন্দনদের সঙ্গে মারামারির বর্ণনা ক'রে হাওড়ার মাঠের ধারের ব্যাপারটা মন থেকে এক রকম মুছে যেতে লাগল, আর সেই জায়গায় টেরিটিবাজারের মারামারির একটা ছবি সমুজ্জ্বল হতে আরম্ভ হ'ল।

সন্ধ্যেবেলা লতুদের ওখান থেকে অস্থির ফিরে এসে আমার সর্বাঙ্গে ওই রকম তাপ্পি আর পটি মারা দেখে অবাক হয়ে গেল। আমাদের পলায়নের সমস্ত খুঁটিনাটিই অস্থির জানত। এও ঠিক ছিল যে, সন্ন্যেসী-লাইনে কিছু উন্নতি করতে পারলেই তাকে খবর দোব, আর সেও এসে

আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু সে লাইনে পা দিতে না দিতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার চেহারার ওই বিষম পরিবর্তন দেখে সে বেচারী শঙ্কিত হয়ে পড়ল।

রাত্রে শোবার সময় আসল ঘটনাটি অস্থিরকে খুলে বলা গেল। তারপরে গুপ্তস্থান থেকে পোঁটলাটি বের ক'রে বর্শা ছোরা করাত র‍্যাঁদা প্রভৃতি যন্ত্রগুলিকে লুকিয়ে ফেলা হ'ল।

পরের দিন বিকেল হতে না হতে লতুদের ওখানে যাত্রা করা গেল। টেরিটিবাজারে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মারামারির কাহিনীটি সেখানে বেশ সমারোহ ক'রে ব'লে বাহাদুরি নেবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে চাকরের কাছে শুনলুম বাবা, মা, ললিত ও তার ছোট বোন কোথায় গিয়েছে, শুধু বড় দিদিমণি অর্থাৎ লতু বাড়িতে আছে।

খবরটা শুনে নিরুৎসাহ হয়ে পড়া গেল। তবুও লতুকে গল্পটা শোনানো যাবে স্থির ক'রে তিন লাফে ওপরে উঠে গিয়ে এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে দেখলুম, লতু নেই। শেষকালে ছাতের ঘরে তাকে আবিষ্কার করা গেল, সে জানালার ধারে বাইরের দিকে চেয়ে ব'সে আছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই লতু আমার দিকে ফিরে এক অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চাইল। আমার ওপরে অভিমান হ'লে সে ওই রকম করত। আমি তার পাশে ব'সে জিজ্ঞাসা করলুম, অসুখ করেছে লতু?

লতু আমার দিকে ফিরে চাইলে, চোখে তার অশ্রু। লতু বললে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্যি বলবি?

লতুকে এতখানি গম্ভীর হতে কখনও দেখি নি। বললুম, বলব।

তুই নাকি কাল বাড়ি থেকে চ'লে গিয়েছিলি সন্ন্যাসী হবার জন্যে?

আমি একেবারে স্তম্ভিত, বাক্যহীন।

বল্।

কে বললে?

অস্থির।

চুপ ক'রে ব'সে অস্থিরের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভাবছি, লতু আমায় ঠেলা দিয়ে বললে, কেন গিয়েছিলি, বল্—কোন্ দুঃখে?

লতুর কথার মধ্যে কি শক্তি ছিল বলতে পারি না, আমার মনে হতে লাগল, যেন ঘোরতর দুঃখ আমাকে ঘিরে ফেলেছে। নইলে আমার বয়সী ছেলে কোথায় হেসে খেলে দিন কাটাবে, তা না ক'রে সে বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চ'লে যেতে যাবে কেন? তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এসে গেল। ধরা গলায় বললুম, তুমি জান না লতু। আমার যা দুঃখ তা কেউ বুঝতে পারবে না। আমাকে কেউ ভালবাসে না, কার জন্যে থাকব?

লতুর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গালের ওপরে গড়িয়ে পড়ল। সে আবার বললে, একটা কথা সত্যি বলবি?

বলব।

তুই কারুকে ভালবাসিস?

ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ।

কাকে ভালবাসিস, বলতে হবে।

সে তুই জেনে কি করবি? কোনও লাভ নেই তোর।

হ্যাঁ, আমার লাভ আছে, বলতেই হবে।

লতুর মুখের দিকে চাইলুম। তার চোখে অপূর্ব আলো, অশ্রুতে তা আরও উজ্জ্বল্ হয়ে উঠেছে, ঠোঁট দুটো থরথর ক'রে কাঁপছে। আমার বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা কষ্টদায়ক অনুভূতি হতে লাগল।

বুক ঠুকে ব'লে ফেললুম, আমি তোকে ভালবাসি।

বলামাত্র লতু ঝাঁপিয়ে আমার বুকের ওপরে পড়ল। তারপরে চুম্বনে অশ্রুতে কোলাকুলি।

* * *

স্তব্ধ বনস্থলীতে হঠাৎ ঝড় উঠলে প্রথমে যেমন দূর—বহুদূরাগত জয়ধ্বনির মত শব্দ হতে থাকে, তারপরে সেই অখণ্ড আওয়াজ বাড়তে বাড়তে সমস্ত অরণ্যব্যাপী উল্লাস জাগে—এসেছে, এসেছে, ওরে এসেছে রে! বিশাল বনস্পতি থেকে আরম্ভ ক'রে শিশু বৃক্ষলতা পর্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, যে জননী-ধরণী নিয়ত স্তন্যদানে তাদের পোষণ করেছে, তার বুক ছিঁড়ে এই নবচেতনার উন্মাদনায় ভেসে যেতে চায়, কামদেবের ফুলধনুর স্পর্শমাত্র সেই কৈশোরেই আমার মনের অবস্থা সেই রকম হয়ে পড়ল। মনের সমস্ত বৃত্তি, জীবনের সমস্ত কামনা লতুকে ঘিরে—সে যেন আমার চোখের সেই অঞ্জন, যা লাগলে পৃথিবীর সব-কিছুই সুন্দর ঠেকে। ধরণী আমার কাছে সুন্দরতর হয়ে উঠল।

একদিন পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, স্থবিরবাবু, তোমাকে ব্রাদার কিছুদিন থেকে যেন কেমন-কেমন দেখছি! লভ-টভে পড়েছ নাকি?

গোষ্ঠদিদিকে আগেই লতুর সব কথা বলেছিলুম, সেদিন তাঁকেও বললুম।

আমার কথা শুনে পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, সাবাস ব্রাদার! কাল থেকে বায়রন পড়া যাবে, কি বল?

জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা পাগলা সন্ন্যেসী, আপনি কখনও প্রেমে পড়েছিলেন?

তিনি হেসে উঠলেন, কিন্তু সে কাষ্ঠহাসি তখুনি থেমে গেল। অশ্রু-রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, সে কথা কি আর মনে আছে! আমাদের জীবন বৃথাই কেটেছে ব্রাদার, বৃথাই কেটেছে—

Like the ghost of a dear friend dead
Is Time long past
A tone which is now forever fled,
A hope which is now forever past
A love so sweet it could not last
Was time long past.

আমার জীবনে লক্ষ্য করেছি, একটা সুখের কারণ ঘটলেই ঠিক সেই ওজনের একটা দুঃখও এসে জোটে। সুখ-দুঃখের নাগরদোলায় এই ওঠানামার ওপর এমন একটা মানসিক মৌতাত জন্মেছে যে, সরল একটানা জীবনযাত্রায় আমি হাঁপিয়ে উঠি, লৌকিক ও সাংসারিক বিধিমতে সে জীবন সুখের হ'লেও। লতুর সঙ্গে আমার এই যে নতুন পরিচয় ঘটল, তারই আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমি দিন কাটাতে লাগলুম। লতু একদিন বললে, ভাল ক'রে পড়াশোনা কর্।

সেদিন থেকে পড়ায় এমন মন লাগালুম যে, বাবা পর্যন্ত খুশি হয়ে উঠলেন। মনে পড়ে, এই সময় আমাদের ইস্কুলে একজন নতুন শিক্ষক এলেন। ক্লাসের মধ্যে আমি, শচীন ও প্রমথ একেবারে দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিলুম। তর্ক, মারামারি ও নানা রকম উৎপাতের জন্য শিক্ষক-সম্প্রদায় সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকতেন। ক্লাসের মধ্যে আমরা তিনজন সবার চাইতে বেশি মার খেলেও অধিকাংশ শিক্ষকই আমাদের পছন্দ করতেন বেশি। তাঁদের আশা ছিল, একদিন, যেদিন আমাদের সদ্‌বুদ্ধি হবে, সেদিন আমরা সব বিষয়েই সব ছেলের চাইতে ভাল হয়ে যাব।

আমাদের এই নতুন শিক্ষকটি আসামাত্র তাঁর সঙ্গে কি জ্যাঠামো করায় তিনি আমার ও শচীনের বেশ ক'রে কান রগ্‌ড়ে দিলেন। নতুন মাস্টারের হাতে কানৌটি খেয়ে আমাদের মাথায় দুষ্ট-সরস্বতী চেপে বসল। আমরা রকম-রকমের বুলিচালি কাটতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। শেষকালে তিনি রেগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক সেই সময় শচীনের বাবা অর্থাৎ আমাদের ইস্কুলের যিনি কর্তা, তিনি কি একটা কাজে এসেছিলেন। নতুন মাস্টারটি একেবারে তাঁর

কাছে গিয়ে উৎপাতের কথা বলতেই আমাদের ডাক পড়ল। আমরা লাইব্রেরি-ঘরে যেতেই আমাদের ওপর বেত্রাঘাতের হুকুম দিয়ে তিনি চ'লে গেলেন। ঠিক হ'ল, ইস্কুলের ছুটির পর সব ছেলের সামনে আমাদের বেত মারা হবে। নতুন মাস্টার অর্থাৎ যাঁর ক্লাসে আমরা হাঙ্গামা করেছিলুম, তিনি বেত্রাঘাত করবেন—তাঁর যত ঘা খুশি।

ইস্কুলের ছুটি হতে সব ছেলেরা ও মাস্টারেরা উঠনে ভিড় ক'রে দাঁড়াল। উঠনের মাঝখানে একটা বেঞ্চি পেতে তার ওপরে আমাকে চড়ানো হ'ল। মাস্টার মশায় একখানা হাত-তিনেক লম্বা বেত নিয়ে এলেন। রাগে তখনও তিনি কাঁপছিলেন। প্রথমেই তিনি আমার পায়ে ঘা পাঁচ-সাত গায়ের জোরে মারতেই আমি একেবারে ব'সে পড়লুম। পায়ের যন্ত্রণায় মাথা পর্যন্ত ঝনঝন করছিল, তবুও রসিকতা করবার প্রলোভন সামলাতে পারলুম না। বললুম, পায়ে মারবেন না স্যার্। পা ভেঙে গেলে আর ইস্কুলেও আসতে পারব না, আপনার হাতে মার খাবার সৌভাগ্যও আর হবে না।

আমরা তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তুম। ওপরের ও নীচের সব ক্লাসের ছেলেরাই আমাদের পছন্দ করত। আমাদের ওপরে এই সাজার ব্যবস্থাটা তাদের মনঃপূত হয় নি। আমার ওই কথা শুনে তারা একেবারে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

অন্য মাস্টারেরা ছেলেদের এই ধৃষ্টতা দেখে চীৎকার ক'রে উঠলেন, এই, চুপ চুপ, হাসতে লজ্জা করে না তোমাদের! ইত্যাদি বলায় তারা চুপ করলে।

তারপরে মাস্টার মশায় এলোধাপাড়ি প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে আমাকে প্রহার দিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, কোথায় শচীন্দ্রনাথ?

শচীন্দ্রনাথ সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমি নেমে যেতেই সে টপ্‌

ক'রে বেঞ্চির ওপরে উঠে দাঁড়াল। মাস্টার মশায় বেত আপ্‌সাতে আপ্‌সাতে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোথায় মারব ?

শচীন ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলে, তারই ওপরে সাঁই সাঁই বেত পড়তে লাগল। পনেরো-বিশ ঘা বেত মারার পর তিনি বললেন, ও-হাত পাত।

এই হাতেই মারুন না স্যার্, আবার ও-হাত কেন ?

ও, তা হ'লে তোমার এখনও কিছু হয় নি !

হবে আবার কি স্যার্ ! আপনার বগলে বীচি আউরে যাবে, তবু আমার কিছু হবে না।

শচীনের এই কথা শুনে ছেলের দল হো-হো ক'রে হেসে উঠল। মাস্টারেরা কিছুতেই সে গোলমাল থামাতে পারেন না, শেষকালে প্রথম শ্রেণীর একজন মুরুব্বি-গোছের ছাত্র মাস্টারদের বললে, স্যার্, ওদের সঙ্গে আমাদেরও কেন সাজা দিচ্ছেন, ক্ষিধে পেয়েছে, এবার বাড়ি যাই।

প্রথম শ্রেণীর ছেলেরা বেরিয়ে যেতেই তাদের সঙ্গে আরও অনেক ছেলে বেরিয়ে গেল। দর্শকের সংখ্যা ক'মে যাওয়ায় মাস্টার মশায়ের উৎসাহও ক'মে গেল। তিনি শচীনকে নামতে ব'লে বেত রাখতে গেলেন। আমরা দুজনে অন্য ছেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় মাস্টার মশায় আমাদের ডেকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, এই শাস্তিই তোমাদের শেষ মনে ক'রো না। আমি তোমাদের ইতিহাস পড়াব, এই আরম্ভ—জেনে রেখো।

রাস্তায় চলতে চলতে শচীন বললে, এবার থেকে তো Salium (শালা শব্দের Latin, অবশ্য আমাদের তৈরি শব্দশাস্ত্র অনুসারে) হরদম পিটবে রে।

তাই তো, কি করা যায় বল্ তো ? দোব নাকি Saliumকে কম্বল চাপা দিয়ে—বেশ ক'রে ?

পরামর্শ ঠিক ক'রে বাড়ি যাওয়া হ'ল।

আমাদের দুখানা ইতিহাস পড়া হ'ত। একখানা অধর মুখোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস আর একখানা Townsend Warner-এর ইংলণ্ডের ইতিহাস। দুখানা মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠা হবে। ঠিক হ'ল, বই দুখানা ঝাড়া মুখস্থ ক'রে ফেলা যাবে। তা সত্ত্বেও যদি মারধোর করে তো বাধ্য হয়ে একদিন কম্বল চাপা দিতে হবে।

দিন তিন-চার অসুখের অছিলায় ইস্কুলে গেলুম না। সারা দিন-রাত্রি ধ'রে দুখানি বই গড়গড়ে মুখস্থ ক'রে ফেলা গেল। কামাইয়ের পর যে দিন দুই বন্ধুতে ইস্কুলে গেলুম, সেই দিনই নতুন মাস্টারের ক্লাস ছিল।

সেদিন ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়া ছিল। মাস্টার মশায় ক্লাসে বেত নিয়ে ঢুকলেন। এ দৃশ্য এই ইস্কুলে নতুন দেখলুম।

জিজ্ঞাসা করলেন, কতদূর পড়া হয়েছে ?

ইতিহাসখানা সম্পূর্ণ পড়া হয়ে গিয়েছিল, তখন গোড়া থেকে দ্বিতীয় বার পড়া হচ্ছিল। মাস্টার মশায় শুনে বললেন, আচ্ছা, কার কত দূর তৈরি হয়েছে, আমি একবার ক্লাস-সুদ্ধ ছেলেকে পরীক্ষা করতে চাই। স্থবির শর্মা, উঠে এস।

উঠে মাস্টার মশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তিনি একটা প্রশ্ন করলেন, আমি টপ ক'রে তার সঠিক উত্তর দিয়ে দিলুম। একটা প্রশ্নে রেহাই হ'ল না। বোধ হয় তিনি প্রহার দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েই এসেছিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতে লাগল। আর আমিও

টপটপ তার জবাব দিতে লাগলুম। মাস্টার মশায় অবাক, ক্লাসের ছেলেরা একেবারে থ। শেষকালে তিনি বললেন, আচ্ছা, তুমি এখানেই দাঁড়াও। শচীন্দ্রনাথ, এ ধারে এস।

শচীন উঠে গটগট ক'রে এগিয়ে এল। একটা প্রশ্ন করা মাত্র সে উত্তর দিয়ে দিলে। মাস্টার মশায় আর একটা প্রশ্ন করার জন্যে বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছেন, এমন সময় শচীন বললে, স্যার্, অভয় দেন তো একটা কথা নিবেদন করি !

বল।

প্রশ্ন খোঁজবার জন্যে অত পাতা উল্টোবার দরকার কি ? এক কাজ করুন, বইয়ের গোড়া থেকে শেষ অবধি আমি ব'লে যাচ্ছি, তার মধ্যে আপনি সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন। আর মারবারই যদি ইচ্ছে থাকে তো ঘা কয়েক দিয়ে ছেড়ে দিন, গিয়ে ব'সে পড়ি।

শচীনের কথা শুনে রাগে মাস্টার মশায়ের মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, কি ! গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বলবে ?

হ্যাঁ স্যার্, ও তো সামান্য। এটা কি আর ইতিহাস ! ওর চেয়ে বড় বড় ইতিহাস আমার মুখস্থ আছে, সে সব বইয়ের নাম পর্যন্ত ইস্কুলের কেউ জানে না।

মাস্টার মশায় বললেন, আচ্ছা, বল।

শচীন বইয়ের গোড়া থেকে গড়গড় ক'রে মুখস্থ ব'লে যেতে লাগল, মাস্টার মশায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল। মাস্টার মশায় আমাকে আর শচীনকে ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে লাইব্রেরি-ঘরে চললেন। সেখানে মাস্টারদের ভিড় ক'মে যাওয়ার পর বললেন, দেখ হে বাপু স্থবির শর্মা এবং শচীন্দ্রনাথ ! তোমাদের এমন merit, এমন intelligence হেলায়

হারিও না। তোমরা ইচ্ছে করলে জগতে অনেক উন্নতি করতে পারবে ; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তোমবা নষ্ট হয়ে যাবে।

আমি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি বহু সন্ন্যাসী, সাধু, সন্ত, সাঁইবাবা, ফকির, মোহান্ত, মঠধারী ও জ্যোতিষীকে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু এক কথায় আমাদের সম্বন্ধে এমন মোক্ষম ও নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী আর শুনি নি।

দিনগুলি বেশ কাটছিল। পড়াশোনার উৎসাহ, পাগলা সন্ন্যেসীর লেকচাব ও কবিতাপাঠ, লতু, গোষ্ঠদিদি ইত্যাদি মিলিয়ে নিরুপদ্রবে কাটছে। বিকেলবেলায় ছুটি পাওয়ার মনের মধ্যে মুক্তির আনন্দ অনুভব করছি, এমন সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘ'টে গেল।

এই সময় আমাদের আর একজন নতুন মাস্টার এলেন। নতুন মাস্টার দেখলেই আমাদের দুষ্টুমি কববার উৎসাহ বেড়ে যেত চতুর্গুণ। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। দু-চার দিনের মধ্যেই একদিন প্রমথকে তিনি বেধড়ক প্রহার দিলেন। এর পরেই তাঁর মেজাজ একেবারে দস্তুরমতন খেঁকী হয়ে উঠল। সকলকেই মারতে উদ্যত। কয়েক দিনের মধ্যেই ক্লাসের একটি ভাল এবং ভালমানুষ ছেলের ওপরে কি কারণে রেগে গিয়ে ভদ্রলোক মেরে তাকে একেবারে আধমরা ক'রে দিলেন।

ইস্কুলে মারধোর খাওয়াটা আমরা খুব একটা অপমানজনক কাণ্ড ব'লে মনে করতুম না। মাস্টারেরা মারবে জেনেই আমরা ক্লাসে দুষ্টুমি করতুম। কখনও কখনও প্রহারের মাত্রা বেশি হয়ে যেত সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের দুষ্টুমি ও মাস্টার-জ্বালানো কায়দাগুলোও যে কোনও সময়েই মাত্রা ছাড়িয়ে যেত না, এমন কথাও হলপ ক'রে বলতে পারি না। পরের দিন বেলা দশটার সময় ইস্কুলে যাচ্ছি, দেখি, পথে—ইস্কুল

থেকে একটু দূরেই—আমাদের ক্লাসের ছেলেরা দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তারা আমাকে আটকে বললে, আজ আর ইস্কুলে যাওয়া হবে না।

কেন ?

উপেনকে কি রকম মেরেছে নতুন মাস্টার! ওর কোনও দোষ নেই। মিছিমিছি মারার জন্যে আমরা ধর্মঘট করেছি, এর বিহিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ ইস্কুলে যাব না।

বহুৎ আচ্ছা।—ব'লে আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম।

বেলা সাড়ে এগারোটা অবধি দাঁড়িয়ে থাকার পর অনেকেই বাড়ি চ'লে গেল। আমি আর শচীন হেদোয় গিয়ে ব'সে রইলুম। বেলা দুটো আড়াইটে নাগাদ ইস্কুলের একটা চাকর আমাদের দেখতে পেয়ে ইস্কুলে গিয়ে খবর দিয়ে দিলে।

পরের দিন ইস্কুলের মালিক মহাশয় ক্লাসে এসে খুব ধমকধামক করলেন। বললেন, তোমরা আমাকে না জানিয়ে এই রকম ধর্মঘট ক'রে অত্যন্ত অন্যায় করেছ। তোমাদের দলপতিকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

বেলা তিনটে নাগাদ ইস্কুলময় র'টে গেল, দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন ছাত্রের নাম কাটা যাবে। কে সে ?

পরের দিন আমাদের ক্লাসে একজন মাস্টার পড়াতে পড়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, স্থবির শর্মা, আমি শুনলুম, তোমাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

ম্যালেরিয়ার দেশে জন্মালেও পিলে-চমকানো অনুভূতিটা যে ঠিক কি রকম, তা অধিকাংশ বঙ্গবাসীই বোধ হয় জানেন না। সে রস অবর্ণনীয়। মাস্টারের মুখে এই মনোরম সংবাদটি শুনে আমার পিলে চমকে উঠল। জিজ্ঞাসা করলুম, কেন স্যার্ ?

তুমি নাকি সেদিনকার ধর্মঘটের Ring-leader ছিলে ?

ক্লাস-সুদ্ধ ছেলে একবাক্যে এই অভিযোগের প্রতিবাদ ক'রে উঠল। তারা বললে, স্থবির আগে কিছু জানত না স্যার্, আমরাই ওকে ইস্কুলে আসতে বারণ করেছিলুম। ওকে তাড়িয়ে দিলে আমরা আবার ধর্মঘট করব।

মাস্টার মশায় বললেন, ঠিক জানি না, ওই রকম কি একটা শুনছিলুম।

মাথার মধ্যে ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। বাড়িতে ফেরবার পথে অস্থির বললে, স্থব্‌রে, তোকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে শুনছি।

কি হবে ভাই ?

তুই এক কাজ কর্। বাড়ি থেকে লম্বা দে, নইলে বাবা মেরে ফেলবে।

লতুকে বললুম। সে সব শুনে বললে, কি হবে ?

লতু কাঁদতে লাগল। দীর্ঘদিনের আবছায়ায় আচ্ছন্ন সেই অশ্রুমুখী কিশোরীর মুখখানি আজ আমার মানসপটে ফুটে উঠছে আর মনে হচ্ছে, জীবনপ্রভাতে সেই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে তার আর অস্থিরের সহানুভূতি যদি না পেতুম, তা হ'লে কি করতুম !

লতু দু হাত থেকে দুগাছা চুড়ি খুলে আমায় দিয়ে বললে, এই দুটো বিক্রি ক'রে পালিয়ে যা। টাকার দরকার হ'লেই আমায় লিখিস, আমি পাঠিয়ে দোব, কেউ জানতে পারবে না।

গোষ্ঠদিদিকে সব বললুম। পালিয়ে যাব ঠিক করেছি শুনে সে বললে, অমন কাজ করিস নি।

বললুম, না পালিয়ে উপায় নেই। ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে শুনলে বাবা মেরে ফেলবেন।

গোষ্ঠদিদি জিজ্ঞাসা করলে, পালাবি যে, টাকা পাবি কোথায় ?

আমি ভেবেছিলুম, পালাবার কথা শুনলে গোষ্ঠদিদি নিজে থেকেই আমাকে টাকা দেবে। লতু আমায় চুড়ি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার বয়সী ছেলে স্তাকরার দোকানে চুড়ি বিক্রি করতে গেলে নিশ্চয় তারা সন্দেহ ক'রে হাঙ্গামা বাধাবে—এই ভয়ে চুড়ি নিই নি। গোষ্ঠদিদি প্রায়ই বলত, আমার টাকা ও গয়না যা কিছু আছে, সবই তো তোদের দুই ভাইয়ের, তোদের ভাবনা কি ?

সেই গোষ্ঠদিদি যখন জিজ্ঞাসা করলে, টাকা পাবি কোথায় ?—তখন আমার ভয়ানক অভিমান হ'ল। আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'বে জল পড়তে লাগল। ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে, তারপর বাড়িতে সে কি হাঙ্গামা হবে—এই চিন্তা আমাকে আকুল ক'রে তুলেছিল ; কিন্তু গোষ্ঠদিদির কথায় আমার সমস্ত আশঙ্কা অবসন্ন হয়ে পড়ল। শুধু মনে হতে লাগল, এতদিন ধ'রে এই নারী কথার মোহে আমাদের শুধু ছলনাই ক'রে এসেছে। গোষ্ঠদিদির জন্যে না করতে পারতুম এমন কাজ আমরা কল্পনাই করতে পারতুম না। ইস্কুল কোনদিনই আমার প্রিয় ছিল না। সেখান থেকে বিনা দোষে তাড়িত হ'লে লজ্জারও কোনও কারণ নেই। তবুও ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে বাবা যে মেরে ফেলবেন, সে কথা গোষ্ঠদিদি যে না জানত তা নয়। এসব জেনে-শুনেও সে যখন আমাকে সাহায্য করলে না, তখন মনে হ'ল, আমরা তাকে যতখানি নিজের ব'লে মনে করেছি, সে তা করে না।

আমাকে কাঁদতে দেখে গোষ্ঠদিদি আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, আমাকে ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হবে না ?

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললুম, কিচ্ছু কষ্ট হবে না। কেন কষ্ট হবে ?

আমি ম'রে গেলে যদি তোমাদের কষ্ট না হয় তো তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কিসের কষ্ট ?

গোষ্ঠদিদি আমাকে আরও জোরে চেপে ধরলে। আমি বললুম, ছেড়ে দাও, যাই।

আমার মুখখানা একবার তুলে দেখে গোষ্ঠদিদি প্রাণপণে আমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললে, না, তুই যেতে পারবি না, কিছুতেই তোকে ছাড়ব না।

ঠিক হ'ল, ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে বাবা যখন মারতে থাকবেন, সে সময় গোষ্ঠদিদি গিয়ে মাঝে প'ড়ে আমাকে উদ্ধার করবে। সে গিয়ে পড়লে মারের মাত্রা কম হবে।

কয়েক দিন ইস্কুলে কিন্তু আর ে . ও কথাই উঠল না। মনে হ'ল, ফাঁড়া বুঝি কেটে গেল। হঠাৎ একদিন ক্লাসে চাকরে এক টুকরো কাগজ এনে মাস্টার মশায়ের হাতে দিলে। তিনি চেঁচিয়ে প'ড়ে ক্লাস-সুদ্ধ ছেলেকে শুনিয়ে দিলেন,—ক্লাসে অনবচ্ছিন্ন অসদ্ব্যবহারের জন্য (continuous ill-behaviour) স্থবির শর্মার নাম ইস্কুলের খাতা থেকে কেটে দেওয়া হ'ল।

দণ্ডাজ্ঞা শুনেই আমার দুই কানের মধ্যে একবার ঝমঝম ক'রে ঝাঁজর বেজে উঠল। তারপর সমস্ত চিন্তা এক কেন্দ্রের চতুর্দিকে চীৎকার করতে লাগল, কি হবে ?

ক্লাস-সুদ্ধ ছেলে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। মাস্টার মশায় পড়ানো বন্ধ ক'রে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বললেন, স্থবির, তোমার জন্যে আমি দুঃখিত—অত্যন্ত দুঃখিত।

মাস্টার পড়া শেষ ক'রে চ'লে গেলেন, অন্য মাস্টার এসে পড়ানো শুরু করলেন ; কিন্তু খানিকটা শব্দ ছাড়া আর আমার কানে কিছুই

গেল না। ছুটির কিছু আগে হেডমাস্টার আমায় ডেকে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, এখানা তোমার বাবাকে দিও।

ছুটির পর ক্লাসের বন্ধুরা আমাকে সহানুভূতি জানালে ও কর্তৃপক্ষের এই অবিচারের জন্যে তারা ইস্কুল ছেড়ে দেবে বললে। আমার কানে কিন্তু কোনও কথাই যাচ্ছিল না। মনের মধ্যে এক প্রশ্ন খোঁচা দিতে লাগল, কি হবে, কি করব?

বাড়িতে এসে মাকে চিঠিখানা দিয়ে সোজা ছাতে চ'লে গেলুম। সেদিন গোষ্ঠদিদির সঙ্গে দেখা করলুম না, লতুদের বাড়িতেও যাওয়া হ'ল না। শুধু অস্থিরের সঙ্গে পরামর্শ চলতে লাগল, কি হবে, কি করব?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল, এতক্ষণে বোধ হয় চিঠিখানা বাবার হাতে পড়েছে, এইবার বুঝি ডাক পড়ে। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তখনও ডাক পড়ল না। মনে হতে লাগল, পাঁচ বছর আগে মেয়েদের ইস্কুলে পড়বার সময় তিন পয়সা চুরির মিথ্যা অভিযোগে প'ড়ে এই রকমই এক নিদ্রাহীন রাত্রি কেটেছিল—সেই আট বছর বয়সে হেদোর জলে ডুবে সব হাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার সংকল্প করেছিলুম, আজ তার চেয়েও অনেক বড় বিপদে আত্মহত্যার কথা বারে বারে মনে হতে লাগল, কিন্তু লতুর মুখ আমার সে সংকল্পকে ভাসিয়ে দিলে। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলুম, হে ভগবান, আমার ছোট্ট জীবনে কতবার কত বিপদে তুমি উদ্ধার করেছ, এইবার বাঁচাও।

কে যেন ছাতের দরজায় টোকা দিলে। উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসলুম। আবার টোকা! আবার টোকা!

তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়ে দেখলুম, অস্থির অগাধ নিদ্রায় অভিভূত। টপ ক'রে বাতি নিবিয়ে দিয়ে তিন লাফে ছাতের সিঁড়ি পার হয়ে

সন্তর্পণে দরজাটা খুলতেই এক ঝলক জ্যোৎস্না আমার মুখের ওপরে এসে পড়ল। মুখ বাড়িয়ে দেখি, গোষ্ঠদিদি এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার অঙ্গে ধপধপে সাদা একখানা শাড়ি, তার ওপর চাঁদের আলো প'ড়ে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। জ্যোৎস্নালোকপ্লাবিত নিস্তব্ধ রাত্রে গোষ্ঠদিদির সেই স্বভাববিষণ্ণ মুখের মৌন নিরুক্ত অভয়-আশ্বাসে আমার উদ্বেলিত মন জুড়িয়ে গেল। মনে হ'ল, আমার প্রার্থনা শুনে চাঁদের দেশ থেকে নেমে এসেছে আমার আসল মা, তার হাত ধ'রে ফিরে চ'লে যাব আমার কল্পলোকে, কাল সকাল থেকে আমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। সকলে বলবে, আহা, ছেলেটা বেশ ছিল, কোথায় চ'লে গেল!

গোষ্ঠদিদি বললে, কি রে, হাঁ ক'রে কি দেখছিস? দু ঘণ্টা ধ'রে দরজায় টোকা দিচ্ছি, শুনতেই পাস না?

আমি আর কথা বলতে পারলুম না, প্রাণপণে গোষ্ঠদিদিকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

দুজনে চ'লে গেলুম ছাতের এক কোণে। গোষ্ঠদিদি বলতে লাগল, তোর কোনও ভয় নেই। যেমন ক'রে পারি মায়ের হাত থেকে তোকে বাঁচাবই। স্থবির, তুই জানিস না, তোকে আমি কত ভালবাসি, বড় হ'লে বুঝতে পারবি। তোর জন্যে আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি।

রাত্রি তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। গোষ্ঠদিদি আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে নীচে পাঠিয়ে দিলে। বিছানায় শুয়ে বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, এমন সময় মার কণ্ঠস্বরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে চায়ের জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। তখনও বাড়ির আর কেউ সেখানে হাজির হয় নি। চা খাবার আগেই মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ মা, বাবাকে চিঠিখানা দিয়েছিলে?

না, কিসের চিঠি ওখানা ?

আমাকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমার কথা শুনে মা এমন চেঁচামেচি করতে শুরু ক'রে দিলেন যে, বাবা সেখানে এ'সে উপস্থিত হলেন। মা বললেন, তোমার গুণধর ছেলেকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বাবা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ?

সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক কোন্ বিশেষ অপরাধটির জন্যে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, তার স্পষ্ট ধারণা আমার নিজেরই ছিল না।

আমি বললুম, জানি না।

সেইখানেই কিল চড় লাথি এক পক্কড় হয়ে গেল। তারপরে তিনি একটা ঘরে আমায় নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে প্রথমে হেড-মাস্টারের দেওয়া চিঠিখানা পড়লেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তাড়িয়ে দিয়েছে বল, আজ তোমার শেষ দিন।

আজ যে আমার শেষ দিন, সে জ্ঞান আমারও ছিল ; তবুও শেষ মিনতি ক'রে বললুম, কেন তাড়িয়ে দিয়েছে, তা সত্যিই আমি জানি না। আপনি হেডমাস্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা ক'রে তারপরে আমাকে যা ইচ্ছা হয় করুন।

বাবা সে কথা গ্রাহ্য না ক'রে আমায় মারতে শুরু করলেন। আমার চীৎকার শুনে গোষ্ঠদিদি এসে দেখলে, দরজা বন্ধ। ঘরের ভেতরে আমি চীৎকার করতে লাগলুম, বাইরে দরজা ধ'রে গোষ্ঠদিদি কাঁদতে লাগল, আর আমার চীৎকারের সঙ্গে অস্থিরও তারস্বরে চেঁচিয়ে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। সেই ভোর থেকে বেলা নটা অবধি প্রহার দিয়ে বাবা আমাকে নিয়ে চললেন হেডমাস্টার মশায়ের বাড়ি।

মার খেয়ে আমার চেহারা এমন বদলে গিয়েছিল যে, হেডমাস্টার

আমাকে দেখে একেবারে চমকে উঠলেন। তিনি বাবাকে বললেন, এমন ক'রে প্রহার করা আপনার উচিত হয় নি। ইস্কুল থেকে বিতাড়িত হবার মতন কোন অপরাধ স্থবির করে নি। ইস্কুলের মালিক মশায় চান না যে, ও ওখানে পড়ে।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

হেডমাস্টার মশায় আমতা আমতা করতে লাগলেন। তারপরে বাবাকে একটা আলাদা ঘরে নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে কি সব বললেন।

বাবা আমাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে বললেন, যাও, চান-টান ক'রে ইস্কুলে যাও।

আমি ইস্কুলে যেতে লাগলুম। ঠিক হ'ল, বছরটা পুরো না হওয়া পর্যন্ত আমি সেইখানেই পড়ব। আসছে বছরে অন্য ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হব।

এই ঘটনায় আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল। পড়াশুনোর প্রতি যে অনুরাগ ও মনোযোগ এসেছিল, তার মূল পর্যন্ত মন থেকে উৎপাটিত হয়ে গেল। বাবা আমার কোন আবেদন ও মিনতি গ্রাহ্য না ক'রে আগে শাস্তি দিয়ে পরে বিচার করলেন, এজন্য তাঁর ওপর এমন ক্রোধ হ'ল যে, মনে মনে একেবারে দৃঢ়সংকল্প ক'রে ফেললুম, এবার মারতে এলে আমিও দু-এক হাত এমন চালাব যে, ভবিষ্যতে আমাকে প্রহার করবার সময় আক্রমণ ও আত্মরক্ষা দুদিকেই তাঁকে সমান নজর রাখতে হবে। কিন্তু আমার বয়স তখন মাত্র তেরো। সেই বয়সেই আমরা যথেষ্ট শারীরিক শক্তি অর্জন করেছিলুম বটে, কিন্তু বাবার সঙ্গে পেরে ওঠবার শক্তি কোথায় পাব? তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, সবার আগে গায়ের জোর বাড়াতে হবে।

লতুদের বাড়িতে যাবার রাস্তায় একটা মাঠ পড়ত। সেই মাঠের অনেকখানি জায়গা ঘিরে নিয়ে পাহারাওয়ালারা কুস্তির আখড়া করেছিল। সেখানে প্রকাণ্ড একখানা পাথরের গায়ে তেল-সিঁদুর দিয়ে মহাবীরের মূর্তি আঁকা ছিল ও মাঝে মাঝে খুব ধুমধাম ক'রে পুজো হ'ত। মহাবীরের পূজোর জন্মে অনেক মহিষ ও গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ও চৌধুরী অর্থাৎ তাদের সর্দার সেখানে ব্যায়াম করতে আসত। তা ছাড়া অনেক সাংঘাতিক চরিত্রের গুণ্ডাও সেখানে আসত যেত। আমরা দু ভাই মাঝে মাঝে আখড়ার মধ্যে ঢুকে তাদের কুস্তি দেখতুম, ও দু-একজনের সঙ্গে একটু আধটু মৌখিক ভাবও হয়েছিল। বাবাকে মারবার উত্তেজনায় আমরা এই আখড়ায় গিয়ে ভর্তি হলুম ও রোজ ইস্কুল থেকে ফিরে সেখানে গিয়ে কুস্তি সেরে সেইখানেই স্নান ক'রে পরিষ্কার হয়ে লতুদের ওখানে যেতে আরম্ভ করলুম। গোষ্ঠদিদি রোজ আমাদের জন্মে বাদাম ও মিছরির শরবত তৈরি ক'রে রাখত, ও সপ্তাহের মধ্যে তিন-চার দিন ছুটি ক'রে মুরগীর বাচ্চা রোস্ট হতে লাগল।

আমরা প্রতিদিন দুই ভাই নিয়ম ক'রে মহাবীরের মাথায় ফুল ও বাতাসা চড়াতে লাগলুম। এ সব পয়সা অবিশ্যি গোষ্ঠদিদির তহবিল থেকেই খরচ হ'ত। ব্রাহ্ম-বাড়িতে আমাদের জন্ম হয়েছিল। পরিবারে ও পরিবারের ধর্মবন্ধুদের কাছে নিশিদিন শুনেছি যে, পুতুলপুজো ক'রে হিন্দুরা ঈশ্বরের অবমাননা করে, এ সব সংস্কার সত্ত্বেও স্রেফ প্রাণের দায়ে আমাদের পুতুলের শরণাপন্ন হতে হ'ল। তার ওপর অতি নিম্নস্তরের সেই গরুর গাড়ির সর্দার ও গুণ্ডা হিন্দুদের মহাবীরের ওপর নিষ্ঠা দেখে আমরাও মহাবীরের মহাভক্ত হয়ে উঠলুম। মহাবীরকে শত শত ধন্যবাদ! তিনি আমাদের শরীরে শক্তি তো দিলেনই, উপরন্তু বাবাকে সুমতি দিলেন, কারণ এর পর আমাকে তিনি আর কখনও সে রকম

প্রহার করেন নি। বাড়িতে দিনরাত ভয়ে ভয়ে থাকা তো চুকলই, বরং কলকাতার সেরা সেরা গুণ্ডা এবং গরু ও মোষের গাড়ির সর্দারদের প্রাণের ইয়ার হওয়ার ফলে আমরা নিজেরাই এক-একটি ভয়ের কারণ হয়ে উঠলুম। মহাবীরকে ধন্যবাদ! সে শক্তি ও প্রতিপত্তির অপব্যয় আমরা কখনও করি নি।

একদিন বিকেলে অস্থিরের শরীরটা ভাল না থাকায় আমি একলাই বেরিয়েছিলুম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে অস্থিরের মুখে শুনলুম যে, কাল রাত্রে পাগলা সন্ন্যেসী আমাদের দুজনকে নেমন্তন্ন করেছেন।

রাত্রে গোষ্ঠদিদি এসে মাকে আবার ব'লে গেল, কাল ওরা দুজনে আমাদের ওখানে খাবে—শ্বশুর মশায় নেমন্তন্ন করেছেন।

পরদিন একটু তাড়াতাড়ি লতুদে' বাড়ি যাওয়া হ'ল। উদ্দেশ্য, দিন থাকতে ফিরে পাগলা সন্ন্যেসীর ঘরে গিয়ে জমা যাবে। আড্ডা সেরে উঠব উঠব মনে করছি, এমন সময় লতু আমায় আলাদা ডেকে নিয়ে বললে, একটা খুব গোপনীয় কথা আছে, না শুনে যেতে পাবে না।

বল।

না, এখন বলব না। সেই সন্ধ্যের পর বলব, তার আগে যাওয়া হবে না ব'লে দিচ্ছি।

ওরে বাবা! আজ সন্ধ্যের সময় পাগলা সন্ন্যেসীর ওখানে নেমন্তন্ন আছে, ঠিক সময়ে না গেলে ভদ্রলোক বড্ড দুঃখিত হবেন।

সে সব জানি না।—ব'লে লতু ফিরে চলল। আমি তাকে টেনে নিয়ে বললুম, বল না লতু, লক্ষ্মী লতু আমার।

লতু আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে বললে, না না না, এখন যাওয়া হবে না।—ব'লে ছটকে পালিয়ে গেল।

কি বিপদেই পড়লুম, লতুটা কি যে করে!

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে আবার গিয়ে সবার সঙ্গে বসা গেল। লতু আগেই এসে সেখানে জুটেছিল। তার হুকুম না পেলে আমার যাবার যে জো নেই, সে বিষয়ে সে একেবারে নিশ্চিন্ত। ওদিকে অস্থির তাড়া দিতে লাগল, কি রে, যাবি না ?

শেষকালে অস্থিরকে বলতে হ'ল, তুই যা, আমার যেতে একটু দেরি হবে।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ব'লে দিলুম, বাড়িতে আমার খোঁজ হ'লে ব'লে দিস, সে সন্ন্যেসীর ঘরে আছে।

অস্থির চ'লে গেল। সন্ধ্যে হ'ল, কিন্তু লতু কোন কথাই বলে না। ওদিকে আমার মনের অবস্থা খুবই চঞ্চল হতে লাগল। লতুটা যে কি করে।

ইতিমধ্যে সে যে উঠে কোথায় চ'লে গেল, আধ ঘণ্টা কোনও খোঁজ নেই। শেষকালে লতুকে ফাঁকি দিয়েই পালাব মনে ক'রে সবার কাছে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গুটিগুটি কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় কোথা থেকে লতু এসে আমায় ধ'রে বললে, চোর! গুটিগুটি পালানো হচ্ছে!

তুমিই তো পালিয়েছিলে। তুমি আসছ না দেখে চ'লে যাচ্ছিলুম। কি প্রাইভেট কথা আছে, বল ?

এখানে না, ওই ছাতে চল।

দুজনে ছাতে উঠলুম। লতু বললে, এ ছাতে নয়, ওই ওপরের ছাতে।

লতুদের ছাতের ওপরে একটা বড় ঠাকুর-ঘর ছিল। তারও ছাতে ওঠা যেত। সেটা ছিল তাদের পাড়ায় সবচেয়ে উঁচু ছাত। সেই ছাতে ওঠা হ'ল।

সেদিন বোধ হয় শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথি ছিল। আকাশ ও ধরণীতে জ্যোৎস্নার প্লাবন ছুটেছে—যতদূর চোখ যায় আলোয় আলো, যেন আনন্দের মুক্তধারা, কোথাও কোন মালিন্য নেই।

লতু আমায় ছাতের এক কোণে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর বুকের ভেতর থেকে একটা মোটা বেলফুলের মালা বের ক'রে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করলে।

আমার মনে হ'ল, চারিদিকের সেই জ্যোৎস্নারাশির সঙ্গে আমি যেন রেণু রেণু হয়ে একাকার হয়ে গেছি। ফুলমালার স্পর্শে অস্থিমাংসের অস্তিত্ব যেন আমার লোপ পেয়েছে, বায়বীয় শরীর নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

লতু উঠে দাঁড়াতেই আমার গলা থেকে মালাটা নিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিলুম। তারপরে প্রাণপণে আমরা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরলুম। আমার মনে হতে লাগল, সেই জ্যোৎস্না-সাগরে আমরা দুটিতে ভেসে চলেছি—লক্ষ তরঙ্গের আলোড়নে শত সহস্র জন্মের অভিজ্ঞতা মথিত হয়ে উঠতে লাগল আমাদের চারিদিকে। সেই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে কানে শুধু একটা আওয়াজ শুনতে লাগলুম, ধক—ধক—ধক।

সেটা কার বুকের আর্তনাদ, তা ঠিক বলতে পারি না।

লতু বললে, আজ আমাদের বিয়ে হ'ল। এই বিয়ের সাক্ষী রইল ওই চাঁদ। এ কথা চিরদিন গোপন থাকবে, শুধু জানলে ওই চাঁদ—আজ থেকে চাঁদ আমাদের সঙ্গে এই সম্বন্ধে বাঁধা রইল। আমি মরবার আগে এ কথা আর কারুকে ব'লো না।

আবার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আমাদের বাঁধন দৃঢ়তর হ'ল। আমায় একটা চুমু খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পিঠে দুম ক'রে একটা কিল মেরে লতু বললে, যা তোর পাগলা সন্ন্যেসীর কাছে।

হায় পাগলা সন্ন্যেসী, এমন সন্ধ্যেটি কি তোমার ঘরে কাটাবার জন্যে তৈরি হয়েছিল!

লতুদের ওখান থেকে এক রকম দৌড়ে পাগলা সন্ন্যেসীদের বাড়িতে গেলুম। বাড়িতে ঢুকেই অস্থিরের হাসির হর্‌রা কানে গেল। আমাদের দুই ভাইয়ের খুব চেঁচিয়ে হাসার অভ্যাস ছিল। এই অসভ্যতার জন্যে বাড়িতে প্রায়ই বকুনি খেতে হ'ত। অস্থিরেব হো-হো হাসি শুনে তিন লম্ফে সিঁড়ি পার হয়ে ঘরে ঢোকামাত্র অস্থির চীৎকার ক'রে বললে, স্থবি্‌রে, এতক্ষণে এলি, আমরা এক্ষুনি উঠছিলুম খাবাব জন্যে।

পাগলা সন্ন্যেসী খাটের ওপর আধ-শোয়া হয়ে ব'সে ছিলেন। তিনি উঠে ব'সে বললেন, রামবাবুর বুঝি এতক্ষণে মজলিস ভাঙল?

আমি একটু লজ্জিত হয়ে অস্থিরের পাশে বসামাত্র সে বললে, পাগলা সন্ন্যেসী, স্থবি্‌রেকে একটু ওষুধ দিন তো।

কি ওষুধ রে?

মধু মধু, এ ওষুধ খেলে যে কোন ব্যারাম সেরে যাবে।—এই ব'লে সে আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে হা দিলে। একটা বিশ্রী গন্ধ পেলুম। এমন গন্ধ ইতিপূর্বে কখনও নাকে যায় নি। কিন্তু খুব সম্ভব পূর্বজন্মের অভিজ্ঞতার ফলে তখনই বুঝতে পারলুম, সেটা কিসের গন্ধ।

খাটের ওপর থেকে কতকগুলো বই সরিয়ে পাগলা সন্ন্যেসী একটা কালো পেট-মোটা অদ্ভুত আকারের বোতল বের করলেন। খাটের ওপরে ব'সেই ঘাড় নীচু ক'রে খাটের তলা থেকে তিনটে বেঁটে পল-কাটা কাচের গেলাস টেনে খাটের ওপরে তুলে সেগুলোর মধ্যে ওষুধ ঢালতে আরম্ভ করলেন। দৃশ্যটি আমি জীবনে এই প্রথম দেখলুম। অস্থির কিন্তু এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল, যেন এ রকম ব্যাপার তার চোখের সামনে সর্বদাই ঘটছে।

দেখলুম, পাগলা সন্ন্যেসী একটি গেলাসে অনেকখানি আর দুটিতে একটু একটু ক'রে মধু ঢাললেন, তারপরে ঘটি থেকে একটু ক'রে জল সবগুলোতে দিয়ে একটা গেলাস আমায় এগিয়ে দিয়ে বললেন, এস রামবাবু।

গেলাসটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিলুম। অস্থির যে আমার চাইতে এককাঠি বেড়ে যাবে, তা সহ্য হচ্ছিল না। গেলাসটা মুখের কাছে নিয়ে যেতেই একটা বিশ্রী তীব্র গন্ধ পেলুম। দ্বিতীয় বার গেলাসটাকে নাকের কাছে আনবার আগেই অস্থির বললে, এই, 'চিনচিন' করলি না?

অস্থির নিজের গেলাসটা বাড়িয়ে পাগলা সন্ন্যেসীর গেলাসে ঠন ক'রে ঠেকালে। আমিও দেখাদেখি আমার গেলাস বাড়িয়ে তাদের গেলাস দুটোতে ঠেকালুম। পাগলা সন্ন্যেসী বললেন, To your future.

আমরাও সমস্বরে বললুম, To your future.

আমাদের হাতেখড়ি হ'ল। অস্থিরের বয়েস বারো, আমার বয়েস চোদ্দ আর পাগলা সন্ন্যেসীর বয়েস তিয়াত্তর।

পাগলা সন্ন্যেসী বলতে লাগলেন, রামবাবু আর লক্ষ্মণবাবু, ব্রাদার, তোমাদের একটা কথা বলবার জন্যে ডেকেছি। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে তোমাদের দু ভায়ের সঙ্গে ভাব হয়ে এই কটা বছর আমার পরমানন্দে কাটল। আমি চ'লে যাব, তোমরা এখনও অনেকদিন থাকবে, আমার কথা মনে রেখো ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমাদের বয়েস যদি বেশি হ'ত কিংবা আমার বয়েস যদি কিছু কম হ'ত—

বেশ হাসিখুশি হল্লোড় চলছিল, হঠাৎ এই সব কথায় ঘরের মধ্যে যেন একটা বিষাদের ছায়া এসে পড়ল। পাগলা সন্ন্যেসী ব'লে যেতে লাগলেন, একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে করব ব্রাদার, রাখতে হবে।

বলুন।

আমার অবর্তমানে বউমাকে অর্থাৎ তোমাদের 'গোষ্ঠদিদিকে তোমরা দেখো, বুঝলে ?

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, বাড়ি-ঘর সব রইল, টাকা-পয়সার অভাব আমি রেখে যাব না। তোমরা শুধু দেখবে, ও যেন ভেসে না যায়। ও তোমাদের ভালবাসে, তোমাদের কথায় অবাধ্য হবে না।

পাগলা সন্ন্যেসীর ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়িতে এসে শুতে প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। ভোরবেলা গোষ্ঠদিদির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। তাদের বাড়ির দু-তিনটে গরাদবিহীন জানলা খুললে আমাদের বাড়ির সব দেখা যেত। এই একটা জানলা খুলে গোষ্ঠদিদি ডাকছিল, মা, মা, মা গো, একবার এদিকে আসুন না।

মা নীচে ছিলেন, বোধ হয় গোষ্ঠদিদির আওয়াজ কানে যায় নি। আমি তড়াক ক'রে বিছানা ছেড়ে জানলার ধারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে দিদি ?

গোষ্ঠদিদি কাঁদতে কাঁদতে বললে, বাবা ম'রে গেছে রাম-ভাই।

চেঁচামেচি শুনে বাবা মা দাদা সবাই সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। আমরা তখুনি জানলা টপকে পাগলা সন্ন্যেসীর ঘরে গিয়ে দেখলুম, চিত হয়ে তিনি শুয়ে আছেন, বুকের ওপরে হাত দুটি জোড় করা, মুখ ঈষৎ ফাঁক, চোখের দুই পাশে অশ্রুর রেখা, যেন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছেন।

পাগলা সন্ন্যেসীর বাড়িতে এই ক বছরের মধ্যে কখনও কোনও আত্মীয়স্বজনকে দেখি নি ; কিন্তু তিনি মারা যাওয়া মাত্র, বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে, আহিরীটোলা থেকে চ'লে এল ভায়ের দল, নেবুতলা

থেকে এসে গেল ভাইপোর দল, পৌত্র ও দৌহিত্রে বাড়ি ভ'রে গেল। বড় ছেলের কাছে টেলিগ্রাম গেল, দিন ছয় বাদে সেও এসে পড়ল। যে যেখানে ছিল, সবাই এল, শুধু এল না আমাদের গোষ্ঠদিদির দেবতা।

শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে যাবার পর সমস্যা উঠল, গোষ্ঠদিদির খরচ চলবে কি ক'রে? সে থাকবে কোথায়?

ভাশুর জানালেন, বাবা তো কিছুই রেখে যান নি, আমারও এমন কিছু অবস্থা নয় যে, ভাদ্রবউকে নিয়ে গিয়ে রাখি। বউমা তাঁর নিজের লোকজনের কাছে গিয়ে থাকুন, আমার যখন সুবিধে হবে, আমি কিছু কিছু ক'রে সাহায্য করতে পারি।

ভাদ্রবউ জানালে, তিন চুলোয় কেউ থাকলে আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ত না। কারুর সাহায্যে আমার দরকার নেই। আমার স্বামী নিরুদ্দেশ, সেজন্যে এই বাড়ির অর্ধেক ভাগে আমার অধিকার আছে। বাড়ি বিক্রি ক'রে অর্ধেক টাকা আমায় দেওয়া হোক।

ভাশুর পরম পুলকিত হয়ে জানালেন, বাবা বাড়ি বন্ধক রেখে গিয়েছেন। বিক্রি ক'রে পাওনাদারদের সব দেনা মিটবে কি না সন্দেহ।

এটা যে একেবারে মিথ্যে কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না; কিন্তু গোষ্ঠদিদির হয়ে কে লড়বে? সে সব শুনে চুপ ক'রে রইল।

আমাদের বাড়িতে কয়েকটি বিধবা ও অনাথ ছেলে থাকত। এরা ছিল বাবার পেটোয়া। আমাদের ওপর বাবার শাসন যতই কঠিন হোক না কেন, এদের প্রতি তাঁর সহৃদয়তার মাত্রা প্রায় অপরাধের সীমায় গিয়ে পৌঁছত। এরা হাজার অন্যায় করলেও কারুর কিছু বলবার জো ছিল না। এদের নিয়ে মার সঙ্গে বাবার খিটিমিটি বাধত এবং তাই নিয়ে

সংসারে মাঝে মাঝে ভারি অশান্তি হ'ত। আমরা যার দলে থাকলেও ভরসা ক'রে কাউকে কিছু বলতে পারতুম না। গোষ্ঠদিদির বাসস্থানের সমস্যা উঠতেই আমরা দু ভাই পরামর্শ ক'রে ঠিক করলুম, তাকে আমাদের বাড়িতেই এনে রাখতে হবে। এও ঠিক হ'ল, প্রস্তাবটা বাবার কাছে পাড়তে হবে, কারণ বাড়িতে যে কয়টি মেয়ে আছে তাদের নিয়েই মা ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছেন, নতুন আগন্তুকের সম্ভাবনাকে তিনি আমলই দেবেন না।

একদিন বিকেলে সাহস ক'রে বাবাকে গোষ্ঠদিদির কথা ব'লে ফেলা গেল। দুজনে মিলে গোষ্ঠদিদির অবস্থার এমন বর্ণনা করলুম যে, বাবার চোখে জল এসে গেল। ছেলেবেলায় বাবা অনেক সাংসারিক দুঃখকষ্ট পেয়েছিলেন, বোধ হয় সেইজন্যে দুঃখীজনের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক মমতা অত্যন্ত প্রবল ছিল। আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়, আমরা থাকতে গোষ্ঠ আবার যাবে কোথায়? যাও, তাকে এখুনি নিয়ে এস, বল গিয়ে, তোমার কোনও ভাবনা নেই, আমরা আছি।

আমরা কাজ ফতে ক'রে উৎফুল্ল হয়ে চলেছি, এমন সময় বাবা বললেন, আচ্ছা, দাঁড়াও, আজ আর তাকে কিছু ব'লো না, তোমাদের মাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।

সে রাত্রে বাবা গোষ্ঠদিদিকে নিয়ে আসবার প্রস্তাব করা মাত্র মা একেবারে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বসলেন, তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গেল?

এক ধমকেই বাবা চুপ হয়ে গেলেন। তিনি হয়তো ভাবতে লাগলেন, বুদ্ধিশুদ্ধি তাঁর যে কোনকালে ছিল, সে কথাটা তাঁর স্ত্রী অ্ন্য হ'লে প্রকারান্তরে স্বীকার করছেন।

কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয়ে যায় দেখে আমরা দুজনে একটু একটু ক'রে গোষ্ঠদিদির হয়ে বলতে লাগলুম। দু-চারটে কথা বলতে না বলতে মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, চুপ কর্ তোরা, এই বয়েস থেকেই বাপের ধারা নিচ্ছেন আর কি!

মা বাবাকে বলতে লাগলেন, গোষ্ঠকে যে বাড়িতে নিয়ে আসবে বলছ, একবার তার স্বামীর কথা ভেবে দেখেছ? ও এখানে থাকুক, তারপর একদিন সেই মাতাল বদমাইসটা এসে এখানে উঠুক আর বাড়িতে মদ আর গাঁজার হল্লা চলুক।

মদ-গাঁজার নাম হতেই বাবা একেবারে চমকে উঠলেন, না না না, ও-কথাটা আমার মনেই হয় নি, তুমি ঠিকই বলেছ, না না না।

গোষ্ঠদিদির ভাশুর মাস তিনেক কলকাতায় থেকে বাড়ি বিক্রি ক'রে শ পাঁচেক টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন, বাড়ি বেচে পাওনাদারদের দেনা ও অন্য খরচ চুকিয়ে হাজারটি টাকা বেঁচেছে। তার পাঁচশো তোমায় দিলুম। আমি পরশু মঙ্গলবারের স্টীমারে চ'লে যাচ্ছি। বাড়ি যারা কিনেছে তারা এক মাসের সময় দিয়েছে, এই এক মাসের মধ্যে অন্য জায়গা ঠিক ক'রে তুমি চ'লে যেও।

সেই রাত্রেই গোষ্ঠদিদি সব কথা ব'লে আমাদের বললে, একদিনের মধ্যে যেখানে হোক আমার জন্যে একখানা ঘর ঠিক ক'রে দে।

কলকাতা শহরে ইলেকট্রিক ট্রাম যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে, তখন সেই ঘোড়াবিহীন গাড়ি দেখবার জন্যে সকালে-সন্ধ্যায় কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের দুই ফুটপাথে বিপুল জনতা হ'ত। রাত্রির অন্ধকারে ট্রলির চাকায় ও গাড়ির চাকায় ঝকঝক ক'রে বিদ্যুৎ ঝলকাত। বিনি পয়সায় এই আতশবাজি দেখবার জন্যে, বিশেষ ক'রে রাত্তেই, লোক জমত বেশি। আমাদের তো কোনও পরব ফাঁক যাবার জো ছিল না। প্রায় রোজই

রাত্রে পড়াশুনা শেষ হবার পর বাড়ি থেকে দশ মিনিটের ছুটি নিয়ে ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে ট্রাম-বাজি দেখে বাড়ি ফিরতুম। এই রকম এক রাত্রে তামাশা দেখে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় দেখি, একটি ছোট্ট মেয়ে, বয়স বোধ হয় তার সাত-আট বছর হবে, পথ হারিয়ে 'মা গো' 'মাসী গো' ব'লে প্রাণপণে চীৎকার করছে আর কাঁদছে। মেয়েটির চারিদিকে বেশ একটি ভিড় জমেছে, সবাই তাকে নানা প্রশ্নে আরও ব্যস্ত ক'রে তুলছে। মেয়েটির দিকে এগিয়েই আমরা তাকে চিনতে পারলুম। আমাদের ইস্কুলের পথে একটা গলির মধ্যে প্রায়ই তাকে খেলতে দেখতুম।

অস্থির তার কাছে গিয়ে বললে, খুকী, তোমার অমুক জায়গায় বাড়ি না ?

সে হাঁ-না কিছুই বললে না, শুধু কাঁদতে লাগল। চল খুকী, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিই।—ব'লে আমরা তাকে নিয়ে চললুম। ভিড়েরও কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে চলল।

আমরা ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম। মেয়েটিকে নিয়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখি যে, তার মা আর মাসী মড়াকান্না জুড়েছে, মেয়ের শোকে যায়-যায়, এমন সময় আমাদের সঙ্গে তাকে দেখা মাত্র দুজনে মিলে প্রহার দিতে আরম্ভ করলে। অনেক কষ্টে তাদের কবল থেকে তাকে রক্ষা ক'রে সে রাত্রে বাড়ি ফেরা গেল।

এর পর থেকে ইস্কুলে যাবার মুখে অথবা ফেরবার পথে প্রায়ই আমরা তাদের বাড়িতে গিয়ে মেয়েটির খোঁজ করতুম। মেয়েটির নাম ছিল শৈল, সবাই তাকে 'শৈলী' ব'লে ডাকত। শৈলর মা ও মাসী আমাদের দুই ভাইকে 'বেহ্মজ্ঞানীদের ছেলে' ব'লে ডাকত। মা ও মাসী উভয়েই ছিল রুগ্না, কিন্তু কথাবার্তা ছিল ভারি মিষ্টি। তাদের পরিবারে পুরুষ কেউ ছিল না, মা ও মাসী কাজও কোথাও করত না, কি ক'রে তাদের

সংসার চলত তা জানি না। মাসী মাঝে মাঝে পিঠে ও গজা বানিয়ে আমাদের খেতে দিত। বেশ লোক ছিল তারা।

একটা অতি পুরাতন বাড়ির একতলায় দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে তারা থাকত। একতলায় আরও কতকগুলো অন্ধকার ঘরে ভাড়াটে ভর্তি ছিল। বাড়ির দোতলায় একখানা মাত্র ঘর ছিল, কিন্তু সে ঘরখানার পাঁচ টাকা ভাড়া ছিল ব'লে ভাড়া হ'ত না।

গোষ্ঠদিদি ঘর ঠিক করবার কথা বলা মাত্র আমরা শৈলীর মা ও মাসীর কাছে গিয়ে তাদের বাড়ির দোতলার ঘরখানা তার জন্যে ঠিক ক'রে ফেললুম। গোষ্ঠদিদির ভাশুর বর্মা যাবার আগেই তাকে নিয়ে গিয়ে শৈলদের দোতলায় তার নতুন সংসার পেতে দিলুম।

আমি একাধিক সাধুমুখে শুনে'ছি যে, সাধকেরা যদি বুঝতে পারেন, দৈহিক অপটুত্ব তাঁদের যোগে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তা হ'লে নতুন কলেবর লাভের জন্য তাঁরা স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। এও শুনেছি, অনেক সাধক মনোমত শিষ্য পেলে তাকে দীক্ষা দিয়েই দেহত্যাগ করেন। আমার মনে হয়, পাগলা সন্ন্যেসী উপযুক্ত শিষ্যবোধে আমাদের দু ভাইকে মাধুর্য-সাধনের দীক্ষা দিয়ে ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

যে অজ্ঞাত শক্তি এই বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে, সেদিনকার সেই রাত্রিটুকুর মধ্যে সে আমার জীবনে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রবাহ নিয়ে এল, তা ভোলবার নয়। সন্ধ্যার সময় লতুর সঙ্গে গান্ধর্ব বিবাহে আবদ্ধ হওয়া, রাত্রি নটা নাগাদ জীবনে সর্বপ্রথম মধুর আস্বাদন ও শেষরাত্রে পাগলা সন্ন্যেসীর অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসরণ, আমাকে একেবারে বিহ্বল ক'রে ফেললে।

গোষ্ঠদিদিকে শৈলদের বাড়িতে স্থিতি ক'রে দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন আমাদের বিষণ্ণ মুখ দেখে মা বাবা পর্যন্ত সান্ত্বনা

দিতে লাগলেন। তবুও গোষ্ঠদিদি ও পাগলা সন্ন্যেসী যে আমাদের কি ছিল, তা বাড়ির কেউ জানত না। যে বাড়ি একরকম আমাদের নিজেরই ছিল, পাগলা সন্ন্যেসী আর পাঁচ-সাত বছর জীবিত থাকলে হয়তো যে বাড়ির মালিকই আমরা হতুম, সে বাড়ির সদর-দরজায় তালা পড়ল। দোতলার বারান্দায় ইংরেজী ও বাংলায় কার্ড ঝুলল—বাড়ি ভাড়া। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে ছাতের দরজায় কখন পাঁচটা টোকা পড়বে তা শোনবার জন্যে আর উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হয় না। জ্যোৎস্নারাতে মনে হতে লাগল, আমাদেরই একান্ত গোষ্ঠদিদি শৈলর মা-মাসীকে নিয়ে ছাতে ব'সে গল্প করছে।

অদৃষ্ট সেদিন আমার সঙ্গে কি ছলনাই করেছিল—সে কথা মনে হ'লে হাসিও যেমন পায়, বিস্ময়ও তেমনই জাগে।

মনের যখন এ রকম অবস্থা, ঠিক সেই সময় আমাদের বাড়িওয়ালা নোটিস দিলে, এক মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, তার যক্ষ্মা হয়েছে, সে কলকাতায় এসে চিকিৎসা করাবে।

ভালই হ'ল। সেই অবস্থা আমার ও অস্থিরের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমরা আবার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে আমাদের সেই পুরনো বাড়ির কাছেই একটা বড় বাড়িতে উঠে গেলুম।

স্বদেশী আন্দোলনের কিছু আগে টহলরাম নামে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কলকাতায় এসে খুব হৈ-চৈ লাগিয়েছিলেন। ইনি বিডন উদ্যানে প্রত্যহ বিকেলে ইংরেজীতে বক্তৃতা করতেন—ইংরেজ জাত এবং ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট কার্জনের নিত্য বাপান্ত করতেন। তখনকার দিনের ইংরেজ গবর্মেণ্ট কি হজমিগুলি খেয়ে যে সে সব নিছক গালাগালি বরদাস্ত করত, তা গবেষণার বিষয়। এজন্য সে সময় অনেকে টহলরামকে ইংরেজের গুপ্তচর বলত। যা হোক, আমি, অস্থির ও বিশেষ ক'রে আমাদের বন্ধু প্রভাত টহলরামের এক নম্বরের চেলা হয়ে পড়লুম।

টহলরাম ইংরিজীতে একটা গান লিখেছিল, তার প্রথম স্ট্যাঞ্জাটা মনে আছে—

God save our ancient Ind
    Ancient Ind once glorious Ind
From Sagar island to the Sind
    From Himalaya to Cape Comorin
May perfect peace ever reign therein.

প্রতিদিন বিডন উদ্যানে বেলা চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা অবধি টহলরাম ইংরেজ জাতকে খিস্তি করত। তারপরে দিশী সুরে এই ইংরেজী গানটি গাওয়া হ'ত। পরে এই গান গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা ক'রে পথে পথে ঘুরে শঙ্কর ঘোষের লেনে টহলরামের বাড়িতে এসে আমাদের নিজস্ব সভা বসত।

পড়াশুনার সঙ্গে মনোমালিন্য তো ছিলই, দেশোদ্ধারের হাওয়া লেগে তার সঙ্গে একদম বিচ্ছেদই হয়ে গেল।

এই সময় আবার লাগল রুশে জাপানে যুদ্ধ। তখনকার দিনে আমরা জাপানকে পরম বন্ধু ব'লে জানতুম। এর মূলে ছিল কয়েকটি

কারণ। প্রথম কারণ হচ্ছে, ইংরেজেরা মনে করত যে, ভারতবর্ষের ওপরে রুশের নজর আছে। রুশকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে আফগানিস্তানকে তারা বহুদিন অবধি টাকা যুগিয়েছে। এইজন্যে ভারতবাসীরা মনে করত, জাপানের প্রতি ইংরেজ সহানুভূতিসম্পন্ন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে, সে সময়ে বাঙালী ছেলেদের বিদেশ থেকে নানা বিদ্যা শিখে দেশকে উন্নত করবার একটা বিরাট অনুপ্রেরণা এসেছিল। ইংলণ্ডের চাইতে জাপানে থেকে লেখাপড়া শিখতে খরচ কম ছিল, ওদিকে আবার কালাপানি পার হয়ে জাত যাবার ভয়টাও ছিল না ব'লে মাঝামাঝি একটা রফা ক'রে অনেকেই জাপানে যেত।

রুশ-জাপানে যুদ্ধ লাগতেই কলকাতায় জাপানকে সাহায্য করবার জন্যে নানা অনুষ্ঠান হতে লাগল। থিয়েটার, ম্যাজিক প্রভৃতি দেখিয়ে জাপানের নামে টাকা তোলা হতে থাকল। সে সব টাকা জাপান অবধি পৌঁছত, না, রাস্তাতেই টর্পেডোর আঘাতে জাহাজডুবি হ'ত, তা জানি না। মনে পড়ে, সেই হুল্লোড়ে অনেক ছেলেই মেতেছিল, আমরাও কিছু মেতেছিলুম।

এর পরেই এল স্বদেশীর প্লাবন। সেই প্লাবনে আমরা একেবারে গা ভাসিয়ে দিলুম। প্রতিজ্ঞা করা হ'ল—দেশের সেবা করব, ইংরেজের চাকরি করব না, হাইকোর্টের জজিয়তি পেলেও নয়।

দেশের সেবা কতখানি করেছি তা জানি না, তবে হাইকোর্টের জজিয়তি কখনও করি নি। প্রতিজ্ঞা অটুট আছে, কারণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবার অবসরই ইংরেজ গবর্মেণ্ট কোনও দিন আমাকে দিলে না।

গোষ্ঠদিদি নতুন আবহাওয়ার মধ্যে প'ড়ে নিজেকে দিব্যি মানিয়ে নিলে। তার হাতে বেশ কিছু টাকা ও গয়নাপত্র ছিল, যা দিয়ে সারাং জীবন সে ভালভাবেই কাটাতে পারত। শৈলদের বাড়িতে আরও

যে সব ভাড়াটে থাকত, তারা সকলেই ব্রাহ্মণেতর জাত। তারা সকলেই তাকে বামুনদিদি ব'লে খুব খাতির করত। আমরা প্রতিদিন অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যেও তার কাছে গিয়ে তদারক ক'রে আসতুম। মধ্যে মধ্যে সেও আমাদের বাড়িতে এসে একদিন দুদিন থাকত। এই দিনগুলি যে কি ভালই লাগত!

মানুষের দেহে রোগের বীজাণু প্রবেশ করা মাত্র যেমন সারা দেহের মধ্যে তাকে প্রতিরোধ করবার সাড়া প'ড়ে যায়, তেমনই মনের মধ্যে কোন বাসনা বা সংকল্প জাগা মাত্র প্রকৃতির মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে প্রতিরোধের সাড়াই জাগে। শুধু তাই নয়, প্রকৃতি মানুষকে দিয়েই তার ইচ্ছার সাফল্যের বিরুদ্ধেই কাজ করিয়ে নিতে থাকে। এই ব্যাপার আমি নিজের জীবনে বার বার প্রত্যক্ষ করেছি।

লতুকে আমি ভালবাসতুম, সেও আমাকে ভালবাসত। আমাদের সামাজিক মিলন হওয়া সম্ভব কি না, যদিবা সম্ভব হয় তা হ'লে ভবিষ্যতে আমাদের সংসারযাত্রা নির্বাহিত হবার উপায় কি হবে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই দুজনের কারুর মনেই উদয় হয় নি। আমাদের স্থূল দৃষ্টির অন্তরালে যে বিরাট শক্তি এই দুনিয়া-যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করছে, সে-ই এই মিলনের ঘটকালি করেছিল। আমাদের মধ্যে কখনও বিচ্ছেদ আসতে পারে অথবা কোনও শক্তি আমাদের একজনকে আর একজনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা কল্পনাতেও আমাদের মনে আসে নি।

কার্তিক মাস। পূজোর ছুটির পর সবেমাত্র ইস্কুল খুলেছে, এই সময় একদিন লতুর মা আমাকে বললেন, স্থবির, শুনেছিস, সামনের অঘ্রাণে লতুর বিয়ে যে!

কোথায় ?

ছেলে পশ্চিমে সরকারী কাজ করে, খুব ভাল কাজ। খুব লেখাপড়া জানে, খুব সুন্দর দেখতে। তাদের বাড়িই পশ্চিমে, লতুর উপযুক্ত বর হয়েছে।

লতু সেখানে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলুম, লতু কোথায় ?

মা বললেন, সে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। বিয়ের কথা শুনে লজ্জা হয়েছে বোধ হয়।

লতুকে খুঁজে বার করলুম। তেতলার একটা ঘরের কোণে হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে সে ব সে ছিল। আমি কাছে গিয়ে ডাকতেই সে মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে, চোখে তার এক ফোঁটা অশ্রু নেই।

আমি পাশে বসতেই আমার একখানা হাত মুঠো ক'রে ধ'রে নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে বললে, শুনেছিস ?

আমি শুধু ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ। গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরুল না।

ঠিক সেই রকম ক'রে আমরা ব'সে রইলুম। কারুর মুখে কোনও কথা নেই, কারুর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ নেই। নীচে আনন্দ-কোলাহল চলছিল, তারই আওয়াজ এক-আধটা ছটকে এসে আমাদের কানে লাগতে লাগল। মধ্যে মধ্যে লতু আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরতে লাগল। মধ্যে মধ্যে মনে হতে লাগল, তার সর্বাঙ্গ যেন থরথর ক'রে কাঁপছে।

আমাদের চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল। ঠাকুরঘরে শাঁখ-ঘণ্টা শুরু হ'ল। ঘরের মধ্যে ঝি ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে আমাদের দুজনকে ওই ভাবে ব'সে থাকতে দেখে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল।

আরও কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর আমি বললুম, লতু, চললুম।

লতু আমার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে জানালে, আচ্ছা।

টলতে টলতে বেরিয়ে চ'লে এলুম।

পরের দিন একটু তাড়াতাড়ি ওদের ওখানে গিয়ে দেখি, খুব সমারোহ শুরু হয়ে গিয়েছে। শাড়িওয়ালা এসেছে দু-তিনজন। তিন-চারজন সেকরা ব'সে গেছে হীরের কুচি পান্নার কুচি নিয়ে,—জড়োয়া গয়নাগুলো শিগগিরই তৈরি হওয়া চাই; আর সময় নেই, অঘ্রাণের মাঝামাঝি বিয়ে, কার্তিক মাসের আর কটা দিন মাত্র আছে।

লতু আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, আমি এ বিয়ে কিছুতেই করব না। তুই আমায় নিয়ে পালিয়ে চল্, শিগগির ব্যবস্থা কর্।

পরদিন ভোরবেলা উঠেই গোষ্ঠদিদির কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললুম, তুমি লতুকে মাসখানেক রাখ, তারপরে আমি একটা চাকরি পেলেই তাকে নিয়ে চ'লে যাব।

গোষ্ঠদিদি কিছুতেই রাজী হ'ল না। সে বললে, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে! সে বড়লোকের মেয়ে, তাকে কোথায় এখানে এনে রাখবি? তার বাপ আমাকে তোকে দুজনকেই জেলে পুরবে।

গোষ্ঠদিদির পায়ে ধরলুম, কত কাঁদাকাটি করলুম, কিন্তু কিছুতেই সে রাজী হ'ল না।

বন্ধুবান্ধবদের জানালুম, কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কেউ করতে পারলে না। ওদিকে লতু রোজই তাড়া দিতে লাগল, কি রে, কি হ'ল?

বিয়ে করবে না ব'লে দিনরাত্রি কাঁদতে থাকায় তাদের বাড়িতেও মহা অশান্তি শুরু হয়ে গেল। শেষকালে লতুর মা একদিন আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, লতুকে তুই একটু বুঝিয়ে বল্, ও কি পাগলামি করছে!

লতু আমাকে বললে, তুই যদি আমাকে না নিয়ে যাস তো আমি বিষ খাব।

পাগলা সন্ন্যেসীর কথা মনে পড়তে লাগল। এই দুর্দিনে তিনি থাকলে হয়তো কিছু সুরাহা হতে পারত। রাগে ও অভিমানে গোষ্ঠদিদির ওখানে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলুম।

আমি ও লতু নিত্য গোপনে পরামর্শ করি, নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করি; কিন্তু সে সব উদ্ঘাতিনী পন্থায় পা বাড়াতে সাহস হয় না। অদৃষ্টচক্রকে জোর ক'রে ঘুরিয়ে দেবার যে চেষ্টা আমরা করেছিলুম, তাতে সফল তো হলুমই না, বরং আস্তে আস্তে তার নীচে আমরা মাথা পেতে দিলুম। লতু বললে, অদৃষ্ট এই যে জোর ক'রে আমাদের আলাদা ক'রে দিলে, অদৃষ্টের এই আঘাত আমরা কাটিয়ে উঠবই, কিছুতেই সে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তোরই থাকব, তুই আমারই থাকবি, দেখি, কোথায় গিয়ে এর শেষ হয়!

লতু ব'লে দিয়েছিল, বিয়ের দিন তুই আসিস নি, পরের দিন সকাল সকাল আসবি। আমরা এগারোটায় স্টেশনে যাব, বারোটায় গাড়ি ছাড়বে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দুই ভাই সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লুম। আমার একটা সোনার বক্‌লস আংটি ছিল, কোথাও যেতে-টেতে হ'লে সেটা পরতুম। রাস্তায় বেরিয়ে অস্থিরের হাতে আংটিটা দিয়ে বললুম, এটা লতুকে দিস, তার বিয়ের উপহার।

অস্থির চ'লে গেল, আর আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে এলুম, অস্থির তখনও ফেরে নি।

বিছানায় শুয়ে কাঁদবার চেষ্টা করতে লাগলুম, কিন্তু কান্না এল না।

মনের মধ্যে সে এক অদ্ভুত অস্থিরতা, অব্যক্ত অসহনীয় যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালবেলা অস্থির বললে, লতু তোকে তাড়াতাড়ি যেতে ব'লে দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি স্নান ক'রে না খেয়েই ওদের ওখানে ছুটলুম। সেখানে গিয়ে দেখি, একাধারে অশ্রু ও আনন্দের ঢেউ চলেছে। কাল আসি নি ব'লে লতুর মা অনুযোগ করতে লাগলেন। কতবার সুজাতার নাম ক'রে চোখের জল ফেললেন। লতুর বরের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এটি লতুর প্রাণের বন্ধু।

আমার চোখে জল এসে গেল। আমাকে দেখে লতুও কাঁদতে লাগল।

বর চমৎকার দেখতে। স্বভাবটিও তার ভারি মিষ্টি। আমাকে বললে, তুমি লতুর বন্ধু, তোমাকেও যেতে হবে আমাদের ওখানে।

লতু আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, চললুম, চললুম। কষ্ট হ'লেই আমার কাছে চ'লে যাবি।

বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় লতুরা চ'লে গেল ইষ্টিশানে। তার বাবা, ললিত ও আরও অনেকে পৌঁছে দিতে গেল।

সবাই চ'লে গেলে লতুর মা আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, স্থবির, তুই আমার বড় ছেলে, আমাকে কখনও ছেড়ে যাস নি বাবা।

লতুদের বাড়ি থেকে যখন বেরুলুম, তখন বারোটা বেজে গেছে। মাথার মধ্যে অদ্ভুত যন্ত্রণা, মনের মধ্যে কে যেন বিষম তাড়া লাগাচ্ছে।

কোথায় যাই, কোথায় যাই—

চলতে চলতে হঠাৎ দৌড়তে আরম্ভ ক'রে দিলুম। মানিকতলার খালের পোল পেরিয়ে সোজা রাস্তা ধ'রে দৌড়তে লাগলুম। আজ সে

সব জায়গা শহরের মধ্যিখানে এসে গিয়েছে, কিন্তু তখন সে স্থান ছিল একেবারে পাড়াগাঁ বললেই হয়। একটা মেটে চওড়া রাস্তা, দু দিকে চওড়া পাঁক-ভরা নর্দমা। তার পরে বড়লোকদের বাগান আর নয় জঙ্গল। এই রাস্তা দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এসে পড়লুম একেবারে নতুন খালের ধারে, আজ যেখানে বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা হয়েছে। খালের ধারে, ভজন উড়ের খেয়া-নৌকোয় আধ পয়সা দিয়ে পার হয়ে চ'লে গেলুম ওপারের বাদা-বনে।

বিশাল লবণাক্ত জলরাশি, এপার ওপার নজর চলে না। ডাঙা-জমি নেই বললেই চলে। কোন কোন স্থানে ঘন জঙ্গল, কোথাও বা একেবারে ফাঁকা, একগাছি ঘাস পর্যন্ত নেই। মধ্যে মধ্যে দু-একটা খেজুরগাছ গলায় হাঁড়ি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মন অবসন্ন, পা দুটো যেন আর দেহটাকে টানতে পারছিল না। কোনও রকমে টলতে টলতে একটা খেজুরগাছের নীচে গিয়ে ব'সে পড়লুম। মনের মধ্যে এক চিন্তা —লতু চ'লে গেছে, দুনিয়ায় আর কোন আকর্ষণ নেই। সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ, জীবনের সব মাধুর্য চ'লে গেল লতুর সঙ্গে।

কতক্ষণ সেইভাবে ব'সে ছিলুম জানি না, হঠাৎ আমার কানের মধ্যে কি রকম ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। মনে হতে লাগল, যেন এখুনি ম'রে যাব।

মনকে শক্ত ক'রে বলতে লাগলুম—আসুক মৃত্যু। এস মৃত্যু। তুমি দু-দুবার আমার কাছে এসে চ'লে গিয়েছ, আজ আর তোমায় ছাড়ব না।

আমি সেই অনুভূতির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রে সেখানেই শুয়ে পড়লুম।

হয়তো কয়েক মুহূর্তের জন্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলুম। জ্ঞান

ফিরে আসতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলুম। তারপরে আস্তে আস্তে আবার খেয়া-নৌকোয় পার হয়ে এপারে চ'লে এলুম।

যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন বেলা প'ড়ে গিয়েছে। ছাতের ওপরে উঠে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছি, এমন সময়ে মার সঙ্গে দেখা। মা অত বেলায় পড়ন্ত রোদে চুল শুকোচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, গাছগুলোতে একটু জল দিয়ে দে তো।

মার ছিল গাছের শখ। ছাতের ওপরে প্রায় আড়াইশো তিনশো ছোট বড় টবে তিনি নানা রকমের ফুল ও ফলের গাছ করেছিলেন। তাঁর এই ছাত-বাগানে কাবুলী কলা থেকে আঙুর পর্যন্ত ফলত। তিনি নিজের হাতে এই গাছগুলিকে লালন করতেন। ছাতে গঙ্গাজলের একটা বড় ট্যাঙ্ক ছিল। প্রতিদিন এই ট্যাঙ্ক থেকে নিজে জল তুলে গাছে দিতেন।

মার হুকুমমত গাছে জল দেওয়া সেরে ফেললুম। মা বললেন, আজ শরীরটা ভাল নেই বাবা। তার ওপরে সারাদিন যা হাঙ্গামা গিয়েছে, আজ আর একটু হ'লেই তোরা মাতৃহীন হতিস।

কি ব্যাপার?

তোমাদের বাবার জ্বালায় এতদিন যে প্রাণে বেঁচে আছি কি ক'রে, তাই মাঝে মাঝে ভাবি। এই তো স্নান ক'রে উঠলুম। সতুরা চ'লে গেল বুঝি?

আজকাল যেমন কলকাতার রাস্তায় দলে দলে পাগল ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, তখনকার দিনেও পাগলের সংখ্যা এর চাইতে কম ছিল না। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের এই নতুন বাড়িতে এসে বাবার একটা নতুন খেয়াল চেপেছিল। একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন যে, কোন এক উৎসব-বাড়ির সামনে স্তূপীকৃত উচ্ছিষ্ট আবর্জনার ভেতর থেকে

একটা পাগল নিমন্ত্রিতদের ভুক্তাবশিষ্ট থেকে বেছে বেছে কি খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি পাগলটাকে ধ'রে বাড়িতে নিয়ে এসে তার মাথার জটা ও দাড়ি ছেঁটে স্নান করিয়ে তাকে ভদ্র ক'রে আমাদের বললেন, এঁকে তোমরা 'মামাবাবু' ব'লে ডাকবে।

রাস্তার পাগলের সঙ্গে হঠাৎ সম্পর্ক স্থাপন করতে মা ঘোরতর আপত্তি করায় সে ব্যক্তি তখুনি আমাদের 'কাকাবাবু' হয়ে গেল। সেই থেকে সে আমাদের বাড়িতেই থেকে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হ'ল না। তার পর থেকে বাবা প্রায় প্রতিদিনই দুটি-তিনটি ক'রে পাগল রাস্তা থেকে ধ'রে আনতে আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে মাসখানেকের মধ্যে বাড়ি একটি ছোটখাট পাগলা-গারদে পরিণত হয়ে গেল। প্রতিদিন সকালবেলা এক থান কাপড়-কাচা সাবান দিয়ে এই পাঁচ-ছটি পাগলাকে স্নান করিয়ে তিনি আপিসে যেতেন। এরা খেয়ে-দেয়ে বাইরে চরতে যেত আর সেই সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরত। এদের অঙ্গে প্রায়ই শতছিন্ন ধুতি জামা থাকত। বাবা কোন্ জন্মে সরকারী বনবিভাগ ও তারপরে চা-বাগানে চাকরি করেছিলেন। সেই সময়কার পেণ্টলান ও অদ্ভুত অদ্ভুত সব জামা একটা কাঠের সিন্দুকে জমা ছিল। সেই সব জামা ও পেণ্টুলান এতদিন পরে এই পাগলদের অঙ্গে চড়তে লাগল।

দু-তিনজন পাগল সন্ধ্যে হ'লেই গুটিগুটি বাড়ি ফিরে আসত আর জন দুয়েক প্রায়ই ফিরত না। বাবা আপিস থেকে বাড়িতে ফিরেই তাদের খোঁজ করতেন আর তারা তখনও ফেরে নি শুনে তক্ষুনি বেরিয়ে যেতেন তাদের খোঁজে। সারা শহর ঘুরে কোনদিন ছাতাওয়ালা গলি, কোনদিন বা সার্পেনটাইন লেন থেকে তাদের আবিষ্কার ক'রে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে আনতেন। এই ভাবে চলতে চলতে এক এক ক'রে

তিনজন পাগল কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, আর তাদের খোঁজ পাওয়া গেল না।

যে দুজন পাগল আমাদের বাড়িতে থেকে গেল, তারা হাঙ্গামা কিছু করত না, বরং এদের নিয়ে আমাদের বেশ আমোদেই দিন কাটত। এদের মধ্যে একজনের অভিনয় করবার ও গান গাইবার বাতিক ছিল। মধ্যে মধ্যে যেদিন তার ওপর নটরাজ ভর করতেন, সেদিন সে সারারাত চীৎকার করতে থাকত। আর একজনের ছিল লঙ্কা খাওয়ার বাতিক। আমরা তাকে প্রতিদিন লুকিয়ে আট-দশটা কাঁচা লঙ্কা দিতুম, আর সে আমাদের সামনেই সেগুলোকে কচকচ ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত।

সে সময়ে আমাদের বাড়িতে অমূল্য ও বিনোদ নামে দুটি ছেলে থাকত। অমূল্যকে বাবা কোথায় একটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সে বেচারী রাত থাকতে উঠে বেরিয়ে যেত আর ফিরত বেলা বারোটায়। বিনোদ ইস্কুলে পড়ত। কি কারণে জানি না, গাইয়ে ও লঙ্কাবিলাসী দুই পাগলাই অমূল্যকে দেখলেই ক্ষেপে যেত।

সেদিন, কি জানি কেন, লঙ্কাবিলাসী পাগলা খাবার সময় আমাদের রাঁধুনীর ওপর চ'টে গিয়ে ভাতের থালা, জলের ঘটি ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিলে। গাইয়ে পাশে ব'সেই খাচ্ছিল। জুড়িদারের সাড়া পেয়ে সেও খাওয়া ছেড়ে রাঁধুনীকে দমাদ্দম মারতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মা কাছেই ছিলেন, তাঁর ধমক-ধামকে তারা একটু শান্ত হয়েছিল, এমন সময় অমূল্য কাজ থেকে ফিরে এল। তাকে দেখেই লঙ্কাবিলাসী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে মাকে বঁটি নিয়ে তাড়া করলে। অমূল্য কোন রকমে মাকে রক্ষা করলে বটে, কিন্তু তারা ভাতের হাঁড়ি আর যা কিছু খাবার ছিল সব নষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে, মার খাওয়া পর্যন্ত হয় নি।

সমস্ত কাহিনীটি ব'লে মা জিজ্ঞাসা করলেন, তুই লতুদের ওখানে খেলি বুঝি?

মার প্রশ্নে মনে পড়ল, চব্বিশ ঘণ্টার ওপর আমার পেটে অন্ন পড়ে নি। তবুও বললুম, হ্যাঁ।

মা ব'লে যেতে লাগলেন, এই লোক নিয়ে আমি কি করব, সামান্য একটু বুদ্ধি নেই! পাগল ওরা, ওদের কি জ্ঞানগম্যি আছে!

মা ব'লে যেতে লাগলেন, কোনদিন কি আমার কথা শুনলেন! একবার, তখন উনি আসামের এক চা-বাগানে ম্যানেজারি করতেন। একদিন রাত-দুপুরে আর এক বাগানের ম্যানেজার এসে ওঁর কাছে কিছু টাকা ধার চাইলে। লোকটা ছিল অতি বদমাইস—আমি দুচক্ষে দেখতে পারতুম না তাকে। উনি বাগানের টাকা ভেঙে তাকে দিলেন। আমি বারণ করতে বললেন, বন্ধুর বিপদে সাহায্য করতে যে স্ত্রী বারণ করে, সে স্ত্রীই নয়।

শুনে আমি আর কিছু বললুম না।

তারপরে সে আর টাকা দেয় না। রোজই তাগাদা করেন, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্যই সে করে না। উনি রোজ সকালে ঘোড়ায় চ'ড়ে বেড়াতে যেতেন। একদিন সকালবেলা সেই রকম বেড়িয়ে ফিরে এসে উনি কি রকম করতে লাগলেন, হাত-পা এলিয়ে আসতে লাগল, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল—এখন যান তখন যান অবস্থা।

বাগানের ডাক্তার ছিল, তখুনি তাকে ডেকে পাঠালুম। সে এসে ব্যাপার দেখে আমাকে আলাদা ডেকে বললে, মা, আমার মনে হচ্ছে, উনি বিষ খেয়েছেন।

কি সর্বনাশ! ছুটে গিয়ে বললুম, হ্যাঁগা, ডাক্তার বলছে, তুমি বিষ খেয়েছ! কি দুঃখে তুমি বিষ খেলে?

তখন ওঁর কথা এড়িয়ে গেছে, চোখ প্রায় উল্টে গেছে। তবুও গেঙিয়ে গেঙিয়ে যা বললেন, তাতে বোঝা গেল যে, বেড়িয়ে ফেরবার

সময় বন্ধুর চা-বাগানে গিয়ে এক গ্লাস জল চাওয়ায় সে ভালবেসে বন্ধুকে এক গেলাস দুধ খেতে দিয়েছিল। বিষ-টিষ উনি কিছুই খান নি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওঁর কথা বন্ধ হয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ডাক্তার বললে, মা, আর দেখছেন কি, হয়ে গেল যে!

কি করি! সেই জঙ্গলে এমন একটা লোক নেই যার কাছে একটা পরামর্শ পাই। ডাক্তার আমায় 'মা' বলত। তাকে বললুম, বাবা, ওদেরই খবর দাও, ওরাই তো ওঁর বন্ধু।

বন্ধুদের বাগান প্রায় পনরো মাইল দূরে। তাদের কাছে লোক ছুটল ঘোড়ায়। বন্ধু প্রায় বেলা একটার সময় এল তাদের বাগানের ডাক্তারকে নিয়ে। তখন চোখ উল্টে গেছে, হাত-পা শক্ত হয়ে গেছে। তারা দেখে বললে, হয়ে গেছে।

বাগানের অন্য কর্মচারীরা ও ওঁর সেই বন্ধু—তারা সবাই মিলে আমাকে শহরে পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক করলে। শহর সেখান থেকে মাইল দশ-বারো দূরে। ঠিক হ'ল, গরুর গাড়িওয়ালা আমাকে শহরের স্টীমারঘাট অবধি পৌঁছে দেবে, তারপরে কাল সকালে আমি কলকাতায় রওনা হব। আমাদের জিনিসপত্র যা কিছু সব তারা পরে পাঠিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে তারা ওঁর দেহ সৎকার করবে—সেজন্যে কোন ভাবনা নেই।

তোর দাদার তখন বছর দেড়েক বয়স। সেই বাচ্চা কোলে নিয়ে বিকেল নাগাদ আমি গরুর গাড়িতে চ'ড়ে রওনা হলুম শহরের দিকে।

গাড়ির মধ্যে ব'সে ভাবছি আকাশ-পাতাল।' কখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, রাত্রির অন্ধকার নেমেছে জঙ্গলে, তার খেয়ালই নেই। আসামের জঙ্গল, দিনেই অন্ধকার, রাতে তো কিছুই দেখা যায় না। দূরে কাছে মাঝে মাঝে জানোয়ারের ডাক শোনা যাচ্ছে। বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ে ছেলেটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে কাঁটা হয়ে ব'সে আছি।

গাড়োয়ানটা ভাল্লুক তাড়াবার জন্যে থেকে থেকে বিকট চীৎকার করছে। আর কতদূর—কতক্ষণে গিয়ে শহরে পৌঁছব? সেখানে জানাশোনা দু-একটি পরিবার থাকতেন, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে অত রাত্রে উঠব—এই সব ভাবছি, এমন সময় গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করলে, আর কত দূরে যাবে?

গাড়োয়ানের প্রশ্ন শুনে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। বলে কি লোকটা!

বললুম, শহর আর কত দূর?

কোন্ শহর?

নওগাঁ।

সে তো জানি না। বাবুরা তো তোমাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে যেতে বললে। নওগাঁ তো অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। সে এখান থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল হবে।

একবার ভেবে দেখ্। তখন আমার অল্প বয়েস, কোলে একটা বছর দেড়েকের ছেলে, আসামের সেই ভীষণ জঙ্গল, রাত্রি প্রায় দুপুর।

মনে মনে ভগবানকে ডেকে বললুম, পোড়ারমুখো ভগবান, এ কি করলে আমার!

গাড়োয়ানকে বললুম, বাবা, আমাকে শহরে পৌঁছে দে। আমি বামুনের মেয়ে, তোকে আশীর্বাদ করব, তোর ভাল হবে। আমার স্বামীকে ওরা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে, আমাকেও মেরে ফেলতে চায়—বুঝতে পারছিস না?

গাড়োয়ান বললে, মেয়েছেলেকে রাত-দুপুরে জঙ্গলে নামিয়ে দেবার কথা শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু অতটা বুঝতে পারি নি।

আমি বললুম, তুই আমায় শহরে পৌঁছে দে, আমার গায়ে যত গয়না আছে সব তোকে দোব, তুই আমার ছেলে।

আমার কান্না দেখে আর সব কথা শুনে তার মন গ'লে গেল। সে বললে, তোমার কোন ভয় নেই মা, আমি গয়না চাই না, আমি তোমায় শহরে পৌঁছে দিচ্ছি।

গাড়োয়ান যখন আমায় স্টীমারঘাটে এনে পৌঁছে দিলে, তখন সকাল হয়ে গেছে। ভাগ্যক্রমে স্টীমারঘাটেই আমাদের জানাশোনা ওখানকার একজন বড় উকিলের সঙ্গে দেখা। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে ?

আমি তাঁকে সব কথা বলাতে তিনি তক্ষুনি লোকজন, ডাক্তার ও আমাকে নিয়ে গাড়ি ক'রে ছুটলেন বাগানে। সেখানে গিয়ে দেখি, তারা ওঁকে এক জায়গায় মাটিতে শুইয়েছে—দূরে একটা চিতা তৈরি হচ্ছে পোড়াবার জন্যে। আমাদের জিনিসপত্র কিছুই নেই। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর প্রাণের বন্ধু, যার জন্যে উনি স্ত্রী পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেন, সে উধাও।

এদের ডাক্তার ওঁকে পরীক্ষা ক'রে বললেন, এখনও প্রাণ আছে, চেষ্টা করলে বাঁচতেও পারেন।

তখুনি ওঁকে শহরে নিয়ে আসা হ'ল। তারপরে প্রায় তিন মাস চিকিৎসার পরে সেরে উঠলেন। ওই যে নীচে Shakespeare and Newton-এর স্টীল-ট্রাঙ্কটা আছে, সেটা এক বছর পরে মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছিল। ওঁর সেই প্রাণের বন্ধুটি সেই যে পলায়ন করলে, আজও পুলিস তার সন্ধান করতে পারলে না।

কাহিনী শেষ ক'রে মা চুপ করলেন। তখনও তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। আমাদের দুজনকে ঘিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠতে লাগল। আমার বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর জমাট হয়েই ছিল, এই কাহিনী শুনে নিরুদ্ধ অশ্রু শতধা উৎসারিত হয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে মাকে জড়িয়ে ধ'রে বললুম, মা মা মা, আমি রয়েছি, তোমার ভয় কি ?

অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে মা বললেন, তুই আমার বুদ্ধিমান ছেলে, তুই মায়ের দুঃখ বুঝবি, তাই বললুম।

তখুনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, যেমন ক'রে পারি মার দুঃখ ঘোচাতেই হবে। নিজে মানুষ হয়ে মাকে নিয়ে চ'লে যাব দূর দেশে। সেখানে আমরা থাকব, কোন দুঃখ, কোন আঘাত মাকে স্পর্শ করতে দেব না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে মা উঠে চ'লে গেলেন। আমি আমাদের ঘরের ছাতে উঠে গিয়ে বসলুম—নিবিড় অন্ধকারে আপনাকে লুকিয়ে। লতুর সঙ্গে হঠাৎ এই বিচ্ছেদের আঘাতে এমনিতেই আমি মুষড়ে পড়েছিলুম, তার ওপরে মার মুখে ওই কাহিনী শুনে ও তাঁর চোখে অশ্রু দেখে অন্ধকারে ব'সে ব'সে আমি কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। মনের মধ্যে এক চিন্তা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গুমরোতে লাগল, লতু চ'লে গেল, লতু চ'লে গেছে। আমি প'ড়ে আছি একা। লতুর নতুন সংসার, নতুন জীবন। কিন্তু আমার কি রইল? আমি কি নিয়ে থাকব?

লতুর সঙ্গে কি চিরবিচ্ছেদ হয়ে গেল? তবে কেন ভগবান আমাদের দুজনকে এত কাছাকাছি এনেছিলেন? কে এ রহস্যের উত্তর দিতে পারে? একান্ত মনে পাগলা সন্ন্যেসীর কথা ভাবতে লাগলুম। তাঁর সেই গেরুয়া বসন, তাঁর লাইব্রেরি, তাঁর কবিতাপাঠ মনের মধ্যে জলজল ক'রে ফুটে উঠতে লাগল। ভাবতে ভাবতে একবার যেন তাঁর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজল। এক মুহূর্ত যেতে না যেতে সমস্ত আকাশ ব্যেপে মেঘ-গর্জনের মত পাগলা সন্ন্যেসীর কণ্ঠস্বর গ'র্জে উঠল—

If day should part us night will mend division
And sleep parts us—we will meet in vision
And if life parts us—we will meet in death
Yielding our mite of unreluctant breath

Death cannot part us—we must meet again
In all in nothing in delight in pain
How, why or when or where—it matters not
So that we share an undivided lot…

এই মহামন্ত্র শুনতে শুনতে আমি সেইখানেই লুটিয়ে পড়লুম অজ্ঞান হয়ে।

বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েক পরে অস্থির এসে আমায় ধাক্কা দিয়ে তুলে বললে, চল্, খাবি চল্, মা ডাকছে।

আমি ঠিক করলুম, কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাব ভাগ্য-অন্বেষণে। বিদায়ের আগে লতু বলেছিল, আমার সারাজীবন তোর চিন্তাতেই কাটবে। আমিও সারাজীবন লতুর ধ্যানেই কাটিয়ে দোব। সে আমায় ভালবাসতে শিখিয়েছে, এই ভালবাসাই হবে আমার ধর্ম। যদি কখনও জীবনে উন্নতি করতে পারি, তা হ'লে মার দুঃখ ঘোচাব, আর আমার কোনও কর্তব্য নেই।

অস্থির বললে, স্থবরে, আমিও তোর সঙ্গে যাব। কিন্তু পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'ল, দুজনে একসঙ্গে পালানো ঠিক হবে না। আমার একটা কিছু হ'লে অর্থাৎ উন্নতির রাস্তায় পৌঁছলে তাকে খবর দোব, সে চ'লে আসবে।

বাড়ি থেকে বেরুতে হ'লে কিছু অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু অর্থ কোথায় পাই? আমার মনের এই সংকল্প বন্ধুদের জানাতে সাহস হ'ল না। তারা চেষ্টা করলেও হয়তো কিছু অর্থের যোগাড় ক'রে দিতে পারত, কিন্তু ভয়ে তাদের কিছু বলতে পারলুম না। কারণ আমার গৃহত্যাগ যদি তাঁদের মনঃপূত না হয়, তারা বাড়িতে ব'লে দিয়ে সব মাটি ক'রে দিতে পারে। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষকালে আমার অন্যতম প্রাণের বন্ধু

পরিতোষ রায়কে আমার মনের কথা ব'লে ত্রিশ টাকা ধার চাইলুম। পরিতোষের কাছে তাদের সংসারের টাকা থাকত। সে বেচারী আমাকে বড় ভালবাসত। সে সব শুনে বললে, আমিও তোর সঙ্গে যাব।

ঠিক হ'ল, পরিতোষদের সংসার-খরচের টাকা ভেঙে আমরা দুজনে স'রে পড়ব।

যাবার আগে গোষ্ঠদিদিকে সব ব'লে যাবার কথা মনে হ'ল। পাগলা সন্ন্যেসী ইহলোক থেকে বিদায় নেবার আগে আমাদের দুই ভাইয়ের হাতে তাকে সমর্পণ ক'রে গিয়েছিলেন, সে কথা আমরা ভুলি নি।

একদিন বিকেলে গোষ্ঠদিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলুম, সে সেখানে নেই। শৈলর মা, মাসী ও গোষ্ঠদিদি, সবাই মিলে সে বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথায় চ'লে গিয়েছে। বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা বললে, তারা আণ্টুনিবাগান না দপ্তরীপাড়ায় কোথায় উঠে গেছে।

গোষ্ঠদিদি আমাদের না ব'লে কোথায় চ'লে গেল? বিচিত্র এই সংসার! বিচিত্র এই নারীচরিত্র! আমাদের চেয়ে আপনার তার কে ছিল?

প্রায় দশ দিন ধ'রে আমি আর অস্থির আণ্টুনিবাগান ও দপ্তরী-পাড়ার বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান ক'রেও গোষ্ঠদিদির ও শৈলদের খুঁজে বের করতে পারলুম না, কোথাও তাদের সন্ধান মিলল না। [illegible] চয় তারা সে পাড়ায় ছিল না, আমাদের ফাঁকি দেবার জন্যে এ বা[illegible]র লোকদের কাছে মিথ্যে কথা ব'লে গিয়েছিল।

পাগলা সন্ন্যেসী, আমাদের ক্ষমা কর ভাই।

ইস্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা ঘনিয়ে আসার সময় বাবা আমাদের রাত থাকতে তুলে দিতেন পড়বার জন্যে। তাঁর কাছে শুনতুম যে, শেষরাত্রে উঠে পড়লে খুব ভাল পড়া হয়। অঘ্রাণ মাসের মাঝামাঝি এই রকম একদিন শেষরাত্রে বাবা আমাকে পড়বার জন্যে ঠেলে তুলে দিলেন। সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে মনে মনে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করলুম।

তখন আমার পনেরো বছর বয়স চলেছে।